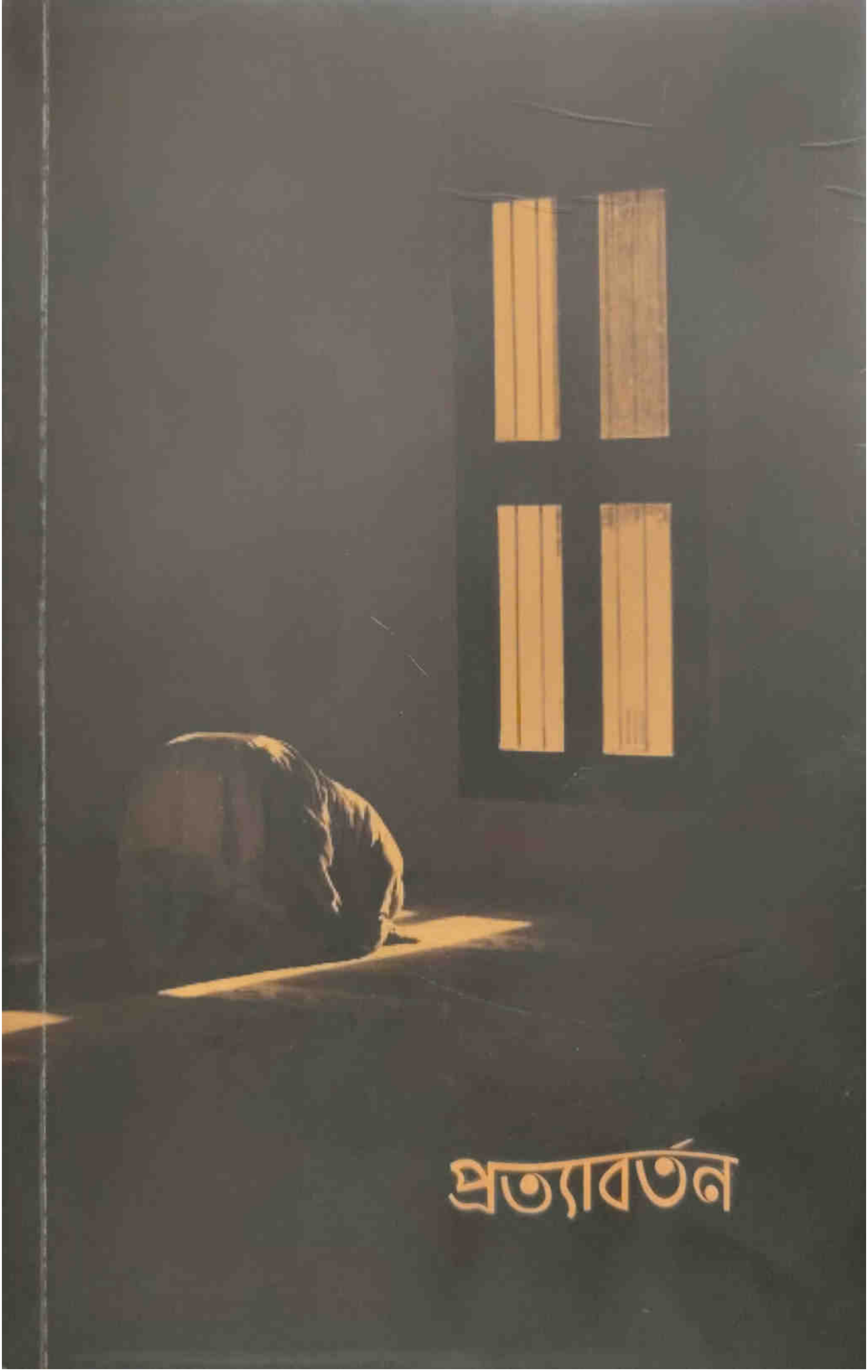

Scanned with CamScanner

কালের ঘূর্ণাবর্তে পালাবদল ঘটছে সবকিছুর, পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপে ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

Scanned with CamScanner

প্রত্যাবর্তন

সম্পাদনা

আরিফ আজাদ

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner

প্রত্যাবর্তন

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৮

দ্বিতীয় সংস্করণ
মে ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই-ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার, ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

একমাত্র পরিবেশক
চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

শারয়ী সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

মুদ্রণ এবং বাঁধাই
নুসরাহ পাবলিশিং এন্ড প্রিন্টিং সলিউশন
ফোন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN : 978-984-34-3957-4
Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 300.00 US $ 25.00 only.

সমকালীন প্রকাশন
১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন: ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬, ০৯৬১৭-১৬০১৬০

Scanned with CamScanner

প্রকাশকের কথা

প্রত্যেকটা বৃত্তের একটা কেন্দ্র থাকে। পৃথিবীতে জীবনাচরণের সেই কেন্দ্রের নাম হচ্ছে ইসলাম। এটিই আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে মনোনীত একমাত্র ধর্ম। চির শাশ্বত ধর্ম। পৃথিবীতে মানুষের আগমন এই ধর্মের হাত ধরেই। তাওহিদের একত্ববাদ, শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই, কুফরের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমেই যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে

'মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত'।[১]

সেই মানুষ তার প্রবৃত্তি, তার ইচ্ছা, কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে সেই ধর্ম এবং তার একমাত্র রবকে ভুলে গিয়ে সেখানে স্থান দিয়েছে মিথ্যাকে। সৃষ্ট বস্তুকে তারা গ্রহণ করেছে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে। যখনই মানুষ তাওহিদের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন ধর্মের।

আমরা যারা জন্মগতভাবে মুসলিম পরিবারে জন্মেছি, বলা চলে আমরা কেন্দ্রের অধিবাসী হয়েই জন্মেছি। তবুও, বেড়ে উঠতে উঠতে, সমাজের নানান সজ্ঞাতি-অসজ্ঞাতির ভিতর দিয়ে যেতে যেতে একসময় আমরা পথ হারিয়ে বসি। হয়ে পড়ি কেন্দ্রচ্যুত। আমরা কেবল 'নামে মুসলিম' হয়ে জীবনযাপন করি। তখন আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি আর একজন অমুসলিমের জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আমাদের ধার্মিক জীবন তখন আবদ্ধ হয়ে যায় জুমুআর সালাত

১ আল আসর ১০৩ : ০২

এবং দুই ঈদের সালাতের মধ্যে। যা আমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের তখন তীব্র আকর্ষণ। আর যা আমাদের করতে বলা হয়েছে, তার প্রতি আমাদের দুর্বার অনীহা। আমরা ঢুকে পড়ি একটি অন্ধকার রাজ্যে। নিকষ কালো অন্ধকার।

সেই অন্ধকার রাজ্যের মায়াপথ থেকে কেউ কি বেরিয়ে আসে? কারও কি হুশ ফিরে? কেউ কি ফিরে আসে তার কেন্দ্রে? হ্যাঁ, আসে। কেউ কেউ আসে। যারা আসে, তারা খুব দুর্দান্তভাবে ফিরে আসে। সেই পথ ফিরে পাওয়া, নীড়ে ফিরে আসা আত্মাগুলোর গল্প নিয়ে লেখা এই বইটি।

শুধু কি তাই? যার জন্মই কেন্দ্রের বাইরে, সে কি কখনো সন্ধান পায় সিরাতুল মুসতাকিমের? সেও কি পারে তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম, দেবতা, ঈশ্বরকে অস্বীকার করে চিরাচরিত এক মহাসত্যের দিকে ধাবমান হতে? কেউ কেউ পারে। সেই পবিত্রতম আত্মাগুলোর গল্পগুলো কেমন? সেসব নিয়েও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমরা আশা করছি, এই বই পথহারা হাজারো তরুণ-তরুণীকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে, উৎসাহ যোগাবে, ইনশাআল্লাহ। জীবন জাহাজের দিশেহারা নাবিককে বাতলে দিবে পথের দিশা। সিরাতুল মুস্তাক্বীমের অমসৃণ কিন্তু সুখময় পথে হাঁটার জন্য এই বইটি যদি একজনকেও অনুপ্রাণিত করে, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের কাজগুলোকে কবুল করুন। আমিন।

Scanned with CamScanner

সম্পাদকের কথা

পথ অনেকগুলো। প্রতিটি পথের রয়েছে অনেক পথিক। কিছু আছে বক্র পথ। এই পথগুলো ধরে ধরে হাঁটতে গিয়ে কেউ কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কিছু পথজুড়ে আছে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। সেই অন্ধকার আপন করতে গিয়ে কেউ কেউ তার অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়।

আবার এসবের বাইরেও একটি পথ আছে। সেই পথটির নাম 'সিরাতুল মুসতাকিম'।

সিরাতুল মুসতাকিম অর্থ হলো সরল পথ। সোজা, বক্রতাবিহীন একটি পথের নামই সরল পথ। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই পথের পথিক হওয়ার জন্যই। কিন্তু পৃথিবীতে এসে সাময়িক শক্তি, সম্পদ, ঐশ্বর্য, মেধা আর আভিজাত্যের ভিড়ে আমরা ভুলে যাই আমাদের শেকড়ের কথা। আমরা ভুলে যাই আমাদের শেষ গন্তব্যস্থলের কথা। আমরা ঔদ্ধত্য হয়ে পড়ি। অহংকারী হয়ে উঠি। স্রষ্টাপ্রদত্ত বিধান ভুলে গিয়ে আমরা দুনিয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। দুনিয়ার মোহ আমাদের আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। আমরা আমাদের 'কামনা' কে বানিয়ে ফেলি আমাদের নিয়ন্ত্রক। আর ধর্ম? সেটা হয়ে পড়ে নিতান্তই আনুষ্ঠানিকতার বিষয়।

আলো ভেবে আমরা অন্ধকারকে আপন করে নিই। অন্ধকার গলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি নিমিষেই। এক অদ্ভুত রঙিন চশমার ফ্রেমে বন্দি চোখে তখন আমরা দুনিয়া দেখতে থাকি। সেই দুনিয়ায় ধর্ম নেই। থাকলেও তার গুরুত্ব নেই। সেই দুনিয়ায় ধর্মের, ধর্মীয় বাণী আর বিধানের গুরুত্ব কেবল মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই। সভ্য মনুষ্যসমাজে সেসবের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।

Scanned with CamScanner

এমনভাবেই আমরা কতক বেড়ে উঠি। আগাগোড়া শেকড় ভুলে।

কিন্তু, আমাদের কেউ কেউ, যারা ভ্রান্তির চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছি ক্রমেই, হঠাৎ করেই সন্ধান পাই সত্যের। খোঁজ পেয়ে বসি আলোর। সেই আলোর ঝলকানি চোখে লাগতেই আমাদের রঙিন চশমার কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে পড়ে। আমরা জেগে উঠি। হারানো শেকড়ের সন্ধান পেতে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমাদের অন্তরাত্মা তখন সত্যের অমৃত সুধা পানের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আমাদের সেই ফিরে আসার গল্পগুলো কেমন? সেই গল্পগুলো নিয়েই সাজানো হয়েছে এই বইটি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, আলহামদুলিল্লাহ, কিছু ভাই এবং বোনদের দীনে ফিরে আসার গল্প আছে এখানে। এই গল্পগুলো পড়তে গিয়ে বার বার অশ্রুসিক্ত হয়েছি। নিজের সীমাবদ্ধতা যেন বার বার আমার সামনে ফুটে উঠেছে।

বইটি উঠতি যুবক-যুবতীদের, যারা দীন থেকে দূরে, তাদের জন্য দীনে ফেরার পথে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে কবুল করুন, আ-মি-ন।

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : আলোর পথে যাত্রা

সরল পথের খোঁজে - মোহাম্মদ রুহুল আমিন ১৩
টাইট্রেশন - ডা. শামসুল আরেফীন ২০
এবং, ফিরেছি আমিও - ওমর আল জাবির ৩০
নীড়ে ফেরার গল্প - মাসুদ শরীফ ৩৩
পথিকের পথচলা - নিশাত তামমিম ৪১
আলোয় ভুবন ভরা - কবির আনোয়ার ৪৯
সেই সব দিনরাত্রি - রাফান আহমেদ ৫৫
অন্ধের যাত্রা সমীকরণ - মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর ৬৩
আপনারে খুঁজিয়া বেড়াই - আরমান ইবন সোলাইমান ৬৯
পথ ও পথিক - মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার ৭৯
সেই সময়ের উপাখ্যান - জাকারিয়া মাসুদ ৮৮
সংশয় থেকে বিশ্বাস : এক পথিকের গল্প - মো. আবদুল্লাহ সাঈদ খান ৯৪
আমি এবং আমাদের গল্প - মাহমুদুর রহমান ১০৬
গল্পটা হাসি-কান্নার - শিহাব আহমেদ তুহিন ১১০
ফিরে পাওয়া গুপ্তধন - ফয়সাল বিন আলম ১১৫
চলতে ফিরতে যেমন দেখেছি - সাইফুর রহমান ১২৬
দ্য আগলি ডাকলিং - রেহনুমা বিনতে আনিস ১২৯
প্রত্যাবর্তন! - এস. এম. নাহিদ হাসান ১৩৪
ফিরে আসার গল্প - আশরাফুল আলম সাকিফ ১৩৯
আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব! - আরিফুল ইসলাম ১৫৯
চলতে চলতে আলোর দেখা - মুগনিউর রহমান তাবরীজ ১৬৩
খুঁজে ফিরি নীড় - সালমান সাঈদ ১৭৩

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ স্রষ্টার সন্ধানে

সেই মিছিলের দেখা - অরিজিৎ রায় ১৮৩

শুভ্র আলোর প্রথম প্রহর - সুতীর্থ মুখার্জী ১৯২

যেমন ছিলাম, যেমন আছি - এস ট্রানস ১৯৯

ফেরার কথাই ছিল - ওলোগুন্ডে সা ২১০

Scanned with CamScanner

আলোর পথে যাত্রা

Scanned with CamScanner

সরল পথের খোঁজে

মোহাম্মদ রুহুল আমিন, এমবিবিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ

দীনের বাইরে বড় হওয়া একজন কিশোর যেভাবে, যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, আমার বেড়ে ওঠার গল্পগুলোও ঠিক সেরকম। খুব ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, পশুপাখিকে কষ্ট দেওয়া, বন্ধুদের সাথে মিলে অন্যের বাগানের আম চুরি করে খাওয়া, আব্বুর পকেটের টাকা চুরি করা, আত্মীয়-স্বজনের সাথে খারাপ আচরণ করা, স্কুল পালানো, সিনেমা হলে যাওয়া, পূজা-মণ্ডপে যাওয়া—ইত্যাদি ছিল আমার জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

বাড়িতে নামাজ পড়েতেন শুধু আমার মা। বাবা নামাজ পড়তেন না, শুধু পড়াশোনার জন্যে বকাঝকা করতেন।

মা যদিও নামাজের জন্যে হালকা বকাবকি করতেন; কিন্তু দেখা যেত, জুমার দিন জুমার নামাজেও আমি যেতে চাইতাম না। নামাজে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে চলে যেতাম। আমি ছিলাম প্রচণ্ড রকম সিনেমার পোকা। তখন আমাদের বাড়িতে টেলিভিশন ছিল না। পাশের বাড়িতে সিনেমা দেখতে দেখতেই আমার বেশিরভাগ সময় কাটত।

আমার এমন ডানপিটে স্বভাবে মা আমার উপর চরম বিরক্ত হয়ে উঠলেন। অবশ্য বিরক্ত হবারই কথা। বাবা আমাকে কথা শোনাতেন কম, আমার কৃতকর্মের সমস্ত ঝাল তিনি মায়ের উপরেই ঝাড়তেন। মায়ের আস্কারাতেই আমি মাথায় চড়েছি, নষ্ট হয়ে গেছি, কু-পথে চলে গেছি—ইত্যাদি নানান কথার বাণে জর্জরিত হতেন আমার মা। মা একদিন করলেন কি, আমাকে পাশের বাড়ি থেকে ধরে বাসায় নিয়ে

Scanned with CamScanner

এলেন। বাসায় ঢুকিয়ে মা নিজের গলায় দড়ি পেঁছিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আমি মরে গেলে শান্তি পাবি, তাই না? এই দ্যাখ, আমি মরে যাচ্ছি...'

আমি ছিলাম আমার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা বলেছিলেন, পর পর ছয়টা মেয়ে সন্তানের পর আমি নাকি তাদের কাছে আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত হিসেবে জন্মেছি। রক্ষণশীল সমাজের চোখে তখন ছেলেসন্তান মানেই সবকিছু। আর মেয়েসন্তান মানেই বোঝা। আমার বাবা-মায়েরও এরকম ধারণা। তারা ভাবতেন, আমিই তো তাদের অন্ধকারে আলোস্বরূপ। বৃদ্ধ বয়সের লাঠি। এজন্য আমি তাদের কাছে ছিলাম আদরের দুলালের মতো। সেই আমিই যখন এরকম বেঁকে বসলাম, তখন তারা দুজন আমাকে নিয়ে খুব হতাশ হয়ে পড়লেন।

এরপর, হঠাৎ একদিন বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাবার চিকিৎসা চলাকালীন আমার পড়াশোনায় যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য আমাকে আমার বড় আপুর বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আপুর শ্বশুরবাড়ির পরিবেশটা ছিল আমাদের পরিবেশের চেয়ে পুরোপুরিই ভিন্ন। পড়াশোনার জন্য চমৎকার একটা পরিবেশ বলা যায়। আশপাশের লোকগুলোও যথেষ্ট ধার্মিক। সবাই নিয়মিত নামাজ পড়ে, পর্দা-হিজাব করে চলে।

এরকম ভালো একটা পরিবেশে এসে আমি যে একেবারেই বদলে গেলাম—তাও না। আমার দুরন্তপনা, ডানপিটে স্বভাবগুলো তখনও বলবৎ ছিল আগের মতোই। আমি খুঁজে খুঁজে আশপাশ থেকে আমার স্বভাবের ছেলেগুলোকে বের করলাম। তাদের সাথে আড্ডা দিতাম। সময় কাটাতাম। আপুর শ্বশুরবাড়ির সবাই যেহেতু ধার্মিকশ্রেণির ছিলেন, আমি নামাজ না পড়লে কেমন যেন একটু বেমানান দেখায়। সমালোচনার ভয়ে মসজিদে যেতে হতো। কিন্তু মন থেকে নামাজ পড়তাম না কখনোই। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা,আমোদ-ফূর্তি করতাম, সিনেমা দেখতাম, নাচতাম, গান গাইতাম—কিন্তু মানসিক তৃপ্তিটা আর পেতাম না।

একদিন সিনেমা দেখার জন্য টিভি অন করলাম। চ্যানেল পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, কোট-টাই পরা একজন লোক খুব স্মার্টলি কুরআন হাদিসের কথা বলছেন। তার লেকচার শোনার জন্যে নয়, বরং তার কোট আর টাই-ই যেন তার প্রতি আমার কৌতূহলের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল। ইতোপূর্বে কোট-টাই পরা

Scanned with CamScanner

কোনো লোককে তো কখনো হাদিস বলতে দেখিনি। চ্যানেল পাল্টালাম না। শুনতে লাগলাম। একটু পরে বুঝতে পারলাম, তিনি একজন ডাক্তার। কিন্তু একজন ডাক্তার ডাক্তারি না করে ধর্মপ্রচারে নামল কেন, সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। লেকচারের একপর্যায়ে শুনি, লোকটি নিজেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র বলে ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমি অবাক হলাম। একজন ডাক্তারের তো ডাক্তারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার কথা। মেডিকেল সায়েন্সের কঠিন কঠিন টার্ম তিনি মুখস্থ করবেন, হাত উঁচিয়ে উঁচিয়ে সেসব মানুষকে বোঝাবেন—এটাই তো স্বাভাবিক; কিন্তু এ আবার কেমন ডাক্তার, যিনি কঠিন মেডিকেলীয় টার্মের বদলে স্টেজে দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত নম্বর, হাদিস নম্বর, ফতোয়া নম্বর , বেদ, গীতা, রামায়ণ, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে এক নিঃশ্বাসে বলে যান। একটু থামাথামি নেই। স্টেজের সামনে রথী-মহারথী, সেলেব্রেটি, ধর্মগুরুরা আসীন। সবাই এই লোকের উপস্থিত বক্তৃতা, মেধা আর তার প্রয়োগ দেখে অবাক। একটু পরপরই সবাই হাততালি দিয়ে লোকটাকে অভিবাদন জানাচ্ছে।[১] একটা লোক কীভাবে এতকিছু একসাথে মুখস্থ রাখে? তাও আবার বইয়ের নাম, পৃষ্ঠা নম্বর, লাইন নম্বরসহ! আমি অভিভূত হলাম। এটা কীভাবে সম্ভব!

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, কোনো এক বিখ্যাত ব্যক্তি নাকি যেকোনো বই একবার পড়েই বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলতেন। এর কারণ, একবার পড়লেই নাকি তার সব মুখস্থ হয়ে যেত। সেই বিখ্যাত ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। কিন্তু কোট-টাই পরা এই লোকটিকে দেখে আমার মনে হলো, আল্লাহ তাআলা মনে হয় কাউকে কাউকে অসীম অনুগ্রহ দান করে থাকেন। ইনিও তাদের মধ্যকার একজন।

যে চ্যানেলে এই লোকটিকে প্রথম দেখি, সেই চ্যানেলটার নাম 'পিস টিভি'। আস্তে আস্তে নিয়মিত এই চ্যানেল দেখা শুরু করলাম। টিভি অন করে 'পিস টিভি' খুলে বসে অপেক্ষা করতাম। কবে আসবে সেই কোট-টাই পরা লোকটি। কখন শুনবো তার মনোমুগ্ধকর কথামালা। লোকটির নাম জাকির নায়েক। ডাক্তার জাকির নায়েক। জন্মেছেন আমাদের পাশের দেশ ভারতে।

---

১ উল্লেখ্য, হাততালি দেওয়া একটি গর্হিত কাজ এবং তা পরিত্যাজ্য। কখনো কখনো ইসলামি সভা-সম্মেলনেও অত্যুৎসাহী দর্শক-শ্রোতাকে হাততালি দিয়ে আলোচককে অভিবাদন জানাতে দেখা যায়। অভিবাদন জানানোর জন্য আরও অসংখ্য পন্থা আছে। তাই হাততালির বিষয়টি অবশ্যই বর্জনীয়। প্রয়োজনে দেখুন— https://islamqa.info/ar/105450 ।—শরয়ি সম্পাদক

Scanned with CamScanner

নিয়মত পিস টিভি দেখার মধ্য দিয়ে আমি খেয়াল করলাম, আস্তে আস্তে আমার মাঝে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। নামাজ পড়া শুরু করলাম নিয়মিত। এক সময়ে লোক দেখানো কিংবা নেহাৎ সমালোচনার ভয়ে নামাজ পড়লেও, এরপর থেকে মন থেকেই নামাজ পড়তে শুরু করলাম। আখেরাতের ভয় মনের মধ্যে জেঁকে বসেছে তখন। ওয়াজ মাহফিলগুলোতে যাওয়া শুরু করলাম। জামআতবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে লাগলাম। বন্ধুদের নিয়ে আর সিনেমা দেখতে যাই না। আড্ডা দিই না। অহেতুক সময় নষ্ট করি না। দীন তখন আমার ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হতে শুরু করল। আমার জগত তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ধাবমান। আমি আবিষ্কার করলাম, আমার অন্তরে শান্তির মোলায়েম বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। নিজের ইমানকে পাকাপোক্ত করা এবং আমলের পরিমাণ বাড়ানোতেই তখন আমার সবরকম মনোযোগ। দাঁড়ি-টুপিতে তখন আমি যেন এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা, যে জগতে মৃত আত্মারা প্রাণ ফিরে পায়, মৃত অন্তর ফিরে পায় তার চিরন্তন সজীবতা।

নিজের অ্যাকাডেমিক পড়াশোনাতেও আগের চেয়ে বেশি মনোযোগী হতে শুরু করেছি। স্টুডেন্ট হিসেবে কখনোই খারাপ ছিলাম না। প্রাইমারি, মাধ্যমিক সবগুলোতেই স্কলারশিপ পেয়েছি এবং জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম।

কেবল পড়াশোনায় ভালো হবার ফলে সকলের কাছে আমি প্রশংসার পাত্র ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি দীনে ফিরে আসি, দাঁড়ি রাখি এবং নামাজ-রোজার প্রতি ঝুঁকে পড়লাম, আমার চারপাশের চেনা পরিবেশটাই যেন হঠাৎ করে আমার কাছে অচেনা হয়ে গেল। আমার কাছের মানুষগুলোই যেন দূরে সরে যেতে লাগল। দাঁড়ি রাখার ফলে কত লোকের কত কটুকথা যে শুনতে হয়েছে আমাকে—তার ইয়ত্তা নেই। আমার দাড়ি নিয়ে স্যারেরা বিদ্রুপ করত। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলত, "ছেলেটা আবার জঙ্গির সাথে যোগ দিল নাকি?"

কিছু কিছু আত্মীয়দের কাছে শুনেছি, আমাকে নিজেদের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও নাকি তারা সংকোচ বোধ করে। কেন? কারণ, আমার দীন। আমার লেবাস। মাধ্যমিকের পরে ইচ্ছে ছিল নটরডেমে ভর্তি হবো। পরে শুনলাম, সেটা নাকি খ্রিস্টানদের কলেজ। সেখানে ভর্তির জন্যে ক্লিন সেভড হতে হয়। ভয়ে নটরডেমে পড়ার ইচ্ছাকে মাটিচাপা দিয়ে দিলাম।

Scanned with CamScanner

সবচেয়ে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হয়, যখন এইচএসসিতে রাজশাহী পড়তে যাই, তখন। বাংলাদেশে তখন অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল। সবদিকে দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের ধরপাকড়, মার মার অবস্থা। আলহামদুলিল্লাহ, ক্যাম্পাসে এক কঠিন অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আমি সুন্নাহর উপর অটল, দৃঢ় ছিলাম।

এরকম কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। একদিকে কাছের মানুষদের বিমুখতা, একদিকে দাঁড়ি-টুপির উপর খড়গহস্ত পরিবেশ, অন্যদিকে মেডিকেলে পড়ার সুতীব্র ইচ্ছা। আলহামদুলিল্লাহ, মহান রাব্বুল আলামিন আমাকে নিরাশ করেননি। আমি মেডিকেলে চান্স পেলাম। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ করে দিলেন রাব্বে কারিম।

মেডিকেলে আসার পরে মনে হলো—নতুন আরেক জগতে চলে এসেছি। এখানকার স্যার আর ম্যাডামদের অবস্থা আরও খারাপ। সার্জারির ক্লাসে সেদিন প্রথম। আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন জনৈক প্রফেসর। ভদ্রলোক তার নামের আগে মুহম্মাদ লেখেন। পড়াচ্ছিলেন সার্জিকেল ইন্সট্রুমেন্টস। আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলছিলেন—"এটার নাম অ্যালিস টিস্যু ফরসেপ। এটা কিন্তু মুসলমানদের আলি-রা: এর ফরসেপ না, মুসলমানদের মাথায় মারামারির চিন্তা ছাড়া ভালো কোনো চিন্তা নাই"।

আরেকদিন, কমিউনিটি মেডিসিনের জনৈক ম্যাডাম আমাকে বললেন—"এই, তোমরা যে মাটিতে টিপ দাও, কী লাভ হয় এতে?"

আফসোস! অথচ, তিনি মুসলিম পরিবারের মেয়ে।

ওই একই ডিপার্টমেন্টের অন্য একজন শ্রদ্ধেয়া ম্যাম তার লেকচার ক্লাসে বলছিলেন—"আমি শুনলাম, তোমাদের হোস্টেলে নাকি নামাজের জন্যে চাপ দেওয়া হয়? আমি যেহেতু একাডমিক কাউন্সিলের একজন সদস্য, এ ব্যাপারে অবশ্যই দাবি উত্থাপন করব, যেন নামাজের জন্যে আর ডাকাডাকি না করা হয়।"

মেডিকেলে একটা ব্যাপার আছে। চাইলেই কেউ স্যার বা ম্যাডামদের বিপক্ষে কথা বলতে পারে না। কেননা, আমাদের পাশের বেশিরভাগ নম্বর আসে ভাইভা থেকে। সুতরাং কোনো ভাই যদি এসবের বিপক্ষে মাথা তুলে জবাব দেন, আর দুর্ভাগ্যবশত

Scanned with CamScanner

প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত দেখাতে না পারেন, তাহলে তাকে আর পাশ করতে হবে না। ওই ম্যাম ভাইভা নিলে তো ফেল করাবেনই, তবে তিনি যদি সুযোগ না পান, তাহলে অন্য স্যার বা ম্যামের মাধ্যমে ফেল করানোর বন্দোবস্তটাও সেরে ফেলবেন।

যা বলছিলাম, মেডিকেলীয় জীবনে মুসলমানিত্বের আড়ালে, নাস্তিক্যবাদ আর সেক্যুলারিজমের ছড়াছড়ি। এখানে কেউ দাড়ি-টুপি পরলেই 'হুজুর' ট্যাগ পেয়ে যায়, এবং এই হুজুরদের ভুলগুলো সবসময় 'বড় ভুল' হিসেবে দেখা হয়। মনে হয়—যেন তারা অচ্ছুৎ। অথচ অন্যরা শত শত ভুল করলেও, তাদের সবসময় মার্জনার চোখে দেখা হয়। বিষয়টি সামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বলা চলে। আমি যখন প্রথম পেশাগত পরীক্ষার ভাইভা দিচ্ছিলাম, ভাইবা বোর্ডে কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। শ্রদ্ধেয় ইন্টারন্যাল ম্যাম আমাকে বলেছিলেন,—"কী হুজুর, নামাজ পড়তে পড়তে তো কপালে দাগ লাগিয়ে ফেলেছ দেখছি। প্রশ্নের উত্তর দিতে পার না কেন? খালি নামাজ পড়লেই হবে, পড়াশোনা করা লাগবে না?"

নামাজের সাথে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা বা না পারার কী সম্পর্ক, তা আমি বুঝিনি সেদিন। ভাইবা বোর্ডে একজন পরীক্ষার্থী সব প্রশ্নের উত্তর দিতে যে সমর্থ হবে, এমন নয়। তাই বলে তিনি আমার ধার্মিকতা নিয়ে কটাক্ষ করবেন কেন? নেহাত ইসলামবিদ্বেষ। অন্য কাউকে এরকম কিছু বলে এতটা মজা তিনি পান না, যতটা আমার ক্ষেত্রে পেয়েছেন। নিশ্চয় আমার মুসলমানিত্ব নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন, অথবা অন্যরা যেন নামাজ না পড়ে সে ব্যাপারে তিনি অধিক তৎপর।

এসব যে শুধু আমার সাথে হয়—এরকম কিন্তু নয়। যারা যারাই আমার মতো দীন মোতাবেক, দীন মেনে চলার চেষ্টা করে, তালেবে ইলম হবার চেষ্টা করে, তাদের প্রত্যেকের সাথেই এরকম করা হয়।

আমাদের প্র্যাকটিসিং বোনদেরও যে কত ভোগান্তি পোহাতে হয়, তার সাক্ষী আমরা নিজেরাই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বোনদের ভোগান্তিটা অনেক বেশি। প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টের আমাদের জনৈক ম্যাডাম মেয়েদের পর্দা করা একদমই সহ্য করতে পারেন না। একদিন ক্লাসে বললেন,—"হিজাব পরতে এবং খুলতে তো অনেক সময় লাগে। এই সময়টা প্র্যাকটিকেল লেখায় ব্যয় করলেও তো বেশ কাজে আসে"।

এমন মন্তব্যে মাথা নিঁচু করে ঝিম মেরে সহ্য করা ছাড়া আমাদের আর কীইবা

Scanned with CamScanner

করার থাকে? যেসব বোনেরা হিজাব পরেন, তাদের জঙ্গি বলে সম্বোধন করা। শ্রদ্ধেয় আরেক ম্যাডাম, ক্লাসে যারা দেরি করে আসেন তাদের 'রোহিঙ্গা' বলে গালি দিয়ে পরম তৃপ্তি পান।

শুধু কী স্যার আর ম্যাম? দীন পালন করতে গিয়ে ক্যাম্পাসের সিনিয়র বড় ভাই এবং আপুদের (যারা মোটাদাগে রাজনীতির সাথে যুক্ত) কাছে কতভাবে অপমান, অপদস্থ হতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।

কারও বার্থডে সেলিব্রেইট না করলে, সে উপলক্ষ্যে টাকা চাইলে যদি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানাই, যদি বিভিন্ন দিবসে উপস্থিত না থাকি তো আমাদের অকথ্য ভাষায় অপমান করা হয়।

তবুও, যে হিদায়াতের রাস্তা আমার, আমাদের সামনে খুলে গেছে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেই পথে অটল থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুর এই পথে আমাদের বন্ধু, আশ্রয়দাতা, সাহায্যদাতা একমাত্র আমাদের রব।

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[১]"

১ সূরা ফাতিহা, ০১ : ০৪

Scanned with CamScanner

টাইট্রেশন

ডা. শামসুল আরেফীন, এমবিবিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, লেখক, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড

- 'আচ্ছা তোরা রাজনীতি করতে চাস কেন? একজন একজন করে বল'।
- 'ভাই, আমি ইঁদুরের মতো বাঁচতে চাই না'।

হিদায়াত, পথের খোঁজ। কোন পথ? কেমন সে পথ? পিচঢালা, না মেঠো, না ডিজিটাল? সে পথ বড় সহজ, বড় আরাম। ছোটবেলা থেকে আমাদের মাথায় পুঁজিবাদী, 'স্বল্পমূল্যে শ্রমসন্ধানী' সিস্টেম একটা কথা শিখিয়ে দিয়েছে—লাইফ ইজ নট অ্যা বেড অব রোজেজ। জীবনটা ফুলের বিছানা নয়। জীবন খুব কঠিন, টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে। বস্তুবাদী সমাজে বস্তু কেনার যোগ্যতা চাই, না হলে কমফোর্ট জোনে থাকতে পারবা না । লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে সে। গাড়ি-বাড়ি-নারী-কাঁড়িকাঁড়ি কড়ি-ছড়ি এগুলোর জন্য দৌড়াও, ভাগো।

আরেকটা পথ আছে, কমফোর্ট জোনে ঢোকার পথ, আরাম-শান্তি-সুখের পথ। কমফোর্টের জন্য যে পথে উন্নত বস্তু লাগে না, কুঁড়েঘরেই-অর্ধাহারেই-হাঁটাপায়েই সেখানে কমফোর্ট মেলে। অর্জনের প্রতিযোগিতা নেই সেপথে। শুধু আছে বিসর্জনের প্রতিযোগিতা। 'বস্তু ভোগের মাঝে তৃপ্তি' আগের ওই পথে। আর এই পথে —'ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ', আসল সুখ।

এই পথের সন্ধান পাওয়াকেই বলছি হিদায়াত, যে পথের দুধারে ফুলের মতো ফুটে থাকে সুখেরা। আমি কোনো কিতাবী নীতিবাক্য বা কম্যুনিজমীয় ইউটোপিয়া বা ঠাকুরমার ঝুলির কথা বলছি না। রেগুলার শেভের আড়ালে পাকা দাড়ির গোড়ার মতো বাস্তব, কড়া মেকআপের আড়ালে প্রৌঢ়ার ভাঁজ পড়া চামড়ার মতো বাস্তব

Scanned with CamScanner

এক পথের অস্তিত্ব জানাচ্ছি আপনাদের, যেখানে সুখের অভিনয় করে প্রতি মুহূর্তে মরতে হয় না। সে রাস্তায় 'দম নিলেও' ঘ্রাণ পাওয়া যায় সুখের, এতটাই সস্তা সেখানে সুখ। একটা ছেলের গল্প শোনাবো আজ।

'ছেলেটি'র জগতটাও টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত-সন্তানের জীবন-দর্শনে ঠাসা। পুঁজিবাদের সেবা করে নিজের কমফোর্ট জোন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য 'পুঁজিবাদের ঠিক করে দেওয়া শিক্ষাটা' ভালোমতো আয়ত্ত করা জরুরি। যেখানে ভালো বাবা, ভালো স্বামী, ভালো সন্তান কীভাবে হতে হয়—তা নেই। ভালো চাকর হয়ে কীভাবে ভালো চাকরি করা যায়, শুধু সেটা শিখলেই যথেষ্ট। এরপর বস্তু আহরণের জন্য এমনভাবে চাকরগিরি করবে, যাতে সন্তান বাপ-মাকে কাছে না পায়। বস্তুর জন্য যৌতুক চেয়ে বউ পেটাতেও না বাধে। আর, বুড়ো বাপের সম্পত্তি লিখে নিয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে নিজের কমফোর্ট জোন নিশ্চিত করা যায়। ভালো বাবা, ভালো স্বামী, ভালো সন্তান হওয়া শেখেনি যে, শিখেছে শুধু বস্তু লাগবে নিজের কমফোর্টের জন্য—গাড়ি-বাড়ি-আইফোন-বাইক। সে জগতে বস্তুই সব, বাকি সব মিথ্যে।

তো, দক্ষ চাকর হবার জন্য ছেলেটা ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হলো। সেখানে নাকি চাকর হবার সব গুণগুলো বিকশিত হয়—মনিবের ভাষায় পটাপট কথা বলা, কো-কারিকুলার্স, সুস্থ-সবল-বেশি কর্মক্ষম চাকর তৈরি। ভালো অর্থেই বললাম। ডানপিটে ছেলেটা কঠোর নিয়মের মাঝে আবিষ্কার করে বসল এক মহাসত্য—নিয়ম ভাঙার মজা। জামাআতের সাথে মাগরিবের নামাজ পড়াটাও একটা নিয়ম ছিল সেখানে। আল্লাহ তাকে মাফ করুন।

আবারও ওই নিয়মের ভয়েই আইএসএসবি-তে গ্রিনকার্ড পেয়েও গেল না ছেলেটা। ভার্সিটি লাইফ এনজয় করতে হবে তো। ফ্রেন্ডস-আড্ডা-ঘোরাঘুরি-বিপরীত-লিঙ্গের সান্নিধ্য—এসব ছেড়ে আর্মিতে গিয়ে যৌবন বরবাদ করার কোনো মানে হয়? শেষমেশ স্বপ্নের ঢাবি ক্যাম্পাসে কাঙ্ক্ষিত সাবজেক্ট (জেনেটিক্স) না পেয়ে একপ্রকার হতাশ হয়েই ভর্তি হলো ঢাকার এক সরকারি কসাইখানায়। কাহিনি শুরু হচ্ছে এখন...

প্রথম ফোঁটা :

- 'বাবা, এদিকে আয়, দেখে যা'
- 'জি আব্বু, আসছি...'

Scanned with CamScanner

- 'এই দ্যাখ, এই লোকটা ডাক্তার। দ্যাখ কীভাবে অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেয়। একদম মুখস্থ। শোন একটু'

- 'তাই নাকি? আচ্ছা লোক তো!'

টিভিতে দাড়িওয়ালা, কোট-টাই পরা হালকা-পাতলা গড়নের এক লোক। 'স' উচ্চারণে একটু সমস্যা, 'নাম্বার ওয়ান' বলার সময় বুড়ো আঙুল আগে তোলে। খ্রিস্টান পাদরি যেন আজন্ম-বোবা, হিন্দু পণ্ডিত যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ছেলেটা মুগ্ধ হয়ে দেখে আর ভাবে—আমিও তো ডাক্তারি পড়ি, আমিও তো পারি এমন করে মানুষের হিদায়াতের উসিলা হতে।

ছেলেটা কল্পনায় স্টেজে লোকটার জায়গায় নিজেকে ভাবে। 'নাম্বার ওয়ান' বলার সময় বুড়ো আঙুল আগে দিয়ে। পটাপট বলে চলে বাইবেল-গীতা-ঋগবেদ-কুরআনের চ্যাপ্টার-ভার্স নাম্বার। আমাদের ছেলেটার কুরআনের অনুবাদ পড়ার আগেই 'ইংরেজি একটা বাইবেল' আর 'গসপেল অব বার্নাবাস' শেষ হয়ে গেল। ডাউনলোড হয়ে গেল বেদের সব খণ্ডই, 'আফ্রিকান ধর্মগুলোর পবিত্র শ্লোক' আর 'প্রাচীন চৈনিক ধর্মপুস্তক'। 'ডেড সি স্ক্রল' নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখত, আর সুরিয়ানি ভাষায় (আরামায়িক, ইসা আলাইহিস সালাম-এর নিজের ভাষা) লিখত খাতার মলাটে নিজের নাম। এভাবেই চলছিল ফার্স্ট ইয়ারের সোনালি দিনগুলো।

ভালো চাকর হবার প্রতিযোগিতা কেড়ে নিল সব। সঅঅঅব। ভয়ংকর সব বই, হোস্টেল লাইফ আর কিন্নরী হাসিগুলো 'আসল' রাস্তায় ফিরিয়ে নিল ছেলেটাকে। হঠাৎ একদিন দেখল, ভার্সিটি লাইফ যতটা হৈ-হুল্লোড় হবার কথা ছিল, অতটা আর হচ্ছে না। মেডিকেল কলেজের টিচারদের কড়া শাসন আর প্রথম ব্যাচের হম্বিতম্বিতে সব বরবাদ হচ্ছে, কিন্ডারগার্টেন বানিয়ে ফেলেছে একদম। এভাবে তো আর চলে না। এই প্রেসার থেকে উত্তোরণের পথও পাওয়া গেল—ছাত্ররাজনীতি। সীনা টান টান করে হাঁটা। টিচার-সিনিয়র-জুনিয়রদের সমীহের দৃষ্টি, দাবি-আন্দোলনের অ্যাডভেঞ্চার। হুমমম, চেতনার ডিলারশিপ নিয়ে নিল ছেলেটা। কেন রাজনীতিতে আসতে চাচ্ছে, বড়ভাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি জবাব দিয়েছিল—'ভাই, আমি ইঁদুরের মতো বাঁচতে চাই না'।

আর চেতনার সাথে একটু এসব না হলে চলে? এসবের সাথে একটু 'ওসব' না হলেও 'সেসব' তো লাগেই। না হলে রাজনীতি জমেই না মোটে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় ফোঁটা :

প্রথম ব্যাচে লেবাস-পোশাকে হুজুর একজনই। চোখে পড়তেন না তেমন। করিডোর ধরে হেঁটে যেতেন শান্ত, সমাহিত, মাথানিচু করে। পিঠে থাকত পুরোনো আমলের একটি ব্যাগ। কথা হয়নি কখনো। দ্বিতীয় ব্যাচে সবাই নেতা। আমাদের আলোচ্য ছেলেটার ব্যাচে পোশাকী হুজুর নেই, চতুর্থ-পঞ্চম ব্যাচেও না। ষষ্ঠ ব্যাচে হঠাৎ করে ৫টা জবরদস্ত হুজুর এসে পড়েছে। ডিলারশিপের আওতায় 'মুরগি ধরা' একটা দায়িত্ব। কিন্তু এই কতগুলো মুরগি, যাদের ধরা যায় না। এদের পোশাক এদের রক্ষা করে দুই গ্রুপের টানাটানি থেকে, বাতিলের দৃষ্টি থেকে। পোশাকের শক্তি। কেউ একজন এদের রক্ষা করছে আমাদের শ্যেণদৃষ্টি থেকে। রুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আমাদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই।

আগে ছিল একজন, এখন হলো ৬ জন। এখন চোখে পড়ে বেশি, বার বার। নতুন কিসিমের মানুষ। এতদিন জানতাম, মাদ্রাসার ছেলেরা দাড়ি-টুপি-পাঞ্জাবীওয়ালা। এখন দেখি মেডিকেলেও। ছেলেটার ব্যাচে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে একটা ছেলে এসেছিল। দাড়ি আছে, শার্টপ্যান্ট পরে। কিন্তু এই হুজুরগুলোর মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডও নেই। এতদিন একটা লজিক দাঁড় করিয়েছিল ছেলেটা। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলে বলবে—'মালিক, আপনি আমাকে মাদ্রাসায় পড়ালে টুপি-দাড়ি-পাঞ্জাবি পরতাম। আপনি আমাকে পড়িয়েছেন ডাক্তারি। তাই টাখনুর উপর প্যান্ট-দাড়ি-টুপি এসব রাখিনি'। এখন দেখা যাচ্ছে—লজিকটা মার খেয়ে যাচ্ছে।[১] ছেলেটা তার কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পায়, আল্লাহ এই ৬ টার একটাকে সামনে এনে বলছেন—'এও তো মাদ্রাসায় পড়েনি। এ তো পেরেছে। তুমি এমন কী হয়ে গিয়েছিলে যে পারনি?'

কী জবাব দেবে ছেলেটা তখন? আছে কোনো জবাব?

তৃতীয় ফোঁটা :

মুরগি ধরার একটা স্ট্র্যাটেজি হলো, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে ওঁৎ পেতে থাকা। যেসব মুরগি সরাসরি কোনো গ্রুপে আসতে চায় না, তাদেরকে সাংস্কৃতিক উইং-এর সদস্য বানিয়ে কর্মী না হোক, স্রেফ সমর্থক বানিয়ে রাখা। আরেক গ্রুপও

---

১ কিয়ামত দিবসে পৃথিবীর কোনো লজিকই কোনো আসবে না। এখনের সাজানো প্ল্যান সেই কঠিন মুহূর্তে স্মরণেও আসবে না। এরপরও মানুষ তো কত স্বপ্নই দেখে আর কত লজিকই রচনা করে ব্রেইনে গেঁথে রাখে। আশাগুলো সেদিন হয়ে যাবে দুরাশা, স্বপ্নগুলো হবে শুধুই মরীচিকা। —শরয়ি সম্পাদক

Scanned with CamScanner

নিতে পারল না, আবার কাজেকর্মেও পাওয়া গেল। কলেজে কালচারাল প্রোগ্রাম বলতে সারা বছরে দুইটা। ছেলেটার গ্রুপ করে সরস্বতী পূজার প্রোগ্রাম, আর বিপরীত গ্রুপ করে 'সন্ধানী' বার্ষিক প্রোগ্রাম। ধর্ম যার যার, স্বরস্বতী পূজা সবার। হিন্দুরা কমিটিতেই আছে। স্টেজ সাজানো, পারফর্ম করা, গেট সাজানো, মূর্তি ধরে এনে স্থাপন করা—এগুলো মুসলিমদেরই কাজ। নামাজ-রোজা খুব একটা না করলেও পূজার কাজে উৎসাহের অন্ত নেই তাদের। ছেলেটার আবার ক্যাডেট কলেজে পড়ার সুবাদে কো-কারিকুলারের তালিম ছিল ভালোই। এখন বেশ 'কাজে' লাগছে।

কাল পূজা। বিকেলে কালচারাল প্রোগ্রাম। পুরো কলেজ সাজানো হচ্ছে। 'বিদ্যার' দেবী বলে কথা। স্টেজ ডেকোরেশনের জন্য বিশাল স্বরস্বতীর মূর্তি আঁকা হচ্ছে। ছেলেটা আরও দুই মুসলিম সিনিয়রের সাথে আঁকছে। এর পিছনে লাইট ফেলে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ স্টেজটা বানানো হচ্ছে এবার। ওদের সন্ধানীর স্টেজকে বেশ টেক্কা দেওয়া হবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে ব্রাশ করতে করতে বাইরে উঁকি দিল। হুজুরগুলোর হাতে কোদাল, ঝুড়ি। কী ব্যাপার? ওওও, আচ্ছা। হোস্টেলে ডাইনিং-এ ছোট্ট জায়গা নিয়ে মসজিদটা অস্থায়ী । বড় মসজিদ চাই। হুজুররা আরও কিছু হুজুরমনাদের সাথে নিয়ে নেমে পড়েছে জায়গা সাফ করতে। হোস্টেলের সারা বছরের আবর্জনায় মেখে একেকজন যাচ্ছেতাই অবস্থা।

এরা মসজিদ বানানোর জন্য ময়লা মাখাচ্ছে গায়ে, আর ও কিনা সরস্বতীর ছবি এঁকে ময়লা হচ্ছে?—ময়লা হচ্ছে তো দুজনই। অথচ কী আকাশ-পাতাল তফাৎ। এক নিমেষে মাত্র চিন্তাটা উঁকি দিয়েই হারিয়ে যায়। মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে ছবি আঁকায় ফিরে যায় আমাদের 'ছেলেটি'।

চতুর্থ ফোঁটা :

ফার্স্ট ব্যাচের এক সিনিয়রকে জঘন্য লাগত ওর। ওভার-এক্সপ্রেশান। টেবিল টেনিস খেলছেন তো খেলেন ভাই, এত টেবিল থাপড়ানো, চিল্লাচিল্লি করার কী আছে? টিটি টেবিলটা আবার ছেলেটার রুমের পাশেই। যা করছে, তার দশগুণ চিল্লাপাল্লা, শো-অফ। বিরক্তিকর। ফাইনাল পরীক্ষার পর ভাইকে অনেকদিন দেখা যায় না। যাক, ক'টা দিন শান্তিতে থাকা গেল, যত্তোসব। হঠাৎ একদিন ভাইকে দেখা গেল। বড় দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি, মাঝেমাঝে পাগড়ি। কী ব্যাপার? তাকে দেখে আগের মতো বিরক্ত লাগছে না কেন? হাসি দিয়ে প্রথম কথা বললেন—'তোমাদের বিভিন্ন সময় কষ্ট দিয়ে থাকতে পারি, মাফ করে দিয়ো ভাই'।

Scanned with CamScanner

ঘুরে গেল মাথাটা। গা-জ্বলা লোকটা কোন জাদুতে প্রিয়দর্শন হয়ে গেল! ভাইয়ের রুম থেকে মসজিদে যাবার পথে ওদের রুম পড়ে। যেতে যেতে শান্ত সুরে ভাই ডেকে যেত—আসি ভাই, জোহরের নামাজ, এশার নামাজ। ফাহিম, সোহেল, আসো ভাই। কোনো চেঁচামেচি নেই, কণ্ঠভরা মায়া, যেন কেঁদে কেঁদে ডাকছে কেউ। আমাদের ছেলেটাকে তাবলিগের ছেলেরা দাওয়াত দিতে আসত না। হয়তো 'গণ-কেস' মনে করত। ভাই এসে মাঝে মাঝে ফাহিমকে মসজিদে যাবার দাওয়াত দিয়ে যেত। কিন্তু ভাইয়ের এই প্রতি ওয়াক্তে হেঁটে যাওয়াটাই আমাদের ছেলেটার জন্য মারাত্মক এক দাওয়াত ছিল, ভাই জানতও না। 'সুন্নাহ' নিজেই দাওয়াত। আপাদমস্তক সুন্নাহ নিয়ে কেউ হাঁটবে, আশপাশের লোকেরা দাওয়াত নিতে থাকবে। সে দাওয়াত জবানের চেয়ে স্পষ্ট, ভাষার চেয়ে শক্তিশালী।

পঞ্চম ফোঁটা :

তখন ফাইনাল ইয়ার। ছেলেটা রুমমেটদের সাথে সারারাত তাস খেলত, আর সারাদিন ঘুমাত। ক্লাসে যেত না। ৭৫% উপস্থিতি না থাকলে ফাইনালে বসতেই পারবে না—সে চিন্তা ছিল না ওদের। ভাবত, এত বছর রাজনীতি করেছি, নেতাদের সেবা করেছি। পরীক্ষায় বসতে না দিলে 'কাবজাব' দিয়ে প্রেসারাইজ করে বসে পড়ব। আর বসতে পারলেই একমাসে সব পড়ে উল্টায়ে দেবো। আর বাই চান্স কোনো ভাইভা একটু খারাপ হলে পলিটিক্যাল 'জ্যাক' দিয়ে তো উতরানো যাবেই। অবশ্য ব্যাচে কেন জানি ওদের 'মেধাবী' বলে সুনাম ছিল। কিন্তু মেডিকেলে মেধার চেয়ে জরুরি হলো অধ্যবসায়। বুঝবে বাছাধন, বুঝবে।

রুমমেট মুজাহিদের জ্বালায় ওরা অতিষ্ঠ। কমবখতের শরীরটা পাহাড়ের মতো বলে ওকে বেশি কিছু বলাও যাচ্ছে না। ইজতিমা থেকে আসার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে, প্যান্ট টাখনুর উপর কেটেকুটে একাকার। তাও ঠিক আছে, সই। রাতে তাস খেলার সময় ১০ টা বাজলেই লাইট অফ করতে বলে। আর সারারাত তাস খেলে ফজরের আজান পড়লে ওরা যখন শুতে যাবে, তখন ডাকাডাকি শুরু করে। দোস্ত, ওঠ, ঘুম থেকে নামাজ উত্তম, নামাজ পড়ে শো', সৌর-সোহেল-ফাহিম। উফ, পাহাড়ের সাথে ঝগড়াঝাটি করাও ঠিক হবে না। সারাদিন ঘুমকাতুরে কুম্ভকর্ণ মুজাহিদ তখন আমাদের সারাদিন নসিহতের উপর রেখেছে। হোস্টেলটার হলো কী? কী বড়ি খেয়ে চেনা মানুষগুলো কী রকম জানি হয়ে যাচ্ছে, একদম অচিন মানুষ।

Scanned with CamScanner

ষষ্ঠ ফোঁটা :

আজ একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেছে ছেলেটার সাথে। আজ বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের নির্বাচন ছিল। ছেলেটার গ্রুপের প্রিয় ডাক্তার নেতা বড় পোস্টে লড়ছেন। পুরো গ্রুপ প্রেসক্লাবের সামনে বিএমএ অফিসে গিয়েছিল আজ। ফুলের মালায় বরণ করে নিল বিজয়ী নেতাকে। রাত ১১টার দিকে সবাই ক্যাম্পাসে ফিরছিল। পেয়ে গিয়েছিল ফাঁকা একটা ৮ নম্বর বাস। আসাদগেট আড়ং-এর মোড়ে ধানমন্ডির দিক থেক ট্রাকটা আসছিল ফুল স্পিডে। বাসে ওঠার সময়ই ড্রাইভারটাকে গড়বড় মনে হচ্ছিল। ছেলেটা, ফাহিম আর মিঠুন ভাই ছিল ড্রাইভারের বামপাশের মহিলা সিটে। ওরা দেখছে ট্রাকটা স্পিড কমাচ্ছে না, বাসওয়ালাও পিনিকে ডানে কাটছে না, সামনেই যাচ্ছে। সবাই হই-হই করে উঠল একসাথে, চিৎকারে ড্রাইভার কিছুটা হুঁশ ফিরে পেল বোধহয়। পুরো ডানে কাটার চেষ্টা করল। ভালো একটা ঘষা দিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা।

ক্যাম্পাসে পৌঁছে সবাই ড্রাইভারটাকে পিটিয়ে পুলিশে দিচ্ছে। অন্য সময় হলে ছেলেটাও সোৎসাহে শরিক হতো। আজ সে সবাইকে ফেলে হাঁটা দিয়েছে হোস্টেলের দিকে। পিছনে উন্মত্ত জটলা রেখে, ধীরপায়ে। যেন ঝড়ের বিপরীতে হাঁটছে, ঝড় তো হচ্ছেই কোথাও। সব ঝড় কি দেখা যায়?

৭ম ফোঁটা :

খবরটা হলো, ওরা পরীক্ষায় বসতে পারছে না এবার। ৭৫% উপস্থিতি ছিল পরীক্ষায় বসার শর্ত। ৫০% যাদের ছিল তারাও অনুমতি পেয়েছে। ১ম লিস্ট, ২য় লিস্ট, ৩য় লিস্টেও নাম নেই ওদের। এককেজনের উপস্থিতি ৩০-৩৫% এর বেশি না। পাগলের মতো ছুটছে নেতাদের দুয়ারে দুয়ারে। কিন্তু কোনো 'মেকানিজমে'ই কাজ হচ্ছে না। মিটিং হচ্ছে, কিন্তু স্যাররা নাছোড়বান্দা। না, ওদের বসতে দেওয়া হবে না, তাহলে পরের ব্যাচগুলো আর ক্লাস করবে না। আর এবার টাইট দিলে পরের ব্যাচগুলো ক্লাস করবে ঠিকমতো। কোনোভাবেই বসতে দেওয়া হবে না। নেতারাও বলে দিল, 'ঠিক আছে। পরের বার বসো'।

পুরো জীবনে ওরা কখনো ফেল করেনি। ছেলেটা ক্যাডেট কলেজের। তিনজন নটরডেমের। একজন রাইফেলস পাবলিক, একজন বঙ্গবন্ধু কলেজের ফার্স্ট বয়। যতটা না পরীক্ষায় বসা দরকার, তার চেয়ে বেশি ইমেজ ইস্যু। মা-বাবা জানলে,

Scanned with CamScanner

তার চেয়ে বেশি টেনশন—আত্মীয়স্বজন জানলে? এতটা কঠিন পরিস্থিতি কখনো হয়নি জীবনে। পরীক্ষার বাকি আর ৮ দিন মাত্র। সিগারেটের ধোঁয়া সবাই দেখে, অন্তর পোড়া ধোঁয়া দেখা যায় না।

বিকেলে দরজায় নক। তাবলিগের ভাইয়েরা এসেছে ফাহিমের কাছে। ছেলেটা শুয়ে শুয়ে শুনছে আর জ্বলছে, জ্বালাচ্ছে। আজ মাগরিবের পর পরীক্ষার্থীদের জড়ো করা হবে। কাকরাইল থেকে মুরুব্বিরা আসবেন, এশা পর্যন্ত কথা হবে। এরপর খানাপিনা। প্রতি বছরই আয়োজন হয় নাকি। যে ছেলেটা ডাকতে এসেছে তার শুরুর কথাগুলো কেমন যেন...সবকিছু করনেওয়ালা সত্তা একমাত্র আল্লাহ। ততটুকুই হয়, যতটুকু আল্লাহর চান। যাকে আল্লাহ হেফাজত করেন তাকে সারা পৃথিবী মিলে ক্ষতি করতে পারে না, যার ক্ষতি আল্লাহ করেন সারা পৃথিবীর সব শক্তি মিলে তাকে উপকার পৌঁছাতে পারে না...।

বহুদিন পর মসজিদে এলো ছেলেটা। চামড়ার মোজা পরা ছেলেটার কথাগুলো অন্যরকম ছিল একদম। তাই তো, যদি আল্লাহ না চান, কেউ বসাতে পারবে না পরীক্ষায় তাকে, কেউ না। মন দিয়ে বয়ানটা শোনে ও। একজন মুফতি সাহেব, আগে ঢাকা ভার্সিটির ফার্মেসিতে পড়েছেন, পরে কওমিতে মুফতি পড়েছেন। আশ্চর্য সব কথা। সব কথার মাঝে নিজের একটা ঘটনা শোনালেন মুফতি সাহেব। তারা ব্রাজিলে ছিলেন জামাতে। ধরুন, বড় একটা ঘর অন্ধকার। আপনার হাতে মোমবাতি। ঘরে আরও কয়েকটা মোমবাতি আছে নেভানো। আপনি যদি আপনার বাতিটা নিয়ে পুরো ঘর ঘোরেন, আঁধার দূর হবে না। কিন্তু যদি নিভে থাকা মোমগুলো জ্বালিয়ে দেন, ঝলমল করে উঠবে সারা ঘর। তাবলিগের লোকেরা তাই গুরুত্বের সঙ্গেই বিদেশে থাকা মুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার মেহনত জারি রাখেন।

তো ঘটনাটা হলো, তাদের জামাত ব্রাজিলে চলছিল। মুসলমান খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে, কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষমেশ একটা কবরস্থানে ঢুকে জিরিয়ে নিচ্ছিল সাথিরা। হঠাৎ একটা কবর, নামফলক আরবি। মুসলমানের কবর। বাড়ি সিরিয়ায়। পদবিটা টুকে নিয়ে সারা শহর খুঁজে ফিরল এই পদবির লোক। পাওয়া গেল ৮০ টা পরিবারের বিশাল এক মহল্লা, সবাই খ্রিস্টান, কিন্তু পদবিটা আছে। জামাত ওখানে এক জায়গায় অবস্থান করে সব পরিবারে দাওয়াত পৌঁছাল। স্মরণ করিয়ে দিল—আরে, তোমরা তো মুসলিম, তোমাদের পূর্বপুরুষ মুসলিম, সিরিয়া থেকে এসেছিল। অধিকাংশ পরিবার ইসলামে ফিরে এলো। মোটামুটি ফরজটুকু শিখিয়ে, জামে মসজিদ বানিয়ে, রাজধানী থেকে ইমাম নিয়োগ দিয়ে জামাত অন্য এলাকায় চলে গেল।

Scanned with CamScanner

আরে, এটাই তো কাজ। সেই পুরনো স্বপ্নটা ফিরে এলো ছেলেটার চোখে। মানুষের হিদায়াতের উসিলা হবার সেই মেজাজ। চল্লিশ দিনের জন্য নাম লিখিয়ে দিল পরীক্ষার পর। দীন শিখবে, দাওয়াত দেওয়া শিখবে, আল্লাহর থেকে চেয়ে নেওয়া শিখবে। আর দোয়া করল—'আল্লাহ, এবারের মতো পরীক্ষায় বসিয়ে দাও। এক চিল্লার জন্য যাব। বিয়ে করে 'ভালো হয়ে' যেতামই, তার আগেই ভালো হয়ে যাব। প্লিজ'। বৃহস্পতিবার এই ঘটনা, শনিবার আবার মিটিং ডাকা হলো। বিনা নোটিশে ইমার্জেন্সি মিটিং, যেটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। শনিবারই ফরম ফিলআপ করলাম। পরীক্ষার বাকি মাত্র ৬ দিন। ওওও, চাওয়ার জায়গা তাহলে এটাই।

পরীক্ষা শেষ। বাপ-মাও রাজি। চল্লিশ দিন। ওদের মেডিকেলের ৫ জন। কাকরাইল থেকে সিরাজগঞ্জ শহরে। জামাতের আমির সাহেব আলিম। জীবনের শ্রেষ্ঠ ৪০ দিন। ২৫ বছরের জীবনে প্রথম বসে প্রসাব করা শিখল, বালেগ হবার পর প্রথম ফরজ গোসল শিখল। হাসছেন? হাসবেন না। ৯৫ % মুসলমানের বাচ্চার হাল এর চেয়ে খুব বেশি ভালো না বোধহয়। ১০টা সুরা একদম সহিহ-শুদ্ধ হলো, দাওয়াত দেওয়া শিখল, নতুন করে কুরআন পড়া শিখল, ঘুম-খাওয়া-বাথরুম এসবের মাসনুন দোয়া মুখস্থ হলো, জিকির-তাহাজ্জুদের অভ্যাস হলো, আর শিখল—'শিক্ষার পরিপূর্ণতার জন্য মোট ১২০ দিন লাগবে'। ততদিনে সুখ পেয়ে গেছে। বুঝেছে এটাই কাঙ্ক্ষিত লাইফ ফরম্যাট। আবার ৪০ দিন, এবার জামাতের আমির আমাদের ছেলেটা, গন্তব্য যশোর। জামাতের সাথিরা যত দুষ্টুমি করে, আমিরের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে তত বাড়ে। কিছু হলেই দুই রাকাত নামাজের অভ্যাস হলো—'ইয়া আল্লাহ, সাথিদের শয়তান থেকে হেফাজত করো। জোড়মিল দিয়ে দাও'।

এর মধ্যে রেজাল্ট হয়ে গেল। তিন সাবজেক্টের তিন ত্রিকে নয়টা পরীক্ষা—লিখিত, ব্যবহারিক, ভাইভা। ২ টার ভাইভাতে ফেল আমাদের হিরো। ৬০ এ পাশ, হিরো একটার ভাইভাতে ৫৭, একটাতে ৫৮। নেতা সবগুলো ফেল। যেগুলো ওই শেষদিন পরীক্ষার অনুমতি পেয়েছিল, সব ক'টা। স্যাররা বললেন, তোমাদের অনেককে পাশ করিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু যারা এতদিন রেগুলার ক্লাশ করেছে তাদের সাথে অবিচার হতো। ২০ দিন পর ফিরে আসতে হলো। সাথিদের সে কি কান্না! নিজের ভাই মরে গেলেও এত কাঁদে না মানুষ। বাসে ফেরার পথে আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা হলো ছেলেটার। বাসে জোরে গান বাজছে, কিন্তু কানের ভিতর ঢুকছে না, মনে হচ্ছে কানের পাশ দিয়ে শব্দগুলো চলে যাচ্ছে। ফেল করেও কোনো দুঃখ নেই। আল্লাহ এর মধ্যেই হয়তো ভালো কিছু রেখেছেন। হয়তো পাশের যোগ্য ছিল না সে।

Scanned with CamScanner

হয়তো আবার কী? আসলেই তো পড়া হয়নি কিছুই। ৩ মাস পর সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা। মেডিসিন-সার্জারি পড়ে তামা তামা করে ফেলতে হবে এবার।

পরীক্ষা শেষে? ১২০ দিন তো পুরো হয়নি। আবার ওই পথেই। দেশি-বিদেশি জামাতের সাথে, কত মানুষ! কত গুণ! কতকিছু শেখা! বড় বড় কিছু জরুরি সুরা মুখস্থ হয়ে গেল, তাহাজ্জুদে পড়াও যাবে, অজিফা হিসেবে পড়াও যাবে। দাওয়াতে আরও পরিপক্কতা এলো। জীবনের প্রথম খতম হলো কুরআন। ইসলামি জীবন অভ্যাসে এসে গেল। অসুখ কম হলে ঘরেই সারে, কিছু অসুখের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পরিবেশ সবচেয়ে বড় জিনিস। ১২০ দিন এই পরিবেশেরই নাম, মসজিদের পরিবেশ। এখন দরুদ পড়লে মুখে মিষ্টি টের পায় ছেলেটা, তাহাজ্জুদে লম্বা সুরা আর চোখের পানি, আর নিঃশ্বাসে মিন্ট ফ্লেভার। হায়, তোমরা যদি জানতে! এখন অবশ্য সে ফিলিংস আর নেই।

ইন্টারের রসায়ন ব্যবহারিকে 'টাইট্রেশন'বলে একটা কথা আছে। লবণ নির্ণয় করা। ফোঁটা ফোঁটা কী জানি ফেলে শেষ ফোঁটায় রঙ পরিবর্তন হয়। নীল হলে কপার সালফেট, এটুকু মনে আছে। কয় ফোঁটা গেল মনে রাখতে হয়, ঘনত্ব হিসাব করার জন্য। হিদায়াত হলো টাইট্রেশন। ফোঁটা ফোঁটা পড়তে পড়তে শেষ ফোঁটায় জীবন পরিবর্তন, রাস্তা পরিবর্তন। এজন্য কেউ জীবনের পরিবর্তন চাইলে বেশি বেশি ফোঁটা নিতে হবে—ভালো কিতাব, দীনি বন্ধুর সাহচর্য, আলিমগণের সোহবত, মসজিদের পরিবেশ, দাওয়াত—এগুলো ফোঁটার জায়গা। কেউ জানে না কয় ফোঁটা লাগবে, তাই বেশি বেশি ফোঁটা ফেলুন। আর দোয়া তো আছেই, নামাজে সুরা ফাতিহার 'ইহদিনাস সিরাতল মুসতাকিম' পড়ার সময় বেশি করে আবেগ ঢালুন, করেই দেখুন না।

শায়খ জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি দা. বা. একটা দোয়া করেন—

"ইয়া আল্লাহ, অনেকটা সময় চলে গেছে জীবনের। তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। 'বহত দূর সে আয়া হু, বহত দের মে আয়া হু, আয়া তো সহি'। অনেক দূর থেকে এসেছি, অনেক দেরী করে এসেছি। এসেছি তো। মাফ করেই দাও, মালিক।"

ছেলেটার 'কাছে আসার গল্প' আজ এপর্যন্তই। অন্য ফোঁটাগুলো অন্য কোনো দিন শোনাবো আপনাদের।

ছেলেটা এখন দুনিয়ার ক'টা দিন ইঁদুরের মতোই বাঁচতে চায়।

Scanned with CamScanner

এবং, ফিরেছি আমিও

ওমর আল জাবির, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক, 'পড়ো' সিরিজ

সন্দেহ খুব অদ্ভুত একটা জিনিস। যখনই একবার সেটা মনের ভিতর গেঁথে যায়, তখন থেকেই মনটা কেবল হাঁশপাশ করতে থাকে। সেই ছোটবেলা থেকেই আমার ধর্ম নিয়ে অনেক খটকা ছিল। আমি আশেপাশের মানুষদের নানা ধরনের ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান করতে দেখতাম। কিন্তু সেগুলো কেন করছি, কী লাভ এসব করে—এর কিছুই না বুঝে অনুসরণ করতে দেখতাম, আর ভাবতাম : এসব উদ্দেশ্যহীন কাজ কীভাবে ঠিক হতে পারে? মহান আল্লাহর কী প্রয়োজন মানুষের কাছ থেকে এগুলো চাওয়ার? এধরনের কাজ করে যখন নিজের বা অন্যের কোনো লাভ হচ্ছে না, তখন তিনি কেন সেটা মানুষকে করতে বলবেন?

একজন মহান সৃষ্টিকর্তা কেন যুক্তি, বিচার-বুদ্ধি থেকে অন্ধ বিশ্বাসকে বেশি গুরুত্ব দেবেন? কেন তিনি মানুষকে না জেনে, না বুঝে কিছু করতে বলবেন? এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন আমার মাথায় সারাদিন ঘুরত। আমি ধর্ম মানার কোনো কারণ খুঁজে পেতাম না। আমার কাছে মনে হতো, এটা আল্লাহর দেওয়া ধর্ম হতেই পারে না, কিছু একটা ঘাপলা আছে এর মধ্যে।

বড় হলাম। বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু বাড়ল এবং আর দশজন আরবি নামধারী অ-মুসলমানের মতো ধর্ম থেকে দূরে সরে গেলাম। আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক শুধুই জুমআর নামাজ পর্যন্ত থাকল, তাও আবার নামাজ বাদে বাকি সময়টা মোবাইল টিপাটিপি করে।

এর মধ্যে চাকরি, ব্যবসার প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশে গেলাম। প্রতিটি দেশে গিয়েই আমি চেষ্টা করতাম সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত জায়গাগুলো

Scanned with CamScanner

ঘুরে দেখতে। জার্মানিতে এক বিশাল সুন্দর বাগান, সারি সারি ফলের ক্ষেত, কাঁচের মতো স্বচ্ছ দিঘি দেখে ধাক্কা খেলাম। প্রকৃতি এত সুন্দর হতে পারে—আগে কখনও ভাবিনি। নরওয়ের বিশাল পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে সমুদ্র দেখে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের বিশালতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র, তুচ্ছ মনে হলো। নির্জন বরফ ঢাকা পাহাড়ে উঠে পা ভেঙে বরফের মধ্যে পড়ে থাকলাম। উদ্ধার বাহিনী এসে আমাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত বেশ খানিকটা সময় পেলাম চুপচাপ শুয়ে থেকে জীবন নিয়ে নতুন করে ভেবে দেখার। স্পেনে গিয়ে ভূমধ্যসাগরে জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়ালাম। সাগরের বিশালত্ব আমাকে আবারও মনে করিয়ে দিল—আমি কত তুচ্ছ, নগণ্য। আবু-ধাবিতে মরুভূমির ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হলো। প্রকৃতি কত চরম, আর মানুষ কত অসহায় হতে পারে, তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে বিশাল, বিরান, ধু-ধু এলাকা দেখে পৃথিবীর বিশালত্ব নতুন করে উপলব্ধি করলাম। মালয়েশিয়াতে অবিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে ভেতরটা নড়ে গেল। এই সব অভিজ্ঞতা আমাকে বার বার ভেতর থেকে বলছিল, আমার কিছু একটা পরিবর্তন করতে হবে। আমার জীবনটা শুধু কাজ, খাওয়া আর জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য নয়। জীবনের আরও বড় কোনো উদ্দেশ্য আছে।

তারপর একদিন আমি লেক ডিসট্রিক্টে গেলাম। বিশাল এক পাহাড়ে চার ঘন্টা উঠে সামনে তাকিয়ে দেখলাম যতদূর চোখ যায়, খোলা নীল আকাশের নিচে বিশাল সব পর্বতের সারি এবং তার মাঝখানে এক পরিষ্কার নীল হ্রদ। পাহাড়ের গায়ে সবুজ, কমলা, লাল কত রঙের গাছের কার্পেট। হঠাৎ করে এই প্রচণ্ড সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে আমি 'থ' হয়ে গেলাম।

জান্নাতের বর্ণনা দেওয়া একের পর এক আয়াত আমার মনের মধ্যে আসতে লাগল। ভিজে আসা চোখে আমি তাকিয়ে থাকলাম আর আফসোস করতে থাকলাম, আমার মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে কতবার বলেছেন এই অসাধারণ সৌন্দর্য আমি লক্ষ কোটি বছর, অনন্তকাল উপভোগ করতে পারব—দরকার আমার পক্ষ থেকে একটু চেষ্টা, একটু ত্যাগ—কিন্তু আমি সেটা করিনি।

সিদ্ধান্ত নিলাম জীবনের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে হবে। শুধুই টাকা কামানো, ক্যারিয়ার, খাওয়া জোগাড়, বাড়ি ভাড়া, পরিবারের খরচ, বাবা-মার চিকিৎসা এসব নিয়ে চিন্তা করে জীবন পার করে দিলে হবে না। জীবনের আরও বড় কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমি মানুষ। গবাদি পশু না।

Scanned with CamScanner

এরপর কুরআনের আরবি, ব্যাকরণ, বহুল বিতর্কিত কিছু আয়াতের বিশ্লেষণ নিয়ে কিছু বই পড়ে, বছর খানেক কিছু কোর্স করে আমি বুঝতে পারলাম : ইসলাম সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সেটা পুরোটাই ভুল! ইসলাম কোনো অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অযৌক্তিক, অর্থহীন, আচার অনুষ্ঠানে ভরা জীবনবিধান নয়। আমি সারা জীবন মুরব্বিদের কাছ থেকে যে ইসলাম শিখেছি, তার মূল ভিত্তিটাই ভুল। কুরআনের যে বাংলা অনুবাদ আমি পড়েছি, সেটা ভর্তি ভুল এবং অ-যথাযথ অনুবাদে! সারা জীবন লোকমুখে এবং মসজিদে যত হাদিস শুনেছি, তার বড় একটা অংশই জাল এবং অগ্রহণীয় হাদিস!

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, সারা জীবনের সব ভুল জ্ঞান, ভুল ধারণা, ভুল মানসিকতায় ভরা আমার নষ্ট মস্তিস্কটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। উপলব্ধি করলাম, ইসলামকে যদি সঠিকভাবে জানতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাকে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থেকে শেখা সবকিছু ভুলে যেতে হবে। তারপর একজন অমুসলিমের মতো চিন্তা করা শুরু করতে হবে, প্রশ্ন করা শুরু করতে হবে। তারপর কুরআন পড়ে আল্লাহ ﷻ, তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর জীবন বিধানকে শিখতে হবে। মনের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া হাজারো প্রশ্নের সমাধান সরাসরি আল্লাহর ﷻ কাছ থেকে জানতে হবে। ঠিক যেভাবে প্রথম প্রজন্মের অমুসলিম আরবরা কুরআন থেকে সঠিক উত্তর জেনে, সত্যকে খুঁজে পেয়ে নির্দ্বিধায় মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন, আমাকেও ঠিক সেভাবেই মুসলিম হতে হবে।

তারপর একদিন আমি কুরআন পড়া শুরু করলাম। প্রথমে মুহম্মদ শাকির এবং তারপর আব্দেল হালিমের অনুবাদ শেষ করে আমি আনন্দে, ভালোবাসায়, বিনয়ে, ভয়ে, সত্যকে খুঁজে পাওয়ার শিহরণে মাটিতে নত হয়ে গেলাম। আমি আল্লাহর কাছে আকুল ভাবে প্রার্থনা করলাম—

> *ও আল্লাহ, আপনি আমাকে এবং আমার বাবা-মাকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তা উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞ হওয়ার সামর্থ্য দিন। যে সৎকাজগুলো আপনাকে খুশি করে, সেগুলো করার সামর্থ্য দিন। আমার সন্তানদের আমার জন্যই সৎ হতে দিন। আমি ক্ষমা চাই। আমি এখন আপনার অনুগতদের একজন।*[১]

---

১ আল-আহকাফ (৪৬) : ১৫

নীড়ে ফেরার গল্প

মাসুদ শরীফ, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, এআইইউবি

তখন ভার্সিটির দ্বিতীয় কি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। পড়াশোনার নাম করে প্রায়ই এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিতে যাওয়া হতো। পড়াশোনা যে কখনোই হতো না—তা না; তবে আড্ডা, মুভি দেখা—এগুলোর হারই ছিল তুলনামূলক বেশি।

বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় যেমনটা হয়, হেন বিষয় নেই যা নিয়ে আলোচনা হয় না। এসব হেন-তেন-যেন বিষয়ের মধ্যে স্রষ্টা আর ডেভিলও অন্যতম উপাদেয় বিষয়। প্রায়ই আমাদের মজলিসে যেসব আসর বসত তার মধ্যে অন্যতম ছিল স্রষ্টা আর ডেভিল নিয়ে আলোচনা। আমাদের এক বড় ভাই ছিলেন যেকোনো বিষয়ে আড্ডা জমাতে উস্তাদ। তার কাছে এ ধরনের বিষয় ছিল অত্যন্ত সুরুচিকর। ভিন্ন ভার্সিটিতে পড়া আরেক সমবয়সী বন্ধু ছিল; তারও এসব বিষয়ে—বিশেষ করে স্যাটানিক বিষয়ে—আগ্রহ ছিল প্রচুর।

প্রথাগত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় ছোটবেলা থেকে ইসলাম বা ধর্মপালন বলতে জানতাম কেবল ঠিকঠাকমতো কুরআন পড়া, নামাজ-রোজা করা—এই আরকি। স্রষ্টা আছে কি নেই, থাকলেও এই দুনিয়ার সাথে তাঁর কোনো লেনাদেনা আছে কি না, সেগুলো নিয়ে ভাবার চিন্তা মাথায় আসেনি কখনো। নামাজ পড়তাম মাঝে মাঝে। ভার্সিটিতে ওঠার পর থেকে শুক্রবারের জুমুআও বাদ যেতে শুরু করে একসময়; বাকিগুলোর কথা আর নাই-বা বলি। রোজাটা লজ্জায় পড়ে রাখতে হতো—লোকে কী বলবে!

বিখ্যাত সেই আড্ডা-কাম-রাত্রি যাপনগুলোর সুবাদে স্রষ্টার অস্তিত্ব-অনস্তিত্বসহ

Scanned with CamScanner

এ ধরনের আরও মনোহর বিষয়গুলো তখনই প্রথম ভাবনার পর্দায় আঘাত হানে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যেহেতু ইতিমধ্যেই ইসলামের ন্যূনতম আবশ্যিক কাজ নামাজটাই অনিয়মিত—প্রায় নাই—হয়ে পড়েছিল, তাই স্রষ্টা নিয়ে সংশয় প্রথম যখন শুনি, তখন ভালোই লাগছিল। এমনিতেই নামাজ পড়ি না, তার উপর এখন যদি স্রষ্টাই না-থাকে তাহলে তো বাঁচা গেল—পাপবোধটাও আর থাকবে না।

যেভাবে সংশয়ের শুরু :

বড় ভাই মারফত জানতে পারি, স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান। তাহলে স্রষ্টা কি ওই নর্দমার মাঝেও বিরাজমান? নাহ! সেটা কী করে হয়। অথচ আমরা সবাই জানি স্রষ্টার উপস্থিতি সর্বত্র। অতএব, স্রষ্টা বলে কিছু নেই। যুক্তিটা আরজ আলী মাতুব্বরের। (সঠিক কথা হচ্ছে, স্রষ্টা সর্বত্র বিরাজমান—এই কথাটিই একটি ভুল বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এই কথা বলেন, তারা হয়তো বিশ্বাস করেন যে, স্রষ্টারও সৃষ্টির মতো একটা দেহ রয়েছে। এবার সেই দেহ সংকুলান হবার জন্য তো জায়গা প্রয়োজন। তো স্রষ্টার দেহ কীভাবে এই ছোট্ট আসমানে সীমাবন্ধ থাকবে। তিনি তো অতিকায় আকৃতির। আচ্ছা, তাহলে সমাধান কী? সমাধান হলো, এখন এ কথা বলা হবে যে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। নাউযুবিল্লাহ। অথচ সর্বত্র বলা হলে এরও কিন্তু সীমা-পরিসীমা আছে। এতেও কিন্তু স্রষ্টাকে সীমাবন্ধ ভাবার বিষয়টা বহাল থাকছে। আসলে কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে অপূর্ণ বিবেকের ওপর নির্ভর করে দীনি বিষয়ে কোনো মৌলিক সিম্ধান্তে উপনীত হতে চাইলে যে ভুল হবে এবং বিভ্রান্তি ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক। বাস্তবতা হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছু জানেন, শোনেন। তিনি সৃষ্টির মতো দেহবিশিষ্ট নন। সুতরাং তিনি সর্বত্র বিরাজমান কথাটাকে বিশুদ্ধ গণ্য করার মতো যৌক্তিক কোনো কারণই নেই।) সম্ভবত বাঙালি পাড়ায় প্রায় অধিকাংশেরই নাস্তিকতার হাতেখড়ি আরজ আলীর মাধ্যমে। যেদিন প্রথম এই 'মনীষী'র নাম শুনেছিলাম তার পর দিনই অন্তর্জাল ফুঁড়ে বার করলাম আরজ আলী সমগ্র। খুব যে পড়েছি তা না, তবে যতটুকু পড়েছি, আর ব্লগে নাস্তিক-সংশয়বাদীদের নিজেদের কূটস্বার্থে ইসলামবিরোধী লেখালেখি যতটুকু পড়েছি, তাতে ইসলাম সম্পর্কে শেষ যে-সলতেখানি জ্বলছিল সেটাও নিভে গেল।

আমি তখন পুরোপুরি নাস্তিক না হলেও ঘোরতর সংশয়বাদী। ব্লগে যেসব হাদিস আর কুরআনের আয়াতের উম্ধৃতি দিয়ে ইসলামের নিকুচি করা হতো মাঝে মাঝে আমি সেগুলোর উত্তর খুঁজতাম। তখন ফেইসবুকে কি অন্তর্জালে এসব প্রশ্নের

Scanned with CamScanner

উত্তর দেওয়ার মতো মানুষদের সাথে আমার পরিচয় ছিল না। যাদের কাছে সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করতাম, তারাও কমবেশি ছিল আমারই মতো। হয় জানে না, নয় ছোটবেলায় যা জেনেছে অন্ধভাবে সেটাই আঁকড়ে পড়ে আছে। জিজ্ঞাসু মনের তৃষ্ণা মেটানোর মতো কেউ তখন ছিল না।

যাহোক, সৈয়ক হক, হুমায়ুন আজাদদের মতো লোকেরাও এসবের কোনো কুলকিনারা পাননি। এত কিছু জানার পরও তারা যদি এই ক্ষেত্রে আজীবন নবিশ থাকেন, সেক্ষেত্রে আমি যে হদিশ পাচ্ছিলাম না তাতে দোষের কী!

যেভাবে সংশয়ের নিপাত :

আধুনিক প্রযুক্তি যে কেবল মানুষের ক্ষতি করে, ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়—কথাটা সর্বক্ষেত্রে মোটেও প্রযোজ্য না। ব্যবহারের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তির বৈধতা-অবৈধতা। প্রযুক্তির এই অগ্রগতির কারণে একদিকে যেমন পেয়েছি ইসলামের বিরুদ্ধে সন্দেহ উদ্রেককারী অসংখ্য তথ্য-উপাত্ত, তেমনি পেয়েছি ইসলামের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়ার অসংখ্য প্রমাণ।

সঠিক ইসলামের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাই ডা. জাকির নায়েকের বিভিন্ন লেকচার থেকে। চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে পিস টিভি আসত। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে দুএক মিনিট ডা. জাকির নায়েকের বিভিন্ন লেকচার শুনতাম। ভাঙাচোরা চেহারা, যেমন হালকা গড়ন তেমন হালকা দাড়ি। সেই লোকটাই কী জোরের সাথেই না তাঁর প্রতি নিক্ষিপ্ত এক একটা প্রশ্নের সূঁচালো অগ্রভাগকে ভোঁতা করে বেঁকিয়ে ফেরত পাঠাতেন। শুধু ডা. জাকিরই নন, আসলে পিস টিভি-র ইংলিশ চ্যানেলটির অধিকাংশ বক্তা ও অনুষ্ঠানই আধুনিক ও তরুণ সংশয়বাদীদের উদ্দেশ্য করে তৈরি করা। ফলে এই চ্যানেলের প্রোগ্রামগুলো খুব সহজেই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর অবশ্যই এর মধ্য সর্বাগ্রে ছিল ডা. জাকিরের তিরন্দাজি সব লেকচার। তখনো যে ইসলামের বলয়ে পুরোপুরি এসেছি এমন না, তবে ধীরে ধীরে মনের গহীনে পরিবর্তনের, আগাছাগুলো পরিষ্কারের একটা সংকেত পাচ্ছিলাম।

ডা. জাকির নায়েকের যে-লেকচার এবং লেকচার পরবর্তী প্রশ্নোত্তর শুনে প্রথম ইসলামের প্রতি অন্তর থেকে টান অনুভব করি সেটা হচ্ছে: The Qur'an and Modern Science : Compatible or incompatible। এই লেকচার শোনার পর প্রথম যে উপলব্ধি আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয় : জগতে চলতে ফিরতে,

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশে আমাদের মনে ইসলাম নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্নের যে-বুদবুদ ওঠে, সেগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মতো লোক আশেপাশে খুবই স্বল্প।

ছোটবেলা থেকেই ইসলাম সম্পর্কে অনেক ধোঁয়াশা, অনেক আবছা জ্ঞান নিয়ে আমরা বড় হই। বড় হতে হতে বহির্জগত, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, দর্শন আর নানান কিসিমের মানুষের সংস্পর্শে এসে সেই ধোঁয়াশাগুলো কালো মেঘে রূপ নেয়। আর এভাবে একসময় আড়ালে পড়া সূর্যটাকেই দিব্যি ভুলে বসি আমরা। অবচেতন তখন বলে ওঠে : সূর্য আবার কী!?

একটু খেয়াল করে দেখি, 'সৎ' নাস্তিক সংশয়বাদীদের মূল প্রশ্ন বা সন্দেহগুলো কী কী?

» স্রষ্টা আছেন কি না?

» স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন?

» স্রষ্টা দুনিয়া বানিয়ে একে ছেড়ে দিয়েছেন, এই জগতের উপর স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব নেই।

» পরকাল বলে কিছু নেই, এগুলো মানুষের অলীক চিন্তা।

ঘুরেফিরে প্রশ্ন এগুলোই। কেউ স্রেফ করার জন্য প্রশ্নগুলো করেন, কেউ আন্তরিকভাবে জানার জন্যই করেন। কেউ বা আবার এসবের তোয়াক্কাই করেন না। মন-চায়-জিন্দেগি যাপন করেন। (যদি আল্লাহ চান, উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর অকাট্য উত্তর নিয়ে অন্য কোনো লেখায় বলব।)

ডা. জাকিরের ওই লেকচার এবং অন্যান্য আরও লেকচারের মাধ্যমে সন্দেহের উপরিতলের শ্যাঁওলাগুলো পরিষ্কার হতে থাকে। তবে সংশয় পরিপূর্ণভাবে নিপাত হলো তখন, যখন সন্ধান পেলাম ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি বা IOU-এর। ডা. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপ্স উদ্ভাবিত এই ইউনিভার্সিটিতে তাওহিদ (আল্লাহর একত্ব)-এর উপর বুনিয়াদি কোর্সগুলো করার পর থেকে মনের সূক্ষ্মতম সন্দেহগুলোও হাওয়ায় মিলিয়ে যেত লাগল। এরপর যখন *মোরাল ফাউন্ডেশন অফ ইসলামিক কালচার* কোর্সটা করলাম তখন তো পুরাই থ'। নিজেকে কী মূর্খই না লাগছিল তখন। ইসলাম সম্পর্কে ভাসাভাসা এই জ্ঞান নিয়ে আমি ইসলাম নিয়ে সন্দিহান ছিলাম? আর যখন 'দাওয়াহ ট্রেনিং' কোর্সটা করলাম তখন নিজেকে কী

Scanned with CamScanner

বোকা আর দুর্ভাগাই না মনে হচ্ছিল : কেন আগে করিনি!

হাহ! এইসব মামুলি প্রশ্নের উত্তর জানতাম না বলে একদিন স্রষ্টায় অবিশ্বাস করতাম। আমারই মতো অন্যদের কাছ থেকে সন্দেহের উপকরণ বগলে নিয়ে সালাত সিয়াম থেকে দূরে ছিলাম! এই সব ঠুনকো সন্দেহের জন্য?? অথচ ইসলামিক বিশেষজ্ঞগণ কি নিপুণভাবেই না এগুলোর সমাধান বাৎলে দিয়ে গেছেন। আমরা জানি না, খুঁজি না, জানতে চাই না; সঠিক পথে পৌঁছাতে চাই না। পৌঁছালে যে নিয়মিত সালাত আদায় করতে হবে, কণ্টকাকীর্ণ পথে পা সামলে ফেলতে হবে। হাতে গোনা কিছু হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে। এসবের চেয়ে আমার মন যেভাবে চায় সেভাবে চলাটাই যে শ্রেয় কারও কারও কাছে। তাতে ইহজীবনে হয়তো কাঁটাগুলোকে দলাইমোচড়াই করে পার পাওয়া যাবে, কিন্তু পরজীবনে পাই পাই হিসেব দিতে হবে—কোনো সন্দেহ নেই।

সমস্যার মূলে :

প্রথাগতভাবে মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা প্রায় প্রতিটা ছেলেমেয়েই আজ নাস্তিকতা-সংশয়বাদী বিষের স্বীকার। আমার ক্ষেত্রে এর মূল কারণ ছিল শৈশব-কৈশোর থেকে স্রষ্টাকে না চেনা, স্রষ্টার এই বিশাল সৃষ্টি না বোঝা।

আর দশটা ছেলেদের কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়, আমিও সেভাবে কুরআন শুধু আবৃত্তি করতে শিখেছিলাম—এর মর্মার্থ কখনো বোঝা হয়ে ওঠেনি। এখন তো অনেক ছেলে-মেয়ে সেই আবৃত্তিটুকুও করতে পারে না। আফসোস! নামাজ পড়ার তাগাদাই শুধু পেয়ে গেছি মা-বাবা'র কাছ থেকে; কিন্তু কেন পড়ছি, কী কারণে, কী উদ্দেশ্যে পড়ছি সেগুলো কখনো বোঝা হয়ে ওঠেনি। রোজাটা কেবল আটকে ছিল উপবাস থাকার মধ্যে। স্রষ্টা কী প্রজ্ঞাগুণে সিয়ামের প্রত্যাদেশ দিয়েছেন সেটা ভেবে দেখার সময় হয়নি কখনো। এগুলোর সঙ্গে রয়েছে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির উর্বর সব সেক্যুলার বইপত্র আর প্রচারমাধ্যম।

বইপত্রে, প্রবন্ধে, অনলাইন ব্লগে যারা ইসলামবিদ্বেষ চর্চা করেন তাদের কেউই আরবিতে দক্ষ নন। স্রেফ অনুবাদকে পুঁজি করে তারা তাদের কথিত 'গবেষণা' চর্চা করেন। বাংলা, ইংরেজি, জর্মন এমনকি ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও তাদের গভীর দখল থাকলেও শুধু আরবি ভাষা এলেই তাদের জ্ঞানের দৌড় হাঁটুতে নেমে আসে। বাংলা না জেনে শুধু অনুবাদ পড়ে কেউ যদি রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যের সমালোচনা

Scanned with CamScanner

করতে শুরু করেন তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে বলুন তো? অনুবাদ শুধু একভাষার কিছু শব্দকে অন্যভাষায় রূপান্তর করে দিতে পারে; কিন্তু মূল ভাষায় মূল শব্দটি যে ভাব, যে ঝঙ্কার ও অর্থের সূক্ষ্মতা নিয়ে হাজির হয়—সেটা এরা কী করে উপলব্ধি করবে?

শুধু তাই না, কবিতা বা সাহিত্য-সমালোচনার জন্য আপনাকে জানতে হয় কবিতার ছন্দ, সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের মতো শাস্ত্রীয় কিছু বিষয়। আপনি কোনো কিছুর 'অ্যাকাডেমিক' সমালোচনা, খণ্ডন করতে চাইলে সে-বিষয়ে আপনার দখল থাকতে হয়। এসব স্বার্থলোভী কথিত 'নাস্তিক-সংশয়ী'গুলোর তো আরবিই জানা নেই। ইসলামের তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ এসবের উসুল তথা মূলনীতি, কাওয়ায়িদ, মাকাসিদের মতো শাস্ত্রীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবে কীভাবে?

এত মূর্খ থাকার পরও ইসলামের বিরুদ্ধে, 'মানবধর্ম বা মানবতাবাদের' মতো চটকদার বর্মের আড়ালে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের প্রচারে এরা সবসময় দুই পায়ে খাড়া। অধিকাংশ বাংলা গল্প, উপন্যাস, নাটক কিংবা চলচ্চিত্রে, প্রবন্ধ কিংবা কলামে যেভাবে বিকৃতভাবে ইসলামকে তুলে ধরা হয়; আড়কলমে কিশোর মগজে বস্তুবাদ আর ভোগবাদের বীজ বপে দেওয়া হয়, সেখানে এখনো যে এদেশে মানুষ হিদায়াত পায়, ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা পায়—এত প্রতিকূলতার পরও—ইসলাম যে-স্রষ্টা প্রত্যাদিষ্ট জীবনব্যবস্থা সেটা প্রমাণে এই বাস্তব উপাত্তই যথেষ্ট।

আর নাস্তিকরাও যে কারও উপাসনা করে না সেটাও সত্য নয়। কারণ, স্রষ্টায় বিশ্বাস ও স্রষ্টার উপাসনা মানুষের ফিতরাহ বা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আর একারণেই কট্টর নাস্তিকদেরও উপাস্য রয়েছে। সেই উপাস্য হতে পারে আত্ম-মনোরঞ্জন, অর্থ, খ্যাতি কিংবা নিজেরই উপাসনা। বুদ্ধ কখনোই নিজেকে ঈশ্বর দাবি না করলেও বুদ্ধের শিষ্যরা যেভাবে বুদ্ধকেই পূজাসম মনে করে পূজো করছে, ঠিক তেমনি নাস্তিক-সংশয়বাদীদের জন্যও রয়েছে হরেক রকমের, কিংবা পাঁচমিশেলি ঈশ্বর।

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার উপাস্য বানিয়েছে নিজের কামনা-বাসনাকে?[১]

---

১ সূরা আল-ফুরকান (মানদণ্ড), ২৫ : ৪৩

Scanned with CamScanner

নীড়ে ফেরা আমি :

আমার জন্য নীড়ে ফেরা ছিল নতুনভাবে ইসলামকে চেনা; সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতায় ইসলামকে অবলোকন করা। সত্যিকার ইসলাম এত সুন্দর? এত বাস্তবসম্মত? এত জীবনঘনিষ্ঠ? নীড়ে ফেরার পর এগুলোই ছিল আমার প্রথম উপলব্ধি। আর এই ইসলাম ছেড়েই আজ আমার ভাইবোনেরা কত দূরে। ইসলাম তাদের কাছে হয় নামসর্বস্ব এক আচার-প্রথা, নয়তো সেক্যুলার ভাবনার ধুলোয় মলিন হওয়া এক ছিন্নপত্র।

শেষ করার আগে সবার কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনার পরবর্তী পদক্ষেপটা নেওয়ার আগে অন্তত একবার আন্তরিকভাবে প্রকৃত ইসলামের সুলুক সন্ধান করুন। দশম শ্রেণিতে ধর্মে এ-প্লাস পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টিতে নয়; পূর্বসূরি বিদ্বানগণ (সালাফ আস-সালিহিন) যেভাবে মূলগতভাবে ইসলামকে বুঝেছেন, যেই দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, সেই দৃষ্টিতে একবার নজর ফেরান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি এগোন তাহলে স্রষ্টা তাকে সিরাতুল-মুস্তাকিম, মানে সরল-সঠিক পথটি দেখাবেনই। কারণ, স্রষ্টা নিজেই বলেছেন,

> *যারা আমার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে (আল্লাহর ধর্ম—ইসলাম) পরিচালিত করব। আল্লাহ তো মুহসিনুনদের (সৎকর্মশীল) সঙ্গেই আছেন।*[১]

পরিশিষ্ট-১

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"

প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (স্রষ্টার প্রতি স্বভাবজাত বিশ্বাস)-এর উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা জরথুস্ট্রি বানায়।[২]

---

১ সূরা আল-আনকাবূত (মাকড়সা), ২৯ : ৬৯

২ সহিহ মুসলিম, গ্রন্থ ৩৩-কদর, হাদিস নং-৬৪২৩

Scanned with CamScanner

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"

মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে করতে একসময় এই প্রশ্ন করবে যে, আল্লাহ তো সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে? এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সে যেন বলে, আমি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি।[১]

১ সহিহ মুসলিম, গ্রন্থ ১-কিতাবুল-ইমান, হাদিস নং-০২৪২

Scanned with CamScanner

পথিকের পথচলা

নিশাত তামমিম, এমবিবিএস, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

একটা গল্প লিখতে চেয়েছিলাম : পথিকের পথচলার গল্প, নিজেকে বদলানোর গল্প। কিন্তু প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই যখন মনে হয়, নিজেকে বদলানোটা আজও শেষ হলো না, ইয়াজুজ-মাজুজের প্রতিদিনকার প্রাচীর ভাঙার মতোই খানিকটা এগিয়ে এসে আবার অনেকখানি পিছিয়ে যাওয়া, তখন উপলব্ধি হয় : এ গল্প লেখার যোগ্যতা আমার নেই, কলম থেমে যায়। আবার কলম তুলে নিই—যাক, তবে গল্প শুরুর গল্পটাই বলি...

গল্পটা হয়তো খুব বেশি জমবে না। কারণ, পারিবারিকভাবে আমি একদম জাহিলিয়াত থেকে উঠে আসার সুযোগ পাইনি, অনেকটা এরকম : হিদায়াতের মধ্যেই বেড়ে ওঠা, এরপর সময়ের টানে পিছলে যাওয়া, তারপর বুঝে-শুনে নিজ তাগিদে আবার ফিরে আসার চেষ্টা। আলহামদুলিল্লাহ, আম্মু-আব্বুকে ছোটবেলা থেকেই একেবারে গতানুগতিক মুসলিম পরিবারগুলো থেকে ব্যতিক্রম পেয়েছিলাম। আমার দাদুবাড়ির এলাকাটাই বলা যায় মাদরাসা অধ্যুষিত এলাকা, দাদুবাড়ির যে মসজিদটা আছে ওখানেই বাংলাদেশে প্রথম তাবলিগের কার্যক্রম শুরু হয়, দাদারা পীরপন্থী ছিলেন। পীরতন্ত্রের কিছু ভুল রীতিনীতির সংমিশ্রণ থাকলেও তাদের মধ্যে কামেল পীরও ছিলেন। যাহোক, ইসলামিক ধারার সেই বাতাস আব্বুর গায়ে একটু বেশিই লেগেছিল। মোটামুটি ছোটবেলা থেকেই আব্বু নামাজি ছিলেন। ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতি করেছেন, ইসলামি রাজনীতিও করেছেন, সবশেষে তাবলিগে জুড়েছেন। আব্বুর এই ইসলামিক চিন্তার মাঝে এসে আম্মুও বদলে গেছেন। বলা চলে, আমরা ভাইবোনেরা মা-বাবার কোলে নবি-রাসুলের কাহিনি শুনে শুনেই বড় হয়েছি; গল্প

Scanned with CamScanner

শুনতে শুনতে হারিয়ে গেছি মরুবিয়াবনে, কখনো কেঁদেছি, কখনো ঘুমের মাঝে ঘুরে এসেছি বাইতুল্লাহ কিংবা মিশর-ফিলিস্তিন....

আমাদের দুই ভাইবোনের গান খুব পছন্দের ছিল। আব্বুর কিছু ছাত্র ছিল তারা ইসলামিক গানের ক্যাসেট এনে দিত। আমরা শুনতাম, বুঝে-না-বুঝে লিরিক্স মুখস্থ করতাম, ফ্রেন্ডদের সাথে দলবেঁধে গাইতাম। শৈশব ছেড়ে কৈশোরে পদার্পণ, গানের জগতে বৈচিত্র্য প্রয়োজন, খালার সাথে দোকানে গিয়ে ভাইয়া একদিন একটা হিন্দি গানের ক্যাসেট কিনে আনল। চল, এই গানগুলো শুনি। আরে, ভালোই লাগে তো! ক্যাসেট কালেকশান বাড়তে লাগল। ইসলামিক গানের ফিতাগুলোয় জমতে শুরু করে ধূলোর আস্তর...। মিউজিকে ডুবে গেলাম, কাব্যিক সাহিত্যিক মানসিকতার ছিলাম একদম শিশু বয়েস থেকেই, তাই মিউজিকের জগৎটা একটু বেশিই টানত, বিশেষ করে মরমী ধাচের গানগুলো। এরপর আস্তে আস্তে ইবাদাত, আনুগত্যেও শৈথিল্য, যা হয় আরকি! উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ইসলাম বেশিদূর টেকে না। যতক্ষণ না বুঝে শুনে ভালোবেসে দীনটাকে আঁকড়ে ধরা যায়। জানতাম, মিউজিক শোনা উচিত না, তবু ভালো লাগে বলেই শুনি, বাসায় টিভি ছিল না। তাই বেতারের গান শুনি। এফএম রেডিওর উত্থানের যুগ তখন। রেডিও টুডে, ফূর্তি, আমার, এবিসি—এসবের সপ্তাহান্তের টপটেন গানগুলো মুখস্থ থাকত। নামাজ কালামও পড়তাম, মিউজিকও শুনতাম, আধাআধি মুসলিম যাকে বলে। এরপর মুভি দেখাও শুরু করলাম বিখ্যাত মুভিগুলোর গল্প জানার নেশায়, তবে সেন্সর করা আর নোংরা দৃশ্য নেই এমন হিস্ট্রিক্যাল মুভি দেখতাম। আলহামদুলিল্লাহ, এরচে নিচে আর নামিনি, অশ্লীলতা আমার কোনোদিনই ভালো লাগত না। জাহিলিয়াতেও না, তারপরেও না....

ভাইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পাওয়ার পর হোস্টেলে যাবে, এমন সময় ডেস্কটপ কিনতে হলো ভাইয়ার জন্যেই। ওই সময় ডেস্কটপের ভেতরেই কিছু হিন্দি ভিডিও গান সেভ করা ছিল। আর সাথে সামি ইউসুফের কিছু ইসলামিক মিউজিক্যাল গান। ওই ভিডিওগুলো দেখতে গিয়ে আমি প্রথম অনুভব করলাম : গুণগুণ করে যে অডিও গানগুলো আমি না বুঝেই গাই, সেগুলোর ভিডিও চিত্র কী ভয়ঙ্কর অশ্লীল, আমার চোখের সহ্যসীমারও অনেক বাইরে, হাত পা কাঁপতে লাগল। একটা একটা করে ডিলিট করতে করতে একসময় পুরো ফোল্ডারই খালি করে ফেললাম, ভাইয়া এজন্য বকেছিল কি না—তা আর মনে নেই। সেই প্রথম মিউজিকের প্রতি বিতৃষ্ণা আসতে শুরু করে, যে দৃশ্যগুলো চোখে পড়েছিল, ওই গানগুলো আর গুনগুনিয়েও

Scanned with CamScanner

গাইনি কোনোদিন। যাহোক, সামি ইউসুফের গানের ফোল্ডারে ঢুকলাম। সত্যি বলতে আমার কাছে মনে হয়েছিল—অসাধারণ! নোংরা আধুনিক গানের জগতে তার গানগুলো মিউজিক্যাল হলেও সেই মুহূর্তে আমাকে বাংলা-হিন্দি আধুনিক গানের জগৎ থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করেছে। কারণ, লিরিকগুলো যে আসলেই সুন্দর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমস্যাটা কেবল মিউজিকেই। ভাবলাম, নাহ, আর না। ওইসব ফালতু গান বাদ, এবার আবার ইসলামিক গানে প্রত্যাবর্তন, কাটাবন মার্কেটে গিয়ে যত ইসলামিক গানের সিডি পেলাম সব নিয়ে আসা, ইউটিউবের সব নাশিদ সিঙারদের ওই সময়েই চেনা। একটু একটু করে আবার ভুল পথে হলেও দীনের পথে ঢোকা।

ভাইয়া হোস্টেল থেকে আসার সময় একবার মুম্বাইয়ের এক ডাক্তারের কিছু লেকচার নিয়ে এলো। তিনি কিনা আবার একজন স্কলার। বাসায় টিভি নেই, তাই টিভির জগৎটায় তেমন আনাগোনা আমাদের ছিল না। ডেস্কটপের মাধ্যমেই অডিও-ভিজ্যুয়াল জগতের সাথে পরিচয়। হু, এই স্কলারই ডা. জাকির নায়েক। সত্যিকার অর্থে—ইসলামি জ্ঞানের প্রতি আমার প্রথম ভালোবাসার উৎস তিনিই। প্রথম তার একটা লেকচার দেখেই নড়ে বসেছিলাম : সুবহানাল্লাহ! এত সুন্দর করে যৌক্তিকভাবেও ইসলামকে উপস্থাপন করা যায়? একটা মানুষ এত জ্ঞানী হতে পারেন?? ভাইয়া, তুমি পরেরবার আরও লেকচার নিয়ে আসবা।

কাটাবন ইসলামিক কর্ণারের ডাবিং ভিডিওগুলো দেখা শেষ, উৎসাহ চরমে : আমাকেও জানতে হবে। আমি যেহেতু ছোটবেলা থেকেই ডাক্তার হতে চাই, এই মানুষটা তেমনই ডাক্তার, এছাড়া তিনি মানুষের মনেরও ডাক্তার। দায়ি-ইলাল্লাহ। এমন কম্বোপ্যাকই আমার স্বপ্ন। গুগল ঘেটে জাকির নায়েকের IRF থেকে শুরু করে তাদের স্কুল, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবার নামধামসহ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। তখন আমি হলিক্রস কলেজের ফার্স্ট/সেকেন্ড ইয়ারে বোধহয়। মনে পড়ে, তাকে একটা মেইল করার জন্য কত যে খুঁজেছি, IRF এ মেইল করে বসে থাকতাম, কেউ যদি রিপ্লাই দেয়! নাহ, সে আশার গুড়ে বালি..... তবু আম্মুকে বললাম, আম্মু আমি ডাক্তার হবো, তারপর ইন্ডিয়া গিয়ে IRF এ যুক্ত হবো মাহরাম নিয়ে, তুমি রাজি? রাজি না হয়ে আর কই যায়, এই জেদী মেয়ে যেটা বলে, সেটা করেও ছাড়ে, খারাপ কিছু করে না বলেই বোধহয় অনুমতি না দিয়েও পারা যায় না।

জাকির নায়েককে খুঁজতেই ফেইসবুক একাউন্ট খুললাম, যত যত ইসলামি পেইজ,

Scanned with CamScanner

গ্রুপ, ইসলামিক ভাই বোনদের একাউন্ট আছে, সব এড দিতে লাগলাম, এক ভাইয়ের খোঁজ পেলাম যিনি IRF দেখে আসছেন, তার কাছেও বৃত্তান্ত নিলাম। যাহোক, ফেবুর জগতে এসে এরপর নিত্যনতুন ইসলামিক কমিউনিটির সাথে পরিচয় হতে থাকা, নিজেও টুকটাক কাব্যচর্চা করি, লেখালেখি করি, সেই সূত্রে ধীরে ধীরে সমমনা কিছু মানুষ পেয়ে মানবতা ও ইসলামের জন্য কাজ শুরু করার সুযোগ হয়। কবে কোথায় কোন হালাকা হচ্ছে, কোথায় শীতবস্ত্র বিতরণের কাজ চলছে, কোথায় অন্ধ পরিক্ষার্থীর জন্য শ্রুতিলেখক খোঁজা হচ্ছে, কোথায় পথশিশুদের লেখাপড়া শেখানোর আয়োজন চলছে—পড়াশোনার চাপের মধ্যেও সময় ম্যানেজ করে ছুটে যাই। এই কাজগুলোর মধ্যে একটা আত্মিক প্রশান্তি আছে। তবে বিপত্তি সব জায়গায় কিছু থাকে, এই অনলাইন কমিউনিটিগুলোতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে গিয়ে একসময় বুঝলাম : এখানে ইসলামিক স্টাইলে ফ্রি মিক্সিং প্রোমোট করা হচ্ছে, কাজগুলোর উদ্দেশ্য ভালো নির্দ্বিধায়, কিন্তু পন্থাতে গলদ। আর আল্লাহর কাছে কোনো কাজ কবুলিয়াতের শর্তই হচ্ছে, কাজটির নিয়্যাত শুদ্ধ হতে হবে, পাশাপাশি কাজের পন্থাও সুন্নাহ মোতাবেক হতে হবে। দোদুল্যমানতার দোলায় দুলতে থাকা, একসময় অনেকটা জোর করেই উঠে আসা আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া : *ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম।...*

এরই মাঝে নলেজের প্রতি আকর্ষণটাও বেড়ে চলছে দুর্নিবার, অনলাইনে বিভিন্ন দলের কাদা ছোড়াছুঁড়ি, মাজহাবি লা-মাজহাবির চিরাচরিত সংঘাত, পরিবারের মধ্যে কেউ রাজনৈতিক ইসলামিক, কেউ অরাজনৈতিক, সেখানেও কোন্দল, দলাদলি..... বিভিন্ন মত-পথের দ্যোতনায় নিজের প্রোএক্টিভ মস্তিষ্কে সারাদিন প্রশ্ন আর প্রশ্ন, জেনে-বুঝে ইসলাম মানতে চাইছি; কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। যাকেই জিজ্ঞেস করি, সে নিজের দিক থেকে উত্তর দেয়, অন্যদেরকে ধুয়ে দেয়। এত সুন্দর একটা জীবনব্যবস্থা, অথচ মানুষগুলো এত অসহিষ্ণু কেন? গন্তব্য যদি একটাই হয়, তবে পথগুলো নিয়ে এত রেষারেষি কেন? এটা যদি এই হয়, তবে ওটা নয় কেন?? আমার এই সহস্র-অযুত 'কেন'র উত্তর কেউ দেয় না, দিতে পারে না। অন্তরাত্মা মৃত্যুমুখী, কিন্তু 'অন্তরের মৃত্যুর খবর কেউ রাখে না'। অতঃপর সিদ্ধান্ত গাঁটবেধেই নিলাম—আমার প্রশ্নের উত্তর আমাকেই বের করতে হবে, পড়তে হবে, জানতে হবে, জানাতে হবে।

তাফসিরে কুরআন পড়তে গিয়ে দেখলাম, ইবতেদায়িতে মাদরাসায় পড়া অল্পকিছু পরিচিত শব্দ, কিন্তু সেই একই শব্দের রূপ একেক জায়গায় একেক রকম, সামান্য

Scanned with CamScanner

কিছু জানা বাকি সবই অজানা—আল্লাহর কালাম, এইভাবে ধার করা বিদ্যেয় পড়ে কি স্বাদ পাওয়া যায়? আমাকে আরবি শিখতে হবে। সে কি এই সহজলভ্য আরবির যুগ? সময়ের ব্যবধান কম; কিন্তু সুযোগের ব্যবধান বিস্তর। গুগলে এমন কোনো কী-ওয়ার্ড নেই, ফেবুতে এমন কোনো সার্চ ওয়ার্ড নেই যা বাদ রেখেছি—কোথায় এরাবিক শেখা যায়! নাহ, অনলাইনে তেমন ভালো কোনো রিসোর্সই নেই, বহু ঘেটে অফলাইন যেসব উস্তাদের কথা জানলাম, তাদের কাছে পড়াটাও দুঃসাধ্য, সময়সাধ্য। শেষমেশ উস্তাদ আব্দুল মতিনের বাসায় গিয়ে পড়া শুরু করলাম কয়েকজন, সবাই ছেড়ে দিলেন অল্পদিনেই, একাই রয়ে গেলাম। সকালে কয়েক ঘণ্টা উস্তাদের কাছে পড়তাম, আর বাকি সময় উস্তাদের স্ত্রী আর ভাতিজির কাছে, দুপুরের খাওয়াও আন্টিদের সাথে মাদরাসার রান্নাই খেতাম—দেড়মাসেই শেষ করেছিলাম দু'বছরের সিলেবাস, আলহামদুলিল্লাহ।

খুব করে চেয়েছিলাম, ঢামেকে (ঢাকা মেডিকেল কলেজ) চান্স হোক, কোচিংয়ের ভাইয়ারাও গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, তবে আল্লাহকে জোর করে বলিনি, তার যেটা ভালো মনে হয় সেটাতেই খায়ের পাবো। চলে এলাম রামেক (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ)। আজীবন ঢাকার পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েটি এবার তার সব কর্মকাণ্ড, কমিউনিটি ছেড়ে রাজশাহীর পথে, যেখানে কিচ্ছু চেনা নেই, জানা নেই, কোনো ইসলামিক কমিউনিটিও নেই, ভালো কোনো পরিচিত উস্তাদ নেই, তবু আল্লাহর ইচ্ছের জয় হলো। আর এটাই ছিল আল্লাহর কাছে আসার পথে সবচে উত্তম সিদ্ধান্ত, ফালিল্লাহিল হামদ।

হোস্টেলের যে অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে কক্ষ দেখে কেঁদেকেটে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, সেই হোস্টেলই আমার জীবনের বাকিটা মোড় ঘুরিয়ে দেবে, জানা ছিল না। একাকী নিঃসঙ্গ জীবনে প্রথম কিছু বড় আপুর দেখা পেলাম, যাদের সাথে পরিচয়ের শুরুই ছিল : 'আসসালামু আলাইকুম'। আমাকে ঘটা করে দীনের দাওয়াত দিতে হয়নি। সত্যের ডাকে আমি বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারি না কোনোদিনই, অজান্তেই আপুদের ভালোবেসে ফেলেছিলাম, নতুন হয়েও আপুদের সাথেই দাওয়াতের কাজে থেকেছি। পরে জেনেছি : তারাও নাকি নামাজে আমার নাম ধরে দোয়া করতেন, আমি যেন তাদের সাথে যোগ দিই। সত্যিই যোগ দিয়েছিলাম, বাসায় না জানিয়েই, সত্যের দাওয়াত পেলে কি সেখানে কোনো কারণ প্রদর্শন চলে? আমার মাঝে যা নেই, তা তাদের মাঝে আছে—আমাকে শিখতে হবে। আমি তো শিখতেই চাই, জীবনটাকে বদলাতে চাই, যেভাবে আমার রাব্ব চেয়েছেন।

Scanned with CamScanner

আলহামদুলিল্লাহ, আপুদের কাছে যা শিখেছি, তা বললে কম হবে : লম্বা ফুলস্লিভ ড্রেস পরা, রুমের ভেতরেও পর্দার হালতে থাকা, সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলা, জুনিয়র সিনিয়র সবাইকে আগে সালাম দেওয়া, রুমে ঢুকতেও সালাম দেওয়া, বান্ধবীদের কিংবা দীনি বোনদের নিয়ে চা চক্র, রান্না করে খাওয়া, নিজের খাবারটা অন্যজনকে তুলে দেওয়া, যেকোনো সমস্যায় জুনিয়রদের সর্বোচ্চ সাহায্য করা, শর্ট আবায়া থেকে লং, হিজাব থেকে নিকাবে উত্তোরণ, গিবত এড়িয়ে চলা, স্যারদের নিয়ে ব্যঙ্গ না করা, কাউকে উপনামে না ডাকা, ক্লাসে কারও প্রক্সি না দেওয়া (এটাও মিথ্যে সাক্ষ্য), ছেলে ব্যাচমেইটদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা না বলা, আমীরউদ্দিন গ্যালারীর চোখ ধাঁধানো সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে দর্শক হিসেবেও উপস্থিত না থাকা, র‍্যাগডেতে না যাওয়া, ছেলেদের সাথে ট্যুরে না যাওয়া, রিলেশানশিপকে না বলা, ছেলে ক্লাসমেট কিংবা সিনিয়রদের সাথে ফোনেও কোনো বাক্যবিনিময় না করা, মিউজিক ছেড়ে দেওয়া, হোস্টেলে দীনের দাওয়াত দেওয়া, পরস্পর পরস্পরকে নসিহত দেওয়া, বোন হিসেবে ভুলগুলো শুধরে দেওয়া, ফরজিয়্যাতের পাশাপাশি নাফলিয়্যাতে পাবন্দির চেস্টা। আপুদের উপদেশ : তুমি যখন আদর্শের বাহক, তোমার নিজেকে আদর্শের সর্বোচ্চটাই গ্রহণ করতে হবে, তুমি নিজেই যদি সহজটা বেছে নাও, তোমার অনুসারীরা আরও সহজ খুঁজবে। তোমার একটা ভুল তোমার ইসলামকেই ভুল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেবে।

আমি তো এমনটিই খুঁজছিলাম, ঢাকার জীবনে ফ্রি মিক্সিং ইসলামের মধ্যে ঢুকে যে কষ্টটা টের পেয়েছি প্রতিনিয়ত, যে বিষয়গুলো মেনে নিতে পারিনি, এখানে এসে সেই আকাঙ্ক্ষিত শুদ্ধ রূপটিই পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আমি জানছি, প্রতিদিন শিখছি, এরচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত আর কী হতে পারত?? আল্লাহই উত্তম কর্মবিধায়ক।

সেই যে ইলমের তলব, সেটা নিয়ে অনলাইনেও খোঁজ নিতে থাকলাম, Islamic Online University' র কথা কানে এলো। এখানে অনলাইনেই ইসলামিক স্টাডিজে অনার্স করা যায় : আরিব্বাস! এই তো সুযোগ! IRF এ যাওয়া হোক আর না-ই হোক, অনলাইনে পড়ার দ্বার তো খোলাই আছে, এটাই বা কম কীসে? যেই ভাবা সেই কাজ :

- আম্মু, আব্বু, IOU তে পড়বো।
- তুই এত পড়ার প্রেশার সামলাতে পারবি, বাবা?

Scanned with CamScanner

- কেন নয়? রিস্ক নিয়েই দেখি না!

বেশ কয়েকজন ক্লাসমেইট, সিনিয়র আপুও শুরু করার আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু সেমিস্টারের শুরুতে আর কাউকেই সাথে পেলাম না, অগত্যা আবারও 'একলা চলো রে' বাণী নিয়ে শুরু করা। রাজশাহীতে এক্সাম সেন্টার নেই, IBMC'র আরেক আপুকে সাথে নিয়ে এপ্লিকেশান করা, সেন্টার গ্রান্টেড, পড়া শুরু, একাডেমিক ইসলামিক নলেজের পথে পথচলা শুরু.. পুরনো বিদ্যের ঝালাই, নতুন অনেক কিছু শেখা, অনেক অনেক 'কেন'র উত্তর খুঁজে পাওয়া, জ্ঞানের আরও নিত্য নতুন পথের সন্ধান মিলতে থাকা।

ও হ্যাঁ, মিউজিক ফিতনা থেকে কীভাবে বেরিয়ে এলাম? একটু একটু করে ডিলিট করতাম পছন্দের গানগুলো, সবশেষে ফোল্ডারে আর ১০/১২ টি গান ছিল যেগুলো না থাকলেই নয়। কোনো এক ইমোশনাল মোমেন্টে 'বিসমিল্লাহ' বলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে পুরোটা ফোল্ডার একবারে শিফট ডিলিট দিয়েছিলাম : 'ইয়া আল্লাহ, আপনি সাহায্য করুন, এই হারাম থেকে আমার বের হওয়ার ব্যবস্থা করুন!' একবারেই পারিনি, ধাপে ধাপে ট্যাপারিং ডোজে ছেড়েছি, বাংলা হিন্দি আধুনিক গান থেকে সামি ইউসুফ, মাহের জেইনের মিউজিক্যাল ইসলামিক, তা থেকে নন মিউজিক্যাল ভোক্যাল ইসলামিক নাশিদ, আর তারও পর মিশরি রশিদ, ইউসুফ এদঘুশ, তাউফিক সায়েগ, আবু হাফস, ফারহাত হাশমি কিংবা উমর হিশাম আল আরাবির মোহনীয় সুরের তিলাওয়াত : এরচে সুন্দর সত্যিই আর নেই, বাকিটা জান্নাতে, ইনশাআল্লাহ।

পেছনে ফিরে তাকালে আজ খুব বেশি অবাক হই আর কৃতজ্ঞতায় নত হই—আমি যতটুকু চেয়েছিলাম, আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তারও চেয়ে সহজে, তারও চেয়ে সুন্দরভাবে আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছেন, প্রতি মুহূর্তে গাইড করেছেন, পা পিছলে পড়তে পড়তেও তুলে এনেছেন, আমার মনের অসংখ্য 'কেন'র উত্তর মিলিয়ে দিয়েছেন, আজ আমাকেই অনেকের 'কেন'র উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। সেই রাব্বে কারিমের নেয়ামত আমি কীভাবে অস্বীকার করি? সেই আল্লাহর সিদ্ধান্তে তাওয়াক্কুল না করে আমি কী করে হতাশ হতে পারি? একজন পথ খুঁজে চলা উদ্ভ্রান্ত পথিকের জন্য—যিনি প্রতি বাঁকে বাঁকে লাইটহাউজ দিয়ে পথ চিনিয়ে এনেছেন, সেই মালিকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া কি তার মানায়? ভাষা অযোগ্য হবে আমার রাব্বের প্রশংসায়, আমি জানি না, কীভাবে বললে সত্যিই তার নেয়ামতের প্রশংসা করা যায়।

Scanned with CamScanner

আমাকে নির্দিষ্ট কোনো দলমতের গণ্ডিতে বেঁধে লাভ নেই, যে মহান সত্তাকে ভালোবেসেছি, তার বড়ত্বের কথা যেখানেই বলা হোক, যে মুখই বলুক, আমি বিভোর হয়ে শুনি। কথক ছোট হতে পারে, যার কথা বলা হচ্ছে তিনি মহান, তিনি সুউচ্চ, তার বড়ত্বের কথা কোনো কুকুর বললেও তার মুখ সম্মানিত হবে, আমি তাই শুনবো। অন্তরাত্মার খোরাক জোগাতে তাই ব্যস্ত জীবনেও খুঁজে চলি দীনি মজলিস, বসে পড়ি, কখনো তালিম, কখনো তাফসির, কখনো হালাকা : ইমান ও আমলের সঞ্চয়ে আমি বড্ড গরিব, যেখান থেকে পাই, কুড়িয়ে নিতে চাই, দিনশেষে তবু যদি ঘাটে ফেরার মতো কিছু গোছাতে পারি!

'আল্লাহর কাছে আসার পথ' খুঁজে পেয়েছি, ধীরে ধীরে, কখনও ভুল থেকে, কখনো শুদ্ধ থেকে, এখনও চলছি, পথ তো অনেক বাকি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিঃসঙ্গ পথিকের চলার একজন সঙ্গীও খুঁজে দিয়েছেন, আগে একা চলতাম, এখন দুজন। চলতে চলতে কখনো পা ফসকে যাই, আবার সামলে নেওয়ার চেষ্টা করি; দুনিয়ার মোহে ডুবে যাই, আবার উঠে আসার প্রয়াস; ইমানের কার্ভ কখনো নেমে বেসলাইন টাচ করে, জাহান্নামিদের সারিতে নিজেকে দেখতে পাই, আবারও শংকায়-আশায় সিজদাবনত হই। জানি না, পথের শেষটায় তাঁর দেখা পাবো কি না, যার সন্ধানেই এতটা পথচলা : পাথেয় নগণ্য, কেবল রাহমানুর রাহিমের দয়ার প্রত্যাশায়।

Scanned with CamScanner

আলোয় ভুবন ভরা

কবির আনোয়ার, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

আর-রহমান এবং আর-রহিম আল্লাহর নামে...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হঠাৎ করেই আজ এই মুহূর্তে এসে প্রায় বছর ছয়েক আগের স্মৃতি হাতড়াতে হচ্ছে। তবে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেখলাম, আমার দীনের বুঝ পাওয়ার গল্প আসলে অতটা রোমাঞ্চকর নয়, যা হয়তো অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে, তবু প্রতিটি হেদায়াতের গল্প আসলে নিজ বৈশিষ্ট্যেই বিচিত্র।

আর দশ জন মুসলিম যুবকের মতোই সাদামাটা একটি মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম। তাই ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি একটা সফট কর্ণার ছিল; তবে এই ব্যবস্থাটাকে যে জীবনে ধারণ করতে হবে—সেই অনুপ্রেরণা পাইনি কখনো। স্থায়ীভাবে দীনের বুঝ পাওয়ার আগে আমার জীবনের দুইটা সময়ে আমি ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হই, প্রথমটি ক্লাশ এইটে পড়ার সময়; এই সময়ই আমি প্রথম বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখি। আর যে হুজুরের কাছে পড়তাম, তিনি ছিলেন আমার প্রথম প্রেরণা। কিন্তু কুরআন পড়া শেষ হলে হুজুরকে বাদ দেওয়ার সাথে সাথে আমার সেই প্রেরণাটুকুও যে কখন বাদ পড়ে গেল, অনুভবই করতে পারলাম না! দ্বিতীয় সময়টি হলো আমার কলেজ লাইফের শুরুতে। এই সময় ইসলামিক টিভিতে ডা. জাকির নায়েকের লেকচার দেখে দারুণ অনুপ্রাণিত হই। মানুষটির তাৎক্ষণিক প্রশ্নোত্তরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এবং ইসলামের উপর আরোপিত বিভিন্ন

Scanned with CamScanner

প্রশ্নের যৌক্তিক ও রেফারেন্স ভিত্তিক জবাব ছিল এই অনুপ্রেরণার মূল চাবিকাঠি। সেই সময়টায় জাকির নায়েকের সাথে সাথে আহমেদ দিদাতের লেকচারও আমাকে দারুণ অনুপ্রাণিত করে; কিন্তু এই অনুপ্রেরণাগুলো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের কারণে। হ্যাঁ, আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে তখন প্রচুর মিউজিক আর মুভিপাগল ফ্রেন্ড ছিল। তবে কেন জানি এই দুইটা জিনিস আমাকে তখনও আকর্ষণ করতে পারেনি। আমি ওদের সাথে থাকতাম কেবলই 'আড্ডা' দেওয়ার জন্য। একটা পর্যায়ে গিয়ে কিছু রক মিউজিক (হাতে গোনা কয়েকটাই শুনতে ভালো লাগত) এবং রবীন্দ্র সংগীত শোনা শুরু করলাম; কিন্তু ওই পর্যন্তই। ক্লাশ এইটের হুজুর কিংবা জাকির নায়েকের মতো রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুপ্রেরণাও স্থায়ী হলো না। তাই আমাদের আড্ডায় ফ্রেন্ডরা যখন মুভি আর মিউজিকের প্রসংগ নিয়ে আসত তখন আমি থাকতাম নীরব শ্রোতা। তবে এই দুই টপিকের বাইরে আমি খুব ভালো একজন আড্ডাবাজ ছিলাম! কলেজ লাইফে আমার প্রধান দু'টি কাজ ছিল—পড়াশোনা করা (অনেকটা টিপিক্যাল 'আঁতেল' বলতে পারেন) আর ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দেওয়া। এই আড্ডার ফাঁকে ফাঁকেই দিনের পর দিন বিনা হিসাবে কত নামাজ পরিত্যাগ করেছিলাম তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এভাবে চলতে চলতেই কলেজ জীবন শেষ করে বুয়েটে ভর্তি হলাম। বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারটাও গতানুগতিকভাবেই চলছিল। তবে এই সময়টায় অতিরিক্ত যে দুটি 'অঘটন' আমি ঘটিয়েছিলাম সেগুলো হলো—

১) মেকানিক্যাল ফেস্টিভালের নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য বড় ভাইদের ডাক পেতাম (মানে, তারা কাহিনি বলতেন আর আমি পাণ্ডুলিপি লিখতাম) এবং

২) মেকানিক্যাল এসোসিয়েশনের AR (Association Representative) হয়ে বেশ 'কালচারাল' একটা ব্যক্তিত্ব গঠনের চেষ্টা শুরু করেছিলাম।

বুয়েটে ফার্স্ট ইয়ারে সবার একটা ক্রেজ থাকে নতুন কোনো ডায়ালগ দিয়ে গেঞ্জি বানানোর, হাতের কাছে থাকে বুয়েটের লোগো। 'সেই ভাব' যাকে বলে! মনে আছে, এই গেঞ্জির ডিজাইন করার জন্য রাত ৩টা পর্যন্ত অন্য হলে এক ফটোশপার ফ্রেণ্ডের রুমে কাটিয়ে নিজ হলে ফিরে আবার ভোর ৪ টা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে ঘুমাতে গেছিলাম। এই গেঞ্জির ডিজাইন নিয়ে কাপড় কেনা থেকে শুরু করে বানিয়ে বিতরণ করা পর্যন্ত সবকিছুতে ফ্রন্ট লাইনে ছিলাম। ওই যে বললাম, একটা 'কালচারাল ব্যক্তিত্ব' গঠনের চেষ্টা করছিলাম তখন। আরেকটা কথা না বললেই নয়, বুয়েটে

Scanned with CamScanner

যখন কোনো নতুন ব্যাচ আসে হলে, তখন হলের টিভিরুমে ইমিডিয়েট সিনিয়র ভাইয়েরা নতুনদের নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করে। এটাকে বলা হয় 'র‍্যাগ প্রোগ্রাম'। তাতে জুনিয়রদের সারা রাত যাবৎ নর্তন-কুর্দন করানোর পর শেষরাতে বেশ উত্তম মানের খাওয়া দাওয়া করিয়ে একটা ফটোসেশন হয়। নিয়মটা অনেকটা এমন—এই প্রোগ্রামের আগ পর্যন্ত জুনিয়ররা সিনিয়রদের দেখলে ভয়ে কাঁপবে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সালাম দিবে, নাম জিজ্ঞেস করলে পুরোটা বলতে হবে, ডাক নাম বললে 'শালা বেয়াদব' তকমা লেগে যাবে; কিন্তু এই প্রোগ্রামের পর বড় ভাইদের সাথে আর কোনো ব্যবধান থাকে না। এমনকি আমার অনেক ফ্রেন্ডকেই সিনিয়র ভাইদের সাথে এমন আচরণ করতে দেখেছি যা আমি কস্মিনকালেও চিন্তা করতে পারতাম না, অথচ সেই বড় ভাইরা এই বিষয়গুলা খুব 'এনজয়' করত। তো, আমাদের জুনিয়র ব্যাচের র‍্যাগ প্রোগ্রাম আয়োজনেও আমার কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আমি এই র‍্যাগ প্রোগ্রামের সাথে শুরুতে জড়িত থাকলেও কখনোই জুনিয়রদের সাথে বিন্দুমাত্র ব্যক্তিত্বহীন হতে পারিনি, আলহামদুলিল্লাহ।

ঘটনার শুরু সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝি থেকে। সেটা ছিল ২০১১ এর শেষের দিক। হঠাৎ একদিন রাতে আমার মাথায় উদয় হলো যে, 'কতকিছুই তো করছি, কাল থেকে ফজরটা না পারি, অন্তত চার ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করব।' যদিও স্কুল জীবন থেকে এমনটা অনেকবারই ভেবেছিলাম এবং প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছিলাম ধরে রাখতে, কিন্তু সেবারের এই ইচ্ছাটুকু ছিল একেবারেই ভিন্ন। এভাবে শুরুতে বেশ কিছুদিন চার ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়ি। কিছুদিন বাদে যখন দেখলাম, এবার নামাজটা ধরে রাখতে পারছি এবং খুব একটা আলসেমি কাজ করছে না তখন একদিন সন্ধ্যায় (সেই দিনটার সেই মুহূর্ত এখনও চোখে ভাসছে) সাহস করে ঠিক করে ফেললাম— 'আগামীকাল ফজরের নামাজ পড়ব।' সেই সময় আমি থাকতাম বুয়েটের তিতুমীর হলে। আমার রুমমেটরা কেউই নামাজি ছিল না। দুইজন তো একেবারে সারারাত মুভি দেখে ফজরের আজান শুনে ঘুমাতে যেত। সুতরাং তাদের কাছ থেকে কোনো ধরনের দীনি সাপোর্ট পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। যাইহোক, সাহস করে আগে আগে ঘুমিয়ে পড়লাম সেদিন। মোবাইলে এলার্মও দিলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় পরদিন একেবারে এলার্মের আগে ঘুম ভেঙে গেল! সেই দিনটায় আমি যেভাবে আল্লাহর সাহায্য টের পেয়েছিলাম তা আমার পূর্ব জীবনে পাইনি। যেখানে সারাটাজীবন ফজরের নামাজ পড়েছি হাতেগোনা কয়েক ওয়াক্ত, সেখানে সেদিন একদিনের ইচ্ছায় কীভাবে আমি জেগে উঠলাম এলার্মেরও আগে?

Scanned with CamScanner

নিশ্চয় সেটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। কিন্তু অজু সেরে নামাজে যাওয়ার আগে পড়লাম শয়তানের ফাঁদে। শয়তান বার বার বুঝ দিতে লাগল, 'আজ যাওয়া লাগবে না। সবাই তোমাকে দেখে হাসবে, এতদিন ফজরে মসজিদে যাওনি আর আজ?' দুঃখ লাগে, সেদিন শয়তানের সেই কুমন্ত্রণার কাছে আমার দুর্বল ইমান পরাজিত হয়েছিল। যাইহোক, এভাবে কয়েকদিন চেষ্টার পর আমি সমস্ত জড়তা ভেঙে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যাওয়া শুরু করি।

নামাজ যে কীভাবে মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে—তা আমি জীবনের ওই সময়টায় হাড়ে হাড়ে টের পাই। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে মসজিদে যাওয়া শুরু করার পর আমার 'কালচারাল' ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রচেষ্টা অনেকটা হোঁচট খায়। নিজের বিবেকের কাছে কিছুতেই এই দুমুখো নীতি মানতে পারছিলাম না। তখনও দাড়ি রাখিনি; কিন্তু তবুও মনের মাঝে একটা খটকা কাজ করত। শেষমেষ বিবেকের কাছে পরাজিত হয়ে বড় ভাইদের জনিয়ে দিয়ে মেকানিক্যাল এসোসিয়েশনের পোস্টটা ছেড়ে দিলাম। ভাইয়েরা খুব অবাক হয়েছিলেন হঠাৎ আমার সরে পড়ায়।

এভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন আসরের নামাজ পড়ে মসজিদে বসে ছিলাম। এক সিনিয়র ভাই ডাক দিলেন, তিনি নামধাম জানার পর খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। ইসলাম নিয়ে অনেক গল্প করলেন, আমাদের কেন ইসলাম মানতে হবে সেটা নিয়ে যতটা না আলোচনা করলেন তার চেয়ে বেশি আলোচনা করলেন 'কীভাবে ইসলাম মানতে হবে' তা নিয়ে। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যে বুঝটুকু আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা আজও আমার পাথেয় হয়ে আছে। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন। এরপর সেই ভাই প্রায়ই আমাকে ডাকতেন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক কথা বলতেন আর ভালো ভালো নাস্তা খাওয়াতেন। তাঁর বিভিন্ন কথায় একটা বিষয়ই বার বার প্রতিভাত হতো আর সেটাই আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, 'আমাদের দীনের ব্যাপারে একমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহর কথাই চূড়ান্ত। আর আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে ও মানতে হবে সেভাবে যেভাবে আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিগণ বুঝেছিলেন ও মেনেছিলেন। আর আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে হবে সেই সকল আলেমদের যারা কুরআন ও সুন্নাহ বাখ্যা করেন সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িনদের বুঝের আলোকে। দীন ইসলামের সৌন্দর্য তখনই আমরা টের পাব যখন আমরা দীনের জ্ঞান অনুসন্ধান করব। তাই আমাদেরকে প্রচুর পড়তে হবে আর মানুষকে জানাতে হবে।'—আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে এই কথাগুলো সেই বড় ভাই গেঁথে দিয়েছিলেন। আমি যেহেতু

Scanned with CamScanner

আগে থেকেই কিছুটা পড়ুয়া স্বভাবের ছিলাম এবং হুটহাট আবেগের বশে কিছু করতাম না, তাই এই কথাগুলো আমার মনে ধরল। পাশাপাশি আরেকটা জিনিস ভালো লাগল যে, তিনি আমাকে ইসলামের চরমপন্থী কোনো বাখ্যা দেননি কিংবা সেদিকের দাওয়াতও দেননি। বরং তিনি আমাকে ইসলামের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে পড়তে বলতেন। আকিদা, সুন্নাত, বিদআত, তাওহিদ, শির্ক-এসব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা নেওয়ার জন্য শুধু পড়ার তাগিদই দিতেন না বরং কিছু বই এর সফটকপিও দিয়েছিলেন। বলা যায়, আমার দীনের বুঝ আসা এবং হাঁটি হাঁটি করে দীনের জ্ঞানার্জনের সময়টা সমসাময়িক।

ঠিক সেই সময়ই আমার বড় ভাই বাসায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কোনো একটি তাফসিরগ্রন্থের একটি খণ্ড নিয়ে আসে। সেখান থেকে সূরা মুহাম্মাদের তাফসিরটুকু কী মনে করে যেন পড়ে ফেললাম। দাসপ্রথার ইসলামি ধারণা নিয়ে বেশ বিস্তারিত আলোচনা ছিল সেখানে। পড়ে এতই মুগ্ধ হলাম যে, মনে হলো, এই বিষয়টা সবারই জানা উচিত। সেই চিন্তা থেকে ফেসবুকে একটা নোট লিখে ফেললাম। সেই নোট চোখে পড়ল আমাদের বুয়েটের আরেক দীনি বন্ধুর (সে তখন অনলাইন জগতে রীতিমত এক আলোচিত লেখক)। একদিন আমার সাথে দেখা করতে এলো। অনেক গল্প করলাম। সেদিন আমাকে দাড়ি রাখার ব্যাপারেও একটা ভালো মোটিভেশন দিয়েছিল সেই বন্ধু। কথাপ্রসঙ্গো জানতে পারলাম, আমাকে যে ভাই দীনের দাওয়াত দিয়েছিল তার সাথেও সখ্যতা রয়েছে এই বন্ধুর। একদিন আমরা তিনজন একসাথে হয়ে অনেক বিষয়ে গল্প করলাম। দীনের বিষয়ে তারা ছিল আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে। আর হবেইনা বা কেন? আমি তো তখন কেবল হাঁটি হাঁটি পা পা করে যাত্রা শুরু করেছি।

এভাবেই ওই দুই ভাইয়ের হাত ধরে ক্রমাগত পরিচিত হতে লাগলাম অন্যান্য দীনি ভাইদের সাথে। সেই সময় আমার উপর আল্লাহর কয়েকটি বিশাল অনুগ্রহ ছিল যেগুলো আমি সারা জীবন মনে রাখব, ইনশাআল্লাহ। সেগুলো হলো-

- দীনি ভাইদের সাথে মেশার সাথেসাথেই আমি বেদীনি সংগ ছাড়ার গুরুত্ব টের পেয়েছিলাম। আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে পুরাতন বে-দীনি সার্কেল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

- পুরাতন সার্কেল ছেড়ে আসলেও একটা দিনের জন্যও আমার একাকিত্ব

Scanned with CamScanner

অনুভূত হয়নি। আল্লাহর ইচ্ছায় বেশ কিছু দীনি ভাই-বন্ধু পেয়ে গিয়েছিলাম যাদের নিয়েই সবসময় ব্যস্ত থাকতাম।

■ আমাকে ইসলামের ভুল বাখ্যা করেনি। প্রাথমিক সময়ে যখন আমি তেমন কিছুই জানি না তখন অনেকে আমাকে ইসলামের চরমপন্থী কিংবা সুফিপন্থী বাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারত। কিন্তু আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তাকে কে পথভ্রষ্ট করতে পারে? আল্লাহ আমাকে প্রথম থেকেই সকল ধরনের ভ্রান্তিমূলক কথাবার্থা ও বিশ্বাস থেকে হেফাজত করেছেন।

এভাবে চলতে চলতে একদিন ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটির সন্ধান পেলাম। সেখানকার ডিপ্লোমা সেকশনে পড়া শুরু করলাম। সেই সময় একটা ঝামেলার কারণে প্রায় ৩ মাস বুয়েটের ক্লাশ বন্ধ ছিল। এই ৩ মাসে ৮-৯ টার মতো কোর্স সম্পন্ন করে ফেললাম। তারপর আরেক দীনি ভাই (যাকে অনলাইন জগতের সবাই এক নামে চেনেন) এর মোটিভেশনে সাহস করে BAIS (Bachelor of Arts in Islamic Studies)-এ ভর্তি হয়ে গেলাম। এখনও চলছে সেই জ্ঞানার্জনের ধারা।

এই হলো আমার গল্প। খুব বেশি যে এগিয়ে গিয়েছি এই কয় বছরে তা নয়, তবে এটুকু অন্তত বুঝতে শিখেছি যে, আমার জানা ও মানার এখনও অনেক অনেক অনেক বাকি। আমি ইমান ও আমলের দিক থেকে আল্লাহর এক নগণ্য বান্দা। দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে 'কলবুন সালিম' অর্জন করাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

সেই সব দিনরাত্রি

রাফান আহমেদ, এমবিবিএস, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, লেখক, বিশ্বাসের যৌক্তিকতা

এক

Tell me not, in mournful numbers,
"Life is but an empty dream!"
For the soul is dead that slumbers,
And things are not what they seem.

- A Psalm of Life, Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882)

- 'কী ব্যাপার, এত তাড়াহুড়ো করে কোথায় যাচ্ছ? ক্লাসে যাবে না?'

- 'না, আমি একটু ঢাকা মেডিকেলে যাচ্ছি। আমার এক ফ্রেন্ড সুইসাইড করেছে। ওর লাশ মর্গে এখন। পরে কথা হবে।'

এতটুকু বলেই সাইকেল নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল আরমান। অবাক হলাম একটু। কৌতূহল বেড়ে গেল। রাতে অবশ্য জানতে পারলাম পুরো ঘটনা।

আরমানের ক্যাডেট জীবনের বন্ধু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্সের ফার্স্ট বয় আসিফ। পড়াশোনা, খেলাধুলা দুদিকেই অলরাউন্ডার বলা চলে। ক্যাডেটে পড়ার সময়ে আসিফ বলত—সে নাকি ফিজিক্স দেখতে পায়! ফলাফলের দিক দিয়ে সবসময় সামনের সারিতে সে। আরমান বলল, আসিফ নাকি একসময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি ছিল। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি একটা ছেলে কেনই-বা সুইসাইড করে বসল, জানতে চাইলাম ওর কাছে। আরমান বলল, আমি তোমাকে ওর লেখা সুইসাইড

Scanned with CamScanner

নোটটা মেইল করব। তুমিই দেখে নিয়ো। ভাবলাম, বাহ! একেবারে সুইসাইড নোট!

রাত প্রায় একটা হবে। মুঠোফোনের পর্দায় মিটিমিটি আলোয় ভেসে থাকা সুইসাইড নোটটা পড়া শুরু করলাম। জানা শুরু করলাম ওর জীবনকাহিনি। পড়তে পড়তে জানতে পারলাম, নাস্তিক্যবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছিল সে। ধীরে ধীরে আবিষ্কার করি—ওর মাথার চিন্তাগুলো কয়েকদিন থেকে আমার মাথায়ও ঘুরপাক খাচ্ছে। নাস্তিক্যবাদের লজিক্যাল সিকোয়েন্স যদি কেউ অনুসরণ করে, তবে তার পক্ষে বাঁচা আসলেই কঠিন। আমার জন্যও কঠিন হচ্ছিল। নাস্তিক্যবাদের বক্তব্য—এই মহাবিশ্ব, প্রাণের উদ্ভব সবই কেবল দুর্ঘটনার ফল। আমাদের এ জীবন কেবলই বেঁচে থাকা, সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও তারপর মরে যাওয়ার জন্য। অন্য ভাষায়, We born to Die! জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো পরম ভালো নেই-মন্দ নেই, কেবলই যোগ্যতমের টিকে থাকার লড়াই।

ডারউইনিয়ান ওয়ার্ল্ডভিউ। সে আইনস্টাইন হোক অথবা রাস্তার কোনো মানুষ, উভয়েরই পরিণতি একই। দিনশেষে সবাই পোকার খাদ্য হবে। নাস্তিকদের গুরু রিচার্ড ডকিন্সের ভাষায়,—

"... ইলেক্ট্রন, স্বার্থপর জিন, উদ্দেশ্যহীন বস্তুগত বল ও জেনেটিক পরিবর্তনের জগতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কেউবা সৌভাগ্যবান হবে। আর আপনি এর পিছনে কোনো ছন্দ বা কারণ খুঁজে পাবেন না। কিংবা পাবেন না কোনো ন্যায় বিচার। যে বৈশিষ্ট্য আমরা আশা করি (ডারউইনীয় জীবনদর্শন) ঠিক তাই রয়েছে আমাদের চারপাশের এই জগতে। এর মূলে না আছে কোনো পরিকল্পনা, কোনো উদ্দেশ্য, কোনো মন্দ, কোনো ভালো, কিছুই নয়। আছে কেবলই নির্দয় নির্লিপ্ততা।[১]"

এখনো মনে পড়ে, মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশ্নগুলো। কেন বাঁচব? পোকার খাবার হওয়ার জন্য? সত্যিই কি এই জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই? আসলেই কি আমরা একটি দুর্ঘটনার ফল? আর কিছু না? কিচ্ছু-ই না? একটা সময় হতাশ হয়ে পড়তাম। ইচ্ছে করত মাথার চুল ছিঁড়তে।

---

১ Richard Dawkins, River Out of Eden: A Darwinian View of Life; p. 133 (Basic Books, 1995)

Scanned with CamScanner

যে অস্থিরতা আমার মধ্যে কাজ করেছে, ঠিক সেরকম অস্থিরতাই কি কাজ করেছে আসিফের মধ্যেও? সেও কি জীবনের উপর প্রচণ্ডরকম হতাশ হয়ে পড়েছিল? হয়তোবা...

এমন চিন্তা-ভাবনা অনেককেই হয়তো না ফেরার দেশে ঠেলে দিয়েছে। *American Journal of Psychiatry* এর Peer Reviewed প্রতিবেদন অনুযায়ী, আত্মহত্যার হার ধার্মিকদের চেয়ে ধর্মহীনদের মাঝেই বেশি।[১]

মানব-জীবনের যে নির্মম বাস্তবতা আমাকে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল, তার প্রথমটি হলো—মানুষ আসলে একা। সে যতই মনে করুক—তার সঙ্গীর অভাব নেই, আদতে সে একা। কেউ কেউ আগেই বুঝে যায়, বোকারা বোঝে মৃত্যুর সময়। আইনস্টাইনও অবাক হয়েছিলেন, বিশ্বব্যাপী এত পরিচিতির পরও তাঁর প্রবল নিঃসঙ্গতা নিয়ে।[২]

একসময় প্রচুর গান শুনতাম। নচিকেতার একটি গানে শুনেছিলাম—

"একলা মানুষ মাতৃগর্ভে একলা মানুষ চিতায়
একলা পুরুষ কর্তব্যে একলা পুরুষ পিতায়
আর মধ্যিখানের বাকিটা সময়
একলা না থাকার অভিনয়"

এ অভিনয় নিত্যদিনের! রূপালি পর্দার অনেক সফল ব্যক্তিত্বকে দেখেছি তাদের একাকিত্ব, হতাশা, বিষণ্ণতা নিয়ে মুখ খুলতে। পর্দার জীবন আর বাস্তব-জীবনের মাঝের গড়মিলটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। মিছে একটি রঙিন চশমা লাগিয়ে জগত দেখতে ব্যস্ত আমরা।

দ্বিতীয় যে বাস্তবতা আমায় ভাবিয়ে তোলে, তা হলো—সুখের সন্ধান। সুখ কী?

---

১ Religious Affiliation and Suicide Attempt, American Journal of Psychiatry, Vol. 161: , Issue. 12, : Pages. 2303-2308 (Issue publication date: December 2004) Available at: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.12.2303

২ John B. Sanford, The Waters of Darkness; vol. 2, p. 233 (David R. Godine Publisher, 1986)

Scanned with CamScanner

সুখের সংজ্ঞা দেওয়াটা বেশ মুশকিল! একেকজনের কাছে সুখ একেক রকম। কারও কাছে গান, কারও কাছে চলচ্চিত্র, ফোন, খাবার, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, কারও কাছে নিঃসঙ্গতা, কারও কাছে আবার নেশার জগতে হারিয়ে দুনিয়া ভুলে থাকা। এত্তো রকম সুখের সংজ্ঞা। কিন্তু আসলে সুখ কী? দুনিয়ার বস্তুতে সুখ খুঁজতে গিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করলাম। এই সুখের অনুভূতি বা ভ্রম ক্ষণস্থায়ী। টাকা, সম্মান, খ্যাতি, গাড়ি, বাড়ি, নারী প্রভৃতিকে সুখের ঠিকানা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া সমাজে যারা এসবের চূড়ান্ত শিখরে উঠত তাদের আত্মহননের খবরে বিচলিত হয়ে পড়তাম। ভাবতাম, সুখ আসলে কী? ধর্ম আমরা মানতে চাই না কেন? এজন্যই তো যাতে 'YOLO (you only live once)' বা 'জিন্দেগি না মিলেগি দুবারা' চেতনার জীবনযাপন করা যায়, তাই না? কিন্তু এই সেলিব্রেটিরা কেন নিজের জীবন নিয়ে নিচ্ছে? হতাশা কেন এত বেশি তাদের? কেন এত মাদক ব্যবহারের ছড়াছড়ি তাদের মাঝে?[১]

সুখ কোথায় তাহলে? জীবনের কি আদৌ কোনো উদ্দেশ্য আছে? নাস্তিক্যবাদ কী বলে? সাহিত্যে নোবেলজয়ী Existentialist দার্শনিক জেন পল সারত্রের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফরাসি লেখক এন্টোনি রোকুয়েন্টিন-এর ভাষায় বললে—

"কথা কিন্তু সত্যি। আমি এমনটিই বুঝতে পেরেছি যে—আমার বেঁচে থাকার কোনোই অধিকার নেই। (বস্তুবাদ অনুযায়ী) আমার অস্তিত্ব ঘটেছে আকস্মিকভাবে। আমি মানুষ না হয়ে পাথর, গাছ কিংবা জীবাণু হিসেবে অস্তিত্বলাভ করতে পারতাম।... আমি চিন্তা করছিলাম... এই যে আমরা এই পৃথিবীতে খানাপিনা করে বেড়াচ্ছি আমাদের মূল্যবান অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু এ বেঁচে থাকার তো কোনো কারণই নেই, একদম না।[২]"

এই ভাবনাগুলোই ঘুরে বেড়াত মাথাজুড়ে। কবির ভাষায় বললে,—

"মাথায় কত প্রশ্ন আসে, দিচ্ছে না কেউ জবাব তার—
সবাই বলে, "মিথ্যে বাজে বকিসনে আর খবরদার!"

---

১ https://m.huffpost.com/us/entry/3640440, Celebrities and substance abuse, Proc (Bayl Univ Med Cent). 2009 Oct; 22(4): 339–341. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2760168/

২ Jean-Paul Sartre, Nausea; p. 162

Scanned with CamScanner

অমন ধারা ধমক দিলে কেমন করে শিখব সব?
বলবে সবাই "মুখ্য ছেলে", বলবে আমায় "গো গর্দভ!"...
কতই ভাবি এসব কথার জবাব দেবার মানুষ কই?
বয়স হলে কেতাব খুলে জানতে পাব সমস্তই।"

(বিষম চিন্তা, সুকুমার রায়)

যদিও বয়স খুব একটা হয়নি, তাও ভাবলাম—কেতাব খুলে দেখি, 'পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন' টাইপ কিছু পেয়ে যেতেও তো পারি! তবে তার আগে একটু পেছনে ফেরা দরকার। কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখনো বাকি আছে।

দুই

আমার জন্ম আর দশটা সাধারণ বাঙালি মুসলিম পরিবারের মতো পরিবারে যারা নিজেদের মুসলিম মনে করে, কিন্তু সঠিক ইসলাম কী সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বললেই চলে। যতটুকু ধারণা আছে তা কেবল সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে। নামাজ বা কুরআন পড়া হতো শুধু দুনিয়ার ফায়দা লাভের জন্য। তা ভালো ফলাফল করার জন্য হোক কিংবা বিপদ কাটানো হোক। জীবনদর্শনে ধর্ম খুব বেশি একটা প্রভাব ফেলত না। সময়ে অসময়ে টেলিভিশনে অসংখ্য ডিশ চ্যানেলের ফাঁকে ফাঁকে দেখতাম একজন কোট-টাই পরা শুকনা মানুষ উঁকি দিত। তার মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাতো![১] তবে এই দৃশ্য হয়তো দশ সেকেন্ডও স্থায়ী হতো না। রিমোটের চাপে তার আগেই হাওয়া হয়ে যেত।

মেডিকেল কলেজে এসে প্রথম কয়েক মাস পরেই নানা কারণে আমার মাঝে সংশয় শুরু হয়। অজ্ঞেয়বাদের কাছাকাছি বিচরণ করতে থাকি। ঘরের ছেলে বাইরে এলাম। নতুন পরিবেশ বেশ অদ্ভুত লাগতে শুরু করে। নানা মানুষ, নানা চিন্তা, নানা রং। হঠাৎ শুনি—দেশ উত্তাল। শাহবাগে কী জানি হচ্ছে। কে বা কারা যেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অবমাননা করেছে। তাদের শাস্তির দাবিতে দেশ উত্তাল। আরেক খবর শুনে বেশ অবাক হলাম সেদিন। একজন হেইট ব্লগার নিহত হওয়ার পর তাকে 'দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ' ঘোষণা করা হয়। সেদিন বুঝতেই পারলাম না—দেশে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ কবে, কখন শুরু হলো আর কেনই বা

১ এই শুকনা মানুষটি আর কেউ নন—উস্তাদ ডা. জাকির নায়েক।

Scanned with CamScanner

শুরু হলো। এই দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্র পক্ষ কে বা কারা, সেটাও জানি না। সে সময়টা বেশ ভয়ে ভয়ে কেটেছিল।

আমার সেই সংশয়ের সময় দুটো বিষয় আমাকে ফিরিয়ে আনতে থাকে। এক হলো কুরআন, আরেকটি হলো মানবদেহ অধ্যয়ন। মানবদেহ যতই অধ্যয়ন করতাম আমি অবাক হয়ে দেখতাম—এত অসাধারণ ডিজাইন এতে, এত সূক্ষ্ম পরিকল্পনা! একেকটা কোষ যেন একেকটা ফ্যাক্টরির মতো! কত কর্মযজ্ঞ যে চলছে সেখানে। এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি প্রভৃতি পড়তাম আর অবাক হয়ে ভাবতাম,—নাহ! এগুলো এমনি এমনি হতে পারে না। এত জটিল গঠন, ক্রিয়াকলাপ—কীভাবে চলছে? কে এর পিছনে? তখন থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব পড়া শুরু করি। খোঁজার চেষ্টা করতে থাকি আসলে কোন ধর্ম সত্য। সে সময়টা বেশ ভালোই কাটতে থাকে। সবশেষে এই সিধান্তে আসি যে, ইসলামই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও অবিকৃত অবস্থায় আছে। তাই ভাবি—এবার ইসলাম নিয়েই পড়া শুরু হোক। এই পড়ার পথে বিজ্ঞান দার্শনিকদের ভাষায় 'প্যারাডাইম শিফট' আসে তৃতীয় বর্ষের মাঝামাঝি। ইসলাম পুরো ভিন্ন আঙ্গিকে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। বেশ চিন্তায় পড়ে যাই। ভাবি, ঠিক আছে, তলিয়ে দেখব ব্যাপারটা।

শুরু হয় আরও পড়াশোনা। প্রায় ৫-৬ মাস পার করে সিদ্ধান্তে আসি, ইসলাম বলতে আমরা যা পালন করি, তা ভুল! শুধু ভুল না, চরম ভুল! তারপর শুরু করি লেখালেখির কাজ। স্বপ্ন দেখি—আমার এই পড়াকে বিস্তর রেফারেন্সসহ বই হিসেবে প্রকাশ করব। কিন্তু শেষমেষ হয়ে ওঠে না। এর বেশ কিছু পরেই আমার জীবনের বড় দুর্ঘটনা ঘটে যায়! নাস্তিক্যবাদের কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়ার সূচনা ঘটে। কবি বলেছিলেন,

'ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহবন্ধন
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন;
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গান
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।"

(দুঃসময় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Scanned with CamScanner

তিন

এ সময়টাই হলো গল্পের শুরুর সময়টা। বিহঙ্গের চেতনা অন্ধ হয়নি, সত্যের পথে চলার পাখাও বন্ধ করেনি সে। তাই খুঁজতে থাকি। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, বিজ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে না বোঝা, এর মারপ্যাঁচগুলো খতিয়ে না দেখা, বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত না জানা, সর্বোপরি গভীর চিন্তার অভ্যাস গড়ে তুলতে আরও বেশি সময় না দেওয়া ছিল সংশয়ের অন্যতম কারণস্বরূপ। কারণ, এর আগ পর্যন্ত আমার পদচারণা ছিল ধর্মতত্ত্বকেন্দ্রিক। যখন বিজ্ঞানধর্ম, বিবর্তনধর্ম বুঝতে পারলাম তখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, বিজ্ঞানমনস্ক বা বিজ্ঞানের পতাকাবাহী বলে যারা নিজেদের দাবি করে, বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ভুল শেখাতে তারা কতটা সিদ্ধহস্ত। এরও পরে Peer Reviewed জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানতে পারলাম, নাস্তিকদের গুরু রিচার্ড ডকিন্সকে ব্রিটেনের বিজ্ঞানীরাই বিকৃত বিজ্ঞানপ্রচারক বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১]

তাহলে এদেশে তাদের অন্ধ মুরিদদের অবস্থা কী হবে, বলাই বাহুল্য। সুপরিচিত পদার্থবিদ ও গণিতবিদ ফ্রিম্যান ডাইসন বলেছিলেন—

‘সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কারণ, স্কুলে বাচ্চাকাচ্চাদের শেখানো হয়—বিজ্ঞান হলো (পাথরে খোদাই করা লেখার মতো) একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের মিলনমেলা। আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়; বিজ্ঞান কেবলই একমুঠো সত্যের সমন্বয় এমন ভাবা ঠিক নয়, বরং (আমাদের চারপাশের জগতের) রহস্যগুলোকে ক্রমাগত অনুসন্ধান করে চলাই হলো বিজ্ঞান, (আর কিছু নয়)’।[২]

চতুর্থ বছরের শেষে এসে আরেকটি ঘটনা ঘটে। আমার এক ব্যাচমেট একদিন আমাকে ডেকে কিছু প্রশ্ন করে। আমি বুঝতে পারি, সেও সংশয়ের পথে হাঁটা শুরু করেছে। আমি চেষ্টা করি তার প্রশ্নগুলোর যথাসম্ভব উত্তর দেওয়ার। সে জানায়—যাদের সাথে সে কথা বলেছে, তাদের মাঝে আমাকেই সবচেয়ে লজিক্যাল মনে হয়েছে তার। কথা চলতে থাকে ফাঁকেফাঁকে। কিন্তু তার সাথে আমার শেষ বৈঠকে

---

১ Responding to Richard: Celebrity and (mis)representation of science; Available at: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963662516673501

২ http://www.nybooks.com/articles/2011/03/10/how-we-know/

Scanned with CamScanner

তার দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করে আমি বেশ নিরাশ হই। এত অল্প জ্ঞান নিয়ে নাস্তিক হওয়া বেশ বিব্রতকর। বিতর্কে মাঝে মাঝে এমন হতো যে, আমি একের পর এক নাস্তিক বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিতাম, আর সে শুধু বলতে থাকত, 'আমার মতে এই, আমার মতে সেই' ইত্যাদি। এক্সপার্টদের কোনো মত তার কাছ থেকে আমি পেতাম না। পরে জানতে পারি, প্রবৃত্তির অনুসরণ একটা বড় কারণ ছিল তার এই পথে পা বাড়ানোর পিছনে। জনপ্রিয় সাহিত্যিক মার্ক টুয়েইন বলেছিলেন,

There is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable.

এভাবেই জীবন চলতে থাকে। নাস্তিকদের বইগুলো দেখার পরে ভাবি, আমাদেরও তো লেখা দরকার। ধোঁকাবাজির চাদরগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলা দরকার। ভাবতে থাকি এসব নিয়ে কাজ করতে হবে। আমার মতো অবস্থা আর কারও যেন না হয়। পড়তে হবে, জানতে হবে আর মানুষের কাছে তা পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। শুরুটা না হয় ছোট করেই হোক। আমার এক ঘনিষ্ঠ দীনি ভাইয়ের পরামর্শে তখন থেকেই লেখালখির হাতেখড়ি।

এটাই আমার খাপছাড়া জীবনের উপাখ্যান। শেষ কথা হলো, আমরা যাই করি, যাই শিখি—তার উদ্দেশ্য যদি পরম করুণাময়ের সান্নিধ্য অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে উৎসারিত না হয় তবে এই কাজ, এই কথা মরীচিকা সদৃশ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সুপরিচিত ইসলামি মনীষী ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস বলেছিলেন,

"আমরা যা শিখছি তা যদি আমাদের বিশ্বাসের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে, আমাদের আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যেতে না পারে, আমাদের বিশ্বাস আরও মজবুত করতে না পারে তাহলে এর অর্থ হচ্ছে—আমাদের উদ্দেশ্যে, নিয়্যতে ভুল আছে।"

এখন আমার, আমাদের ভাবার সময়—আমাদের উদ্দেশ্য কী?

Scanned with CamScanner

অন্ধের যাত্রা সমীকরণ

মোহাম্মদ তোয়াহা আকবর, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক, উল্টো নির্নয়

বুয়েট ভর্তি-পরীক্ষার রেজাল্টে যখন দেখেছিলাম—আমি বুয়েটে পড়তে পারবো না, তখন আব্বু আম্মুর চেয়ে আমার মন-খারাপের আকাশটাই বেশি কালো হয়েছিল। আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দুনিয়ার সবচাইতে ক্ষ্যাত ইউনিভার্সিটি। আমার সবচেয়ে কাছের কিছু বন্ধু না-পেরে ভর্তির আবেদনপত্র উঠিয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ফরমই নেয়নি। পরে অবশ্য বুঝেছি, একটা ইউভার্সিটি কখনো ক্ষ্যাত হয় না। কখনোই না। আসলে ক্ষ্যাত হয় মানুষগুলো। বুদ্ধিবৃত্তিক বধিরতার কারণে।

যাইহোক, ক্ষ্যাত আর গাধা বলেই হয়তো সমাজের চোখে নামকরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম না। শেষমেশ চান্স হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার প্যাশন, স্কিল সব ছিল ফিজিক্যাল সায়েন্সে। ইচ্ছা, ভালোবাসা, প্রবৃত্তিও। স্বাভাবিকভাবেই ফিজিক্যাল সায়েন্সে পছন্দের কোনো সাব্জেক্টে চান্স পেলাম না। বায়োলজি ছিল আমার দুই চোখের বিষ। মেয়েলি সাব্জেক্ট বলে আজীবন ঘেন্না করেছি সাব্জেক্টটাকে। এতই অহংকারী ছিলাম আমি (অবশ্য এখনো আছি)।

সেজন্যেই হয়তো-বা ভর্তি হতে হলো একেবারে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেই। এটা কোন জীবন?

গিয়েই দেখা হলো এক বন্ধুর সাথে। দুই বছর পর দেখা। এর মাঝে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এডমিশান টেস্টে সেও প্রথম দিকেই ছিল। ইচ্ছে মতোন যেকোনো সাব্জেক্ট নিতে পারবে। কুশলাদির পর জিজ্ঞেস করলাম,

Scanned with CamScanner

-কী রে, কোন সাব্জেক্ট নিবি?

-জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি।

ভাবলাম এইটা আবার কী? কোনো আইডিয়াই ছিল না সাব্জেক্টটা সম্পর্কে। আর দুই চোখের বিষ বায়োলজিই তো! একটা সাব্জেক্ট নিয়ে পড়লেই তো হয়। কী আছে জীবনে? জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজিতে অনেকটা ফাজলামি করেই ভর্তি হয়েছিলাম। এমনকি জানতামও না, এই সাব্জেক্টে কী পড়াবে আর কী পড়াবে না! বুয়েটে চান্স না পাওয়াই তখন আমার জগতটাই বিষাদগ্রস্ত। কিচ্ছু ভাল্লাগে না। এই হতাশা আমার ভেতরে 'জীবন তো শ্যাষ' টাইপের একটা ফ্যাতফ্যাতে অনুভূতির জন্ম দেয়। আমাকে বায়োলজি কেউ কোনোদিন অসাধারণভাবে পড়ায়নি। যেহেতু বায়োলজি কেউ কখনো মাথার ভিতরে সেরকমভাবে ঢুকিয়ে দেয়নি, তাই এই জিনিসটা ভালোও লাগত না, ফিলও করতাম না। ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স আর ম্যাথের উত্তেজনা ছেড়ে বায়োলজির মতোন বোগাস সাব্জেক্ট! ধ্যাত! বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, মাইক্রোবায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রিই চাকরির বাজার হিসেবে সবচাইতে অসাধারণ সাব্জেক্ট। দুটোর মাঝে যেটা ইচ্ছে সেটা নিতে পারি। চয়েস আমার। কিন্তু কী আসে যায়? লাইফ তো এমনিতেই অর্ধেক শ্যাষ। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়েই না হয় বাকিটা ধ্বংস করে দিই। এরপর, চোখমুখ বন্ধ করে সেই বিষ-ই হাতে তুলে নিলাম। হুম! জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি।

ভার্সিটিতে যখন ভর্তি হই তখন আমি বেশ গাঢ় লিকারের নাস্তিক। হুঁ হুঁ বাপু, খুব কড়া নাস্তিক ছিলাম। চারপাশের ধর্মান্ধদের সাথে বেশ কথা হতো। কথা না আসলে, কথা কাটাকাটি হতো। ধর্মান্ধগুলো আবার কথা বলে নাকি? যুক্তিতে তারা কখনোই আমার সাথে পেরে উঠত না। শেষে নিজের বিশ্বাস বাঁচাতে এই বিষয়ে আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিত। ফলাফল—আমার দাঁত কেলানো অহংকারী বিজয়ীর হাসি।

আরেকদল ছিল ধর্মমূর্খ। নিজেকে একটা নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী দাবি করে, অথচ সেই ধর্মের গ্রন্থ কোনোদিনও বুঝে পড়েনি, অনুসরণ করেনি, ভণ্ডামী করে শুধু। আর দিনশেষে বলে, সে নাকি—অবশ্যই স্বর্গে যাবে। এ আবার কেমন কথা বাপু? আমার পেছনে 'ব্যাটা নাস্তিক মুরতাদ কোথাকার' বলে টিটকারি করবে, অথচ সামনে এসে একটা কথা বলার সাহস পায় না। এইসব কাওয়ার্ড আর অন্ধবিশ্বাসী দেখতে দেখতে ধর্মের প্রতি ঘেন্না আর নিজের ভেতরের অহমিকা বেশ ধারালো

Scanned with CamScanner

হয়ে উঠেছিল দিনের পর দিন। সবার ভেতরে শুধু নাস্তিক-মুরতাদদের জন্যে বুকভরা ঘেন্নার পাহাড়, অথচ তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলার সৎসাহস, গভীর পড়াশোনা কিংবা আন্তরিকতা বেশিরভাগ মানুষেরই ছিল না। এখনো নেই। সবার একটাই জীবন। নিজেকে কেন্দ্রে রেখে সেই জীবন ঘুরতে থাকে। আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুরের জোরালো আওয়াজ শোনা যায়।

আমার চরম উগ্রতা আর অহংকারী পরিচয় আমার সতীর্থরা হাড়ে হাড়ে জানে। ভার্সিটির ক্লাস শুরু হলো। সবার সাথে বেশ ফাজলামো করতাম, হিহি হাহা করতাম সারাদিন। ছেলেমেয়ে সবার সাথে চুটিয়ে আড্ডা আর ঘোরাঘুরি হতো। বন্ধুত্বের জয়গান আর তীব্র টানে আমি তখন বিভোর। যাওয়া-আসার পথে শাটল ট্রেনের কোণায় উদ্দাম গান গাওয়া, সিগারেটে জোরসে টান আর বন্ধুত্বের ফান! আহা! এই তো জীবন! আর কী চাই জীবনে? নাহ, কখনো মদ, গাঁজা ছোঁয়া হয়নি, ইভটিজিং করিনি। কিন্তু এর বাইরের ষোলআনা উগ্রতা আর অহংকার আমার চোখে-মুখে খেলা করত। (এখনো যে করে না—সেটা বুকে হাত দিয়ে কী করে বলি!)

আর পড়াশোনা? ভার্সিটির পড়াশোনা আর কী! ক্লাসে ঘুমাও (অন্তত ঝিমাও), আর যদি মানুষ হও তাইলে যাওয়ারও দরকার নেই। বাসাতেই ঘুমাও। তারপর নোট বানাও বা খোঁজো। পরীক্ষার আগে ধুমিয়ে একমাস পড়ো আর মার্কস কোপাও। এখানে সত্যিই কিছু শেখা হয় না। জ্ঞানার্জনের বালাই এখানে নেই। তাই সত্য কোনো জ্ঞানের আলোয় কারও জীবনও বদলে যায় না। অন্ধকার থেকেই যায়। কেবল ভালোভাবে পাশ করে, কিছু স্কিল গজিয়ে, পুঁজিবাদী সমাজের একটা দাস রোবট হিসেবে পরিণত হয়ে, লোকসমাজের বাহবার পূজো-নৈবেদ্যর ডালা সাজিয়ে, চেনা কোনো পথে ক্যারিয়ার গড়বার জন্যে জাস্ট কিছু তথ্য ঢোকাতে হয় মাথায়। মাঝেমাঝে গবেষণার নামে চোখ বুজে রেখে হালকা একটু নাড়াচাড়া করে রেখে দিতে হয়। আর আত্মিক জীবন পড়ে থাকে শ্যাওলাজমা ডোবার মতো। স্রোতহীন, আলোহীন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। রেজাল্ট ভালো হলেই সমাজের চোখে আমি খুব মেধাবী। আর খারাপ হলেই 'তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না' বলে সবার সে কী জোর স্লোগান! বিগত পনের বছরের মেধা, কষ্ট, অধ্যবসায় সব যেন ফালতু হয়ে যায় সমাজের চোখে, আর ভেঙে দেয় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জীবন। কী অমানবিক আর জঘন্য!

Scanned with CamScanner

স্বাভাবিকভাবেই আমাকে নিয়েও আমার মধ্যবিত্ত বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। ছোটবেলা থেকে ভালো ছাত্রের তকমা গায়ে নিয়েও বুয়েটে চান্স না পাওয়া, ধর্মহীন জীবন-যাপন এবং শেষে ইচ্ছে করে একটা অজানা সাব্জেক্টে ভর্তি হওয়া আব্বু আম্মুকে খুব খুব কষ্ট দেয়। তারা এতই কষ্ট পেয়েছিলেন যে, আমার সাথে কষ্টে ঠিকমতো কথাই বলতে পারতেন না। আব্বু আম্মুকে খুব ভালোবাসতাম বলে আমারও কষ্ট লাগত খুব। প্রথম বছরটা জিদ করে ভালোমতো পড়ে, অসাধারণ একটা রেজাল্ট করবোই, এই ছিল টার্গেট। ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের রেজাল্টটা আব্বু আম্মুকে জানানোর পর তাদের চেহারায় যে আনন্দ দেখেছিলাম, তা আমি কোনোদিন ভুলবো না। বাবা-মাকে ভেতর থেকে খুশি করতে পারার আনন্দটাই জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ। এই একটা জিনিস পেলে জীবনে আর বড় কিছু লাগে না বাঁচার জন্যে। যাইহোক, আমার ভালো ছাত্রত্বের ব্যাজ সমাজ আমাকে ফিরিয়ে দিল, শুরু হলো আমার সিলেবাসবর্জন কর্মসূচি।

ছোটবেলা থেকেই খুব বই পড়তাম আমি। পাঠ্যবইয়ের বাইরের প্রতিটা বইয়ের সাথেই আমার নাড়িভুড়ীর বাঁধন। আমি বই পড়ি, খাই, পান করি, ঘুমাই। বার্ট্রান্ড রাসেল, হুমায়ুন আজাদ, আরজ আলী মাতুব্বর, রিচার্ড ডকিন্স আর জাফর ইকবালের অন্ধভক্ত এই আমাকে ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারে মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে হয়েছিল। মলিকিউলার বায়োলজি সেইরকম মজা লাগত আর বায়োকেমিস্ট্রি ছিল যম! আমার বায়োকেমিস্ট্রির ভয় দূর হয় সহপাঠী দীপেশ দাশের হাত ধরে। এত্তো ট্যালেন্ট একটা ছেলে আমি আমার জীবনে দেখিনি। তবে ঘুণেধরা এই অন্ধকার সমাজের মার্কস সিস্টেমের কোণাগলিতে সে ঠিক ঠিক ধরা খেয়েছে। তার হাত ধরেই আমি একসময় বায়োকেমিস্ট্রিরও প্রেমে পড়লাম।

টেক্সটবুকের পাশাপাশি বাইরেও মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রির যা বই পেতাম গোগ্রাসে পড়তাম আর হা হয়ে যেতাম। মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রি আমাকে কোষের জগত চিনিয়েছিল, সেই জগতের নিয়মকানুন আর গণিত শিখিয়েছিল। কোষ আর কোষের ভিতরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ডিজাইন, প্রতিটা ডিজাইনের পেছনের উদ্দেশ্যর হাতছানি, কমনসেন্স আর দর্শন আমাকে এত এত ধাক্কা দিত যে—আমি আরও পড়তাম, আরও পড়তাম। ইন্টারনেটে ঢুকে ভিডিও দেখতাম, আর বুঝতে চাইতাম। আমার একলা জার্নি, একলা পথচলা। ব্যাকটেরিয়ার বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকা লেজ আর মাইক্রোটিবিউলের রেললাইন আমার মাথাকে ঘুরিয়ে মারত। এ যেন নিজের মাঝেই আরও বিলিয়ন বিশ্বজগত।

Scanned with CamScanner

এত এত ডিটেইলের আমি কিছুই জানতাম না, কিছুই না। রিচার্ড ডকিন্সদের পপুলার সায়েন্সের বইগুলোকেই ঈশ্বর মেনে পড়তাম আর নিজে 'সব জেনে ফেলেছি' মনে করতাম। মলিকিউলার বায়োলজি আর বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে পড়তে আমার গভীরে গাঁথা অহংকার ধীরে ধীরে সরে গেল। অন্তত আমার তেমনই ভাবতে ভালো লাগে আরকি! এত এত ডিজাইন, অসাধারণ সব মলিকিউলের সুনির্দিষ্ট সব কাজ, সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূর্ণ নিয়তি বার বার শুধু একজন ট্যালেন্ট মেকানিকের দিকেই আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল আমাকে। অনেক অনেক দেরিতে হলেও বুঝলাম—একজন মেকানিক আছেন, থাকতেই হবে। সেই মেকানিকের ক্রিয়েটিভ আর্ট আর সুপিরিয়র ডিজাইন তো চোখের সামনেই দেখছি, বুঝছি, কিন্তু পরিচয়? পরিচয় তবে কোথায় পাবো? সবাই বলে মেকানিক নিজেই নাকি তাঁর পরিচয় দিয়ে যুগে যুগে পাঠিয়েছেন মানুষের কাছে, যাতে মানুষ তাকে চিনতে পারে, কাছে যেতে পারে। মানুষ এগুলোকে ধর্মগ্রন্থ বলে। অগত্যা আর কী করা? সেখানেই ঝাঁপ!

বেদ, বাইবেল আর কুরআনে সত্য খোঁজা শুরু হলো। দাবি করা ধর্মগ্রন্থগুলোর রাফ ইংরেজি অনুবাদ আর ইউটিউব লেকচারে চোখ গুঁজে থাকতাম ক্ষ্যাপার মতো। সকালে লাশের মতো তীব্র ঘুম। নয়তো রাতজাগা লাল চোখ নিয়ে মাঝেমাঝে ক্লাসে টুঁ মেরে পার্সেন্টেইজ বাঁচানো, এতসব পাগলা খাটুনির পরেও শান্তি লাগত। শুধু নিজেকে বুঝাতাম 'এইত্তো আরেকটু, আরেকটু সামনেই পাবা'। সত্য যেখানে পাবো, সেখানেই যাবো, এই ছিল আমার জেদ। মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেও হিন্দু বা খ্রিস্টান হয়ে যাবো যদি সেখানেই আলটিমেট সত্য পাই। যদি বিকৃতির প্রমাণ আর কন্ট্রাডিকশান না পেতাম, হয়ে যেতামও সত্যি। মনে আছে, একদিন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলেছিলাম,

"ও আল্লাহ, আমি জানি না, তুমি সত্যিই আছ কি না। তুমি যে আছই, সেটাও জোর গলায় বলতে পারি না, আবার তুমি নেই, তাও বলতে পারি না। আমি জাস্ট জানি না। কিচ্ছু জানি না। যদি তুমি সত্যিই থেকে থাক, তাহলে আমাকে পথ দেখাও প্লিজ! তুমি যদি আসলেই থেকে থাক, তাহলে তোমাকে চেনাও, প্লিজ। প্লিজ, প্লিজ!"

মলিকিউলার বায়োলজির হাত ধরেই আমি প্রথম আমার অসাধারণ ডিজাইনারের সামনে নতশিরে দাঁড়াই। লুটিয়ে পড়ি লজ্জায় আর অপরাধের গ্লানিতে। ইসলামের পথে আমার প্রথম হালকা পদচিহ্ন। এরপর একটু একটু করে মুসলিম হতে চাওয়া।

Scanned with CamScanner

সাড়ে তিনবছরের নাস্তিকতা আমার জীবনকে যে পঙ্কিল ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়েছে, তা থেকে বের হওয়া তো আর একদিনে সম্ভব নয়। নিজের প্রবৃত্তি আর সমাজ সংস্কৃতির পূজারী 'আমার' সাথে শুরু হলো এক আল্লাহর পূজারী 'আমার' যুদ্ধ। শুরু হলো চেষ্টা। মুসলিম হওয়ার চেষ্টা। আত্মসমর্পণের চেষ্টা। আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণের চেষ্টা। পশুত্বেরও নীচু স্তর থেকে উঠে দুনিয়াভর্তি মানুষের মাঝে সবচেয়ে অসাধারণ মানুষ হওয়ার চেষ্টা। আমার অতীতের অজস্র কালো মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশ আমাকে বার বার হোঁচট খাওয়ায়, পথ দেখতে দেয় না। কত শতবার উল্টে পড়ে যাই। জামা ছিড়ে যায়, হাড় ভেঙে যায়, রক্তাক্ত হই কষ্টে। আবার উঠি, আবার হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়া। ভয়ংকর, ভয়ংকর সব তীব্র ব্যাথায় খালি চোখ দুটো লোনা হয়ে গাল ভাসিয়ে দেয়। তবুও আশার বাণী আমাকে আলো দেখায়। সেই আলোয় ভর করেই আমি উঠে বসি, চোখ মুছে শক্ত পায়ে দাঁড়াই। না থামার দৃঢ় প্রত্যয়ে আবারও পা বাড়াই সামনে। চলতে থাকি।

জানেন? জান্নাতের বাগিচায় আর কলকল করে বয়ে যাওয়া টলটলে জলে আমার এই ক্ষতবিক্ষত পা দুটোকে ভেজাবো বলে আজও স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি, আপনার সাথে জান্নাতের বাগানে পাশাপাশি শুয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে একটানা নীল আকাশ দেখবো। ওই বাগান আর ঝর্ণার পানি আমি একবার ছুঁয়ে দিতে পারবো কি না, জানি না। জানি না, এই পথের শেষ সীমানায় আমি কি পৌঁছাতে পারবো, পুরস্কারের যোগ্য কি কোনোদিন হবো, না অন্ধকার কোনো ফাটলে আটকে সুতীব্র যন্ত্রণার চিৎকারেই আমার শেষ পরিণতি? আমি জানি না। জানি শুধু হাঁটতে হবে এই পথেই। সামনেই হেঁটে যেতে হবে।

আলোর রেখা ধরে।

আপনারে খুঁজিয়া বেড়াই

আরমান ইবন সোলাইমান, এসিসিএ, ইসলামিক ফাইন্যান্স, ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি

যেভাবে শুরু

সাল ২০১১-২০১২। ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে তখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অভিকর্ষ বলকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে উঁচু হয়ে থাকা আমার শার্টের কলার আর এলোমেলো বড় বড় চুলগুলো ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয় অনেকটা চিৎকার করে। মোটামুটি দেশের প্রথম সারির একজন নাটক-ডিরেক্টরের সহকারী হিসেবে কাজ করি। সেই সাথে শখের গান-বাজনা। নিজের তৈরি ব্যান্ড—অল্টারনেটিভ রকটা তখন ভালোই খায় লোকে। যুগের ভাষায়—'ডিজুস ছেলে'।

ডিজুসের স্লোগান মোতাবেক জীবনের সব সুখ খুঁজে যাচ্ছি এখানে-ওখানে। ধর্ম ব্যাপারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম কেবলমাত্র ফর্ম ফিলাপ আর জুমআ-ঈদের নামাজে হাজিরা দিয়ে মুসলিমের খাতায় টেনেটুনে নিজের নাম রাখার মাধ্যমে।

সেসময় প্রায়ই রাতজেগে আড্ডা হতো কোনো কোনো বন্ধুর বাসায়। রাতভর আড্ডা, গান-বাজনা, উচ্চমার্গীয় আলাপ-আলোচনা, দর্শন, ধর্ম কোনোকিছুই তেমন বাদ পড়ত না আড্ডাতে। এমনই একরাতের আড্ডায় এক বন্ধু তার বাসার নিচ তলার ছেলেকে নিয়ে এলো। দাঁড়ি-পাঞ্জাবির হুজুর টাইপ এক ছেলে। তার উপস্থিতি পরিবেশটাকে কিছুটা অন্যরকম ভারিক্কি করে তুলল। সারাক্ষণের আজেবাজে আলোচনায় কিছুটা যেন ছেদ পড়ল আমাদের।

কীভাবে কীভাবে যেন কথার লতা জড়াতে জড়াতে কবরের আজাব, জান্নাত-জাহান্নাম,

Scanned with CamScanner

অদেখা বিষায়দি এজাতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সেদিনকার গভীর রাতের নিস্তব্ধতা আর পনেরো তলা বিল্ডিংটার আলো-আঁধারির পরিবেশ আমাকে কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো করে ফেলতে লাগল। প্রচণ্ড অসহায়ত্ব ঘিরে ধরতে লাগল আমায়। একেকটা শব্দ, একেকটা হাদিসের বর্ণনা স্বীয় ক্ষুদ্রতা, আর নিজ অসহায়ত্বের কথাগুলো বার বার চিৎকার করতে লাগল আমার মাথার ভেতরে।

এই ঘটনার প্রায় মাস ছয়েক আগে এক আইরিশ মেয়ে আমাকে আমার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। দীর্ঘ সময়ের আমতা আমতা, দাঁত দিয়ে নখ খোঁটা আর মাথা চুলকানো ছাড়া নিজ ধর্ম সম্পর্কে আমি সেদিন যা বলেছিলাম—তা মনে পড়লেই আমি তীব্র অস্বস্তিবোধ করতাম। বলা যায়—সেটাই ছিল আমার ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী হবার মূল বীজ।

মুসলিম হয়ে জন্ম নিলাম, কেউ জিজ্ঞেস করলে নির্দ্বিধায়—'আমি মুসলিম' বলেও দিচ্ছি। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে বেসিক প্রশ্ন করলে আমি দুই মিনিট নিজের মনগড়া কথা ব্যতীত একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারি না। একটা জিনিস সম্পর্কে কিছুই না জেনে সেটাকে নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছি? নিজ অজ্ঞানতার অপমানের ধাক্কাটা সেদিন আবারও মনে পড়ে গেল সেদিনকার আড্ডায়।

প্রায় সাথে সাথেই বন্ধুর কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানার এবং আমার মাঝে তৈরি হওয়া সংশয়গুলো দূর করবার জন্য সাহায্য চাইলাম। আমার মেমোরি কার্ডটাতে তৎক্ষণাৎ ভরে দেওয়া হলো মোটামুটি ডজনখানেক ইসলামি লেকচার আর ভিডিও।

পরের জুমআয় আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো আল-আমিন জামে মসজিদে। জীবনে প্রথম বাংলায় খুতবা শুনলাম। খুতবার বিষয়—সালাত। ভরাট গলায় শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের কিছু কথা সেদিন দাগ কেটেছিল গভীরভাবে—"দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে, যুদ্ধে থাকলে দৌড়ে; যখন যেভাবে থাকবেন সালাত আপনাকে পড়তেই হবে। পড়বেন না মানে? আপনি পড়তে বাধ্য। আপনি কাকে খুশি করতে চাচ্ছেন?"

শব্দগুলো কেমন যেন আমার ভেতরটাকে তছনছ করে দিল। জীবনে প্রথম নিজ ভাষায় জুমুআর খুতবা শুনলাম। আমার তখন দিশেহারা অবস্থা। সালাত ব্যাপারটা এত গুরুত্ব? এটা ছাড়া মুসলিমই থাকা যাবে কি না, সেই প্রশ্নের সম্মুখীন? জীবনের গত তেইশটা বছর করলাম কী? এখনই বা কী হবে? কীভাবে কী করবো কিছুই

Scanned with CamScanner

তো বুঝতে পারছি না। আমার অবস্থা তখন পথ ভুলে বিশাল সমুদ্রে পড়ে যাওয়া মাছের মতো। এদিক ওদিক খাবি খাই, কী দিয়ে কী করবো, কোনটা মানবো, কোনটা ছাড়বো—কিছুই বুঝি না। নানান জাতের, নানান রঙের হুজুর চারপাশে। কেউ বলে এটাই ইসলামের সঠিক পথ, কেউ বলে ওটা। ফিকহশাস্ত্র তো অনেক পরের কথা। আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামের খুঁটি, ভিত্তি এসব নিয়েই বিরাট সংশয়ের মাঝে পড়ে গেলাম। এর মাঝে গোদের উপর বিষফোঁড়—হুজুরদের মধ্যেই কাদা ছোঁড়াছুড়ি।

আবারও শরণাপন্ন হলাম আমার সেই বন্ধুর। আমাকে ডা. জাকির নায়েকসহ আরও কিছু আলিমদের লেকচার দেওয়া হলো। সেই সাথে ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটির লিঙ্ক। অনলাইনে এত সুন্দর কোর্স হুজুররা চালাচ্ছে দেখে খানিকটা হোঁচট খেলাম। আমার মস্তিষ্কে এর আগ পর্যন্ত প্রোগ্রাম করা ছিল, হুজুর মানেই জাফর ইকবালদের সংজ্ঞানুযায়ী, পান খেয়ে লাল লাল দাঁত বের করে ছেলেপেলেদের পেটানো কিছু নিম্ন শ্রেণির অশিক্ষিত মানুষ।

ডা. জাকির নায়েকের কথায় অনুপ্রাণিত হতে থাকলাম খুব। হালকা পাতলা গড়নের এই লোকটার কাছ থেকে কালিমার সুন্দর একটা সংজ্ঞা শিখলাম—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেখানোর আগে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের 'লা ইলাহা' অর্থাৎ 'কোনো ইশ্বর নেই' শিখিয়েছেন। এরপরের বাক্যে গিয়ে তিনি (সুবহানাহু তাআলা) আমাদের শিখেয়েছেন 'ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত'। প্রথমেই সবকিছু অস্বীকার করে আমাদের সাফ সুতরো করে, গ্লাসের বিষাক্ত তরল খালি করে এরপর তাতে ঢেলে দিয়েছেন সুপেয় পানীয়। মজা লাগল ব্যাখ্যাগুলো। বাহ! আরবি ভাষার গঠনগুলো এত মজার? রোমাঞ্চিত হলাম ভীষণরকম।

একের পর এক স্মার্ট সব প্রশ্নোত্তর আর অদ্ভুত সুন্দর সব ব্যাখ্যা দিয়ে বড় বড় তালেবর সংশয়বাদীদের সাথে ডা. জাকিরের সেইসব ডিবেট হয়ে দাঁড়াল আমার বিনোদনের একমাত্র মাধ্যম। যে আমার প্রতিদিন অন্তত দুটো সিনেমা না দেখলে পেটের ভাত শক্ত হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে যেত, সেই আমার সারাদিন ইউটিউব আর ইসলামিক টেলিভিশন খুলে ইসলামি লেকচার শোনাটাই একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেল।

সমস্যা দেখা দিল অন্যখানে। যে চাকরিটা তখন আমি করি—সেটা সরাসরি হারামের সাথে সম্পর্কিত। কাজটা ছেড়ে দেওয়াও প্রায় অসম্ভব আমার কাছে। সেই ছোটবেলা

Scanned with CamScanner

থেকে মনের গহীনে খুব যত্ন করে লালন করা স্বপ্নটা বাস্তবায়নের ঠিক দাঁরপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি। এই কাজটা ছাড়ি কী করে? একদিকে সেলিব্রেটিজম, অর্থ-বিত্ত, চাকচিক্য পাবার হাতছানি। আর অন্যদিকে মনের ভেতর সর্বদা একটা পাপবোধ, অপরাধী-অপরাধী ভাব নিয়ে চোরের মতো চলাফেরা। সহ্য হচ্ছিল না কিছুতেই।

অলৌকিক, নাকি অন্যকিছু

ভয়াবহ একটা বিপদে জড়িয়ে পড়লাম অসম্ভব রকমের ফালতু একটা বিষয় নিয়ে। একে কেবল বিপদ বললে মাঝারি মানের অপমান এবং অপরাধ করা হবে, একে বলতে হবে—'মহাবিপদ'।

তখন নতুন নতুন সালাত ধরেছি। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সারাদিন কান্নাকাটি, তওবা যা যা আমার জ্ঞানের মাঝে ছিল সব করলাম। আমার দোয়া কবুল হলো। কীভাবে কীভাবে যেন অতি জটিল বিপদটা অদ্ভুত নীরবতায়, খুব সহজে কেটে গেল।

বিপদটা কাটার ঠিক পরদিন অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল আমার সাথে। আলাদা আলাদা তিনটা মসজিদে তিন ওয়াক্তের নামাজ পড়লাম। আশ্বর্যজনকভাবে তিনটি মসজিদেই একই সুরা তিলাওয়াত করা হলো। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি সুরা। তবু কী করে যেন সুরাটির একটা শব্দ আমার মাথার ভেতর ঢুকে গেল। অনেকটা কোনো গানের শব্দ বা টিউন আমাদের মাথায় যেভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ঢুকে গিয়ে সারাদিন কুটকুট করে কামড়াতে থাকে, সেভাবে।

শব্দটা ছিল—'আলাম নাশরাহ'।

ব্যস্ত দিন শেষে রাতে বাসায় ফিরলাম। ঝিম ধরে বিছানায় শান্তি শান্তি একটা ভাব নিয়ে চুপচাপ বসে আছি। ঠিক যেভাবে তীব্র ঝড়ের শেষে চারদিকে একটা প্রশান্তি ভাব দেখা যায়—সেরকম। ঝিম ধরা মাথায় তখনও রেকর্ড বাজছে—'আলাম নাশরাহ'।

টেবলের দিকে চোখ ফেরালাম—ধুলো পড়া একটা বাংলা কুরআন অবহেলায় পড়ে আছে বহুদিন ধরে। আমার মতো নিম্নশ্রেণির মানুষ সেসময় নিজ পয়সা খরচ করে কুরআন কিনবে, এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। বাবাকে কেউ একজন উপহার দিয়েছিলেন কুরআনটা। আমার টেবলে কীভাবে যেন সেটা চলে এসেছে। ধুলো ঝেড়ে পাতা উল্টালাম। মাথায় রেকর্ড বাজছে—'আলাম নাশারাহ'।

Scanned with CamScanner

এত বড় কুরআনের হার্ডকপি থেকে কেবল একটা শব্দ খুঁজে বের করা অসম্ভব জেনেও অবহেলায় পাতা উল্টালাম। আল্লাহর কসম করে বলতে পারি সেদিনকার মতো এত সহজে খুব কমই কোনো বইয়ে পৃষ্ঠার নাম্বার জানা থাকা সত্ত্বেও কোনো শব্দ আমি খুঁজে পেয়েছি। বিস্মিত আমি চোয়াল ঝুলিয়ে অনুবাদটুকু পড়ে শেষ করলাম—

১. আমি কি তোমার বুককে তোমার কল্যাণের জন্য প্রসারিত করে দিইনি?
২. আমি লাঘব করেছি তোমার বোঝা।
৩. যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় দুঃসহ।
৪. এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।
৫. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে।
৬. অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
৭. অতএব, তুমি যখনই অবসর পাও একান্তে ইবাদত করো
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করো।

ওয়াল্লাহি, পুরো শরীরটা সেদিন বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছিল আমার। ঝাপসা চোখটা নোনা করে তুলছিল আমার চিবুক। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আয়াত যেন আমার উদ্দেশ্যে। যেন কেউ একজন আমার দিকে আঙুল তুলে বলছেন—তুমি বিপদে ছিলে, আমি তোমাকে উদ্ধার করেছি, তোমার সম্মান রেখেছি, আমার দিকে মনোযোগী হও। ইবাদত করো। মনে হলো, মহান আল্লাহ তাআলা পরম মমতার সাথে আমাকে বোঝাচ্ছেন, শেখাচ্ছেন।

এই একজীবনে আমি বহু বার, বহু ভাবে বিপদে পড়েছি। ভয়, দুশ্চিন্তা আর হতাশার একেকটা রাত পার করেছি ভয়ংকর একাকিত্বে। কিন্তু এরপর থেকে সবসময়ই মাথায় চলে এসেছে—আরেহ! এই মহাবিশ্ব আর এর ভেতরকার সবকিছুর মালিক, এমন আমার উপর আসা এই বিপদটারও মালিক যখন বলেছেন—"কষ্টের পরেই স্বস্তি"—তখন এত অস্থির কেন হচ্ছি? এত ভয় পাচ্ছি কেন? কীসের অস্থিরতা? কীসের কষ্ট? ধুর! এই একজীবন আফসোস আর হতাশায় সময় নষ্ট করার জন্য অতি ক্ষুদ্র। আমাদের রবের প্রতি আস্থা রেখে মাথাটা একটু তাঁর দিকে নোয়াতে জানলে জীবনটা অবশ্যই অবশ্যই নিশ্চিন্তে, নির্ভাবনায় কাটবে, ইনশাআল্লাহ।

Scanned with CamScanner

ইসলাম থেকে আমাদের দূরে যাবার কারণ

সেদিন ফেইসবুক স্ক্রল করতে করতে একটা স্ট্যাটাসে চোখ আটকে গেল। যুগ আর উইমেন চ্যাপ্টারীয় ভাষায় প্রতিবাদী, সাহসী, দৃপ্ত, আধুনিকা এক নারীর স্ট্যাটাস। বেশ কটমটে ইংরেজি ভাষায় জাতির উদ্দেশ্য তিনি যেটা জানান দিয়েছেন তা সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায়—

"মুসলিম ঘরে জন্মে আমরা মুসলিম হয়েছি, হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়ে হিন্দু হয়েছি। এ নিয়ে হম্বিতম্বি করার মতো কিছু নেই। নিজে কিছু একটা যেদিন অর্জন করতে পারবো সেদিনই যাতে আমরা মাতামাতি করি।"

সাদা চোখে দেখতে গেলে অতি সরল, নিরীহ প্রজাতির একটি প্রশ্ন।

ভাবলাম—আরিব্বাস! আসলেই তো! আব্দুর রহমান সাহেবের ঘরে জন্ম নিয়েছি বলেই তো আজ আমি লোকমান আলী। ভগবান রায়ের ঘরে জন্মালে হয়তো 'লাক্ষমান বালী' টাইপ কিছু একটা হতাম। সংশয়পূর্ণ কথাবার্তাগুলোর একটা আরাম হচ্ছে, সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি-পাপ-পঙ্কিলতাগুলো হাত-পা ঝাড়া দিয়ে স্রষ্টার দিকে আঙুল তাক করা যায়। যেহেতু আল্লাহই আমাকে ভগবান রায়ের ঘরে জন্ম দিয়েছেন সেহেতু আজ আমি লক্ষণ কুমার। সকল দোষ আল্লাহর। আমার আর দোষ কী?

এই যেহেতু আর সেহেতু টাইপ কাটাকুটি খেলাগুলোর ফাঁক গলে যেটা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তা হলো—মানুষ তার একজীবনের প্রায় পুরোটা একাডেমিক পড়াশোনা, অর্থ সম্পদের দৌড় আর বিনোদন নামক ডাংগুলি খেলায় কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তার জীবনের উদ্দেশ্য-বিধেয় কী, বা এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ কেনই বা জন্মাচ্ছে আবার কেনই বা মরে, পঁচে-গলে গায়েব হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে ভাববার ফুরসত নেই।

অমুকে বলেছে তমুক আছে ইসলামে আর তমুকে বলেছে অমুক আছে ইসলামে জাতীয় জ্ঞানকে সর্বস্ব করে একটা প্রজন্ম বেড়ে উঠছে। একটা ক্যামেরা কিনলে সেটা চালানোর কলা-কৌশল রপ্ত করতে মানুষ ক্যাটালগ, ব্লগ আর ইন্টারনেট ঘেটে মাথার ঘাম গলায় নামাতে পারে। পারে না কেবল নিজ জীবনটাকে কীভাবে, কোন আদর্শে চালাবে, সেটা খুঁজে দেখতে। পৈতৃকসূত্রে পাওয়া ধর্মটা যে কেবল জন্মগত কোনো অধিকার নয়; বরং পড়ে-জেনে-শুনে-বুঝে তবেই এটা লাভ করতে হয়। ঠিক ভার্সিটিতে চান্স পাবার মতো করে—সেটা কে বোঝাবে এই প্রজন্মের

তথাকথিত জন্মগত মুসলিমদের?

আল্লাহ তাআলা মানুষকে কেবল ভগবান রায়দের ঘরে জন্ম দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি। তিনি তাকে বিবেক-বুদ্ধি-জ্ঞান সব দিয়েছেন যাতে করে সে দেখতে পায়, শুনতে পায়, বুঝতে পায়। তার সাথে দিয়েছেন—'কুরআন'। আর তা আমাদের হাতে-কলমে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা প্রথমেই নাজিল করলেন—'ইকরা' অর্থাৎ, পড়ো। আল্লাহ তাআলা ভালো কাজ করতে, সিজদা করতে অথবা তাঁর ইবাদত করতে বলেননি শুরুতেই। বলেছেন আমাদের 'পড়তে'। এই ছোট্ট একটি শব্দ দিয়েই আল্লাহ তাআলা দাগ টেনে দিয়েছেন—যে আপনাকে অর্জন করতে হবে ইসলাম জেনে-বুঝে। এটা জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো লুঙ্গি টাইপ কিছু একটা ভেবেছেন তো সর্বনাশ করেছেন।

মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েই যদি কেউ মুসলিম হতে পারত তবে এদেশের হুমায়ুন আজাদ কিংবা বিজ্ঞানমনস্কদের রোল মডেল কৃষক আরজ আলী মাতুব্বরেরা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়ে নাস্তিক হতে পারতেন না। দুনিয়াজুড়ে লাখ লাখ মানুষ ধর্মান্তরিতও হতো না। যারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হচ্ছেন তারা অবশ্যই কিছু একটা জেনে-বুঝে-অর্জনের মাধ্যমেই মুসলিম হচ্ছেন।

আজকের মুসলিম জাতির দুরবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর একটি মূল কারণ হচ্ছে না পড়ার প্রতি, জানার প্রতি তীব্র অনীহা। আমরা বেশিরভাগই ইসলাম শিখি শুনে। পড়ে নয়।

একজন মুসলিমের প্রথম কাজ হচ্ছে কুরআন পড়া। যেই বইয়ে আল্লাহর সুবহানাহু তাআলা নিজের কথা লেখা আছে, যেই বই পড়তে তিনি নিজে বার বার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই বই না পড়ে একজন মানুষ কীভাবে তাঁর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে? তাঁকে জানার কথা দাবি করতে পারে? কুরআন এসেছিল আমাদের পড়ার জন্য, জানার জন্য। আলমারির উপরে তুলে রেখে সংশয়বাদীদের অতি দুর্বল সব যুক্তিকে আহত হয়ে নেতিয়ে পড়বার জন্য নয়।

ভগবান রায়ের ঘরে জন্ম হয়েছেন বলে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলাকে দোষ দেওয়ার দরজাটাও তাই বন্ধ। মানুষ তাঁর জীবনে কখনো না কখনো কোনোভাবে ইসলামের

Scanned with CamScanner

দাওয়াত পাবেই। তার কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাবেই, যেভাবে সূর্যের আলো পৃথিবীপৃষ্ঠের শত বাঁধা ভেদ করেও মাটিতে নামে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা স্পষ্টতই কুরআনে বলে দিয়েছেন—

'...এমন কোনো জাতি নেই, যার মধ্যে সতর্ককারী আসেনি।[১]'

আমাদের সতর্ক করবার জন্য, তাঁর অস্তিত্ব জানানোর জন্য লক্ষ-কোটি নিদর্শন আর কারণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে। পার্থক্যটা কেবল দেখতে পারার, দেখতে জানার।

উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে আমি কিছু দেখিনি বলে আমার বিপদ হবে না ভাবার মতো আরাম মানবজীবনে নেই। মানুষের মতো এত জটিল এবং অসাধারণ একটি প্রাণীর জন্ম অবশ্যই অকারণ নয়। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবশ্যই অবশ্যই এর রয়েছে।

আপনারে খুঁজিয়া বেড়াই

জীবনের কতগুলো ভাত ভাত দুপুর আর ঘুম ঘুম সকাল কেটে গেল পরম অবহেলায়। আরও কত যাবে। যেতে যেতে একটা দিন সময়ের বাক্সটাও ফুরিয়ে যাবে দুম করে। অফিসের চেয়ারটায় ছটফট করতে থাকা এই আমি তো সেদিনও দুর্দান্ত গতিতে খেলার মাঠে দৌড়াতাম। দু-টাকার আইস্ক্রিম আর তিন গোয়েন্দায় মুখ ডুবিয়ে জীবনের সমস্ত সুখ খুঁজে পেতাম। পেছনে ফিরে তাকালে এখন কেমন যেন আনমনে চমকে উঠি। এতগুলো দিন চলে গেল? সময়গুলো সব গেল কোথায়? টেরও পেলাম না। দেশীয় গড় আয়ুর পরিসংখ্যানটা নিয়ে হিসেব কষতে বসলেও তো প্রায় জীবনের অর্ধেকটাই গুটিয়ে এনেছি। এত শংকা, ঘৃণা, আর তুলনামূলক পাওয়া-না পাওয়ার হিসেব করতে করতে এরকম বেখায়েলে বাকি জীবনটাও ফুরিয়ে যাবে জানি। নিজেকে কি আসলেই খুঁজে পেয়েছি, না খেলার মাঠে দুর্দান্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে এই খেলার মাঠটাকেই নিজ ঘরবাড়ি ভেবে নিয়েছি?

১ সূরা ফাতির, আয়াত : ২৪

Scanned with CamScanner

নিজেকে খুঁজতে হয় নিজ সৃষ্টির রহস্যের মাঝে, উদ্দেশ্যের কারণে। সফলতা কাড়ি কাড়ি টাকার বস্তা, কিংবা মিথ্যা সাময়িক আনন্দবিলাসের মাঝে নেই। বিশ্বাস করুন, সত্যিই নেই। সফলতা ঠিক এইখানে, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাবার মাঝখানে। নিজের সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা খুঁজে পেয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রশান্তি লাভের সামনে জগতের আর সব স-অব অর্জন অতি তুচ্ছ।

খুঁজে দেখুন, ডেকে দেখুন—পরম করুণাময় আমাদের হতাশ করবেন না, ইনশাল্লাহ; তিনিই কথা দিয়েছেন—

'আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাকেই সাড়া দিই, যখনই সে ডাকে। তাহলে তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দিতে চেষ্টা করে, আমার উপর বিশ্বাস রাখে, যেন তারা সঠিক পথে চলতে পারে।[১]'

আমার নাম সেলিনা। খেলতে আমি জানি না

একটা সময় নিজেকে বিশাল-বিরাটাকার কিছু একটা ভাবতে সে ভালোবাসে। কখনো কখনো তার এই বিশালতার অহংকার তাকে ভুলে যেতে বাধ্য করে নীরব-নিভৃতে যে শেকড় তার জন্মলগ্ন থেকে আজকের তার এই বিশালতার সাথি হয়েছে তাকে আদতে দেখা না গেলেও এই শেকড়টা ছাড়া সে মূল্যহীন। স্রেফ পুড়িয়ে ফেলা খড়িকাঠ কেবল।

যে ছেলেটা নতুন নতুন শহরে এসে 'আসসালামু আলাইকুম'-কে 'চালামালাইকুম' বলত সে ছেলেটা যখন বছরখানেক শহুরে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে 'ইয়ো ব্রো' বলতে চায় তখন কাক-ময়ুরের গল্পটাই সবার মাথায় আসবে এটাই স্বাভাবিক। ওভার স্মার্টনেস কখনোই কোনো কাজের কথা নয়। জীবনের সবক্ষেত্রে পরিমিতিবোধটা থাকা গুরুত্বপূর্ণ নয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

কলেজ জীবনে নতুন ঢাকায় আসা ছেলেগুলোকে নিয়ে বেশ মজা করতাম আমরা (এখন বুঝি কাজটা অতি ঘৃণিত অপরাধের পর্যায়ে পরে)। আসলে কারণটা এমন

১ আল-বাকারাহ : ১৮৬

Scanned with CamScanner

ছিল না যে তারা ঢাকায় নতুন তাই মজা নেওয়া হচ্ছে। বরং তাকেই রাগিংয়ের শিকার হতে হতো যে, ঢাকা এসেই নিজের জসিম নামটাকে জাস-সিম বলে সবার কাছে পরিচয় দিত (সত্য ঘটনা অবলম্বনে)।

সরলতার একটা সৌন্দর্য আছে। এর একটা মমতাময় একটা ছায়া আছে। নিজেকে স্মার্ট বানাতে স্রেফ শরীরটাতে লুঙ্গি-ফতুয়ার বদলে সুট-বুট চড়ালেই হয় না, মনের মাঝেও সুট-বুট চড়ানোর প্রয়োজন আছে। আমি আজ সো কলড স্মার্ট (নিজ চোখে) বলে বাকিদের চোখ সরু করে ইউ ব্লাডি বিলেজ পিপুল বলে কটাক্ষ করলে নিজেরই সম্মান যাবে। শেকড় ধরে লোকে তখন যদি টানাটানি করে, ইজ্জত বাঁচাতে শেষ-মেশ স্যুট তো বহু দূর কী বাত, লুঙ্গীটাও থাকবে না, দাদা!

Scanned with CamScanner

পথ ও পথিক

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক, অন্ধকার থেকে আলোতে

'হুজুর' কথাটা বললেই সমাজের অনেকেরই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা হতদরিদ্র চেহারা, যাকে প্রয়োজন হয় শুধু মানুষ মারা গেলে। কেউ মারা গেলে তিনি মিলাদ পড়িয়ে দেবেন।[১] আর দোয়া করবেন। কেউ নিয়মিত জুমুআর জন্য সপ্তাহে একদিন মসজিদে গেলেই অধিকাংশ মানুষের কাছে সে 'ধার্মিক' বলে পরিগণিত হয়।[২] দাঁড়ি রাখে শুধু 'হুজুর'রা, মেয়েদের হিজাব করলে সওয়াব হয় (আর না করলেও সমস্যা নেই)।[৩] কেউ যদি জেনে বুঝে ইসলাম প্রাকটিস শুরু করে, তাহলে তাকে বলা হয় সে 'হুজুর' হয়ে গেছে। ইসলাম সম্পর্কে এমনই বিকৃত বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে আমাদের দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর মাঝে। পারিবারিক শিক্ষার কারণে এমন বিকৃত ধারণা আমার কখনোই ছিল না আলহামদুলিল্লাহ, তবে ইসলামকে জেনে-বুঝে মানা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের প্রয়োগ ঘটানোর গুরুত্ব বুঝতে বেশ সময় লেগে গিয়েছে। ছোটবেলায় স্কুলে আমার প্রিয় বিষয় ছিল "ইসলাম শিক্ষা'। সহপাঠীরা যখন জিজ্ঞেস করত, বড় হয়ে কী হব, আমি কিছুটা ভেবে বলতাম : "মুসলিম মিশনারী[৪] হবো"। অবশ্য তখন কোনোরূপ ধারণা ছিল

---

১ এটি ইসলামের কোন বিধান নয়; সমাজে প্রচলিত একটি 'বিদআত'।

২ নিয়মিত সলাত (নামাজ) আদায় না করা হলে ঈমান থাকবে না। হাদিসে বলা হয়েছে "সলাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী"; দেখুনঃ সুনান তিরমিজি ২৬১৯-২৬২৩ নং হাদিস।

৩ ইসলামী বিধান অনুযায়ী ছেলেদের জন্য দাঁড়ি রাখা ও মেয়েদের হিজাব করা অপরিহার্য কাজের অন্তর্ভুক্ত

৪ অর্থাৎ মুসলিম দাঈ। 'মিশনারী' কথাটি সচরাচর মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। আসলে সেটি ছিল ছোটবেলার উক্তি।

Scanned with CamScanner

না—কীভাবে 'মিশনারী' হতে হয়। কেন এ ধরনের ইচ্ছা? এর কারণ লুকিয়ে ছিল একদম শৈশবে।

তখন আমার বয়স তিন কি চার বছর। আমাদের দুই ভাইয়ের আরবি ও কুরআন পড়া শিক্ষার জন্য একজন কুরআন শিক্ষক হুজুর ঠিক করে দেন আব্বু। তিনি প্রতিটা সুরা পড়ানোর আগে ওই সুরার উপর একটা দারস দিতেন। সেই দারসে মোটামুটি ওই সুরার শানে নুজুল কিংবা শিক্ষা উল্লেখ থাকত। সুরা আলি ইমরানের উপর তার দারসটা আজও কানে বাজে, যেটা আমার জীবনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। তিনি বলছিলেন—এই সুরায় ইসা আ.-এর নামে আল্লাহর এক নবির কথা আছে। তার জন্ম হয়েছিল অলৌকিক উপায়ে, তার কোনো বাবা ছিল না। অনেক মুজিজা[১] ছিল তার। তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারতেন, মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে ফুঁ দিলে সেটা জীবন্ত পাখি হয়ে যেত। তিনি অন্ধ আর কুষ্ঠ রোগীদের সারিয়ে দিতেন। তিনি সবাইকে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। ইসা আ. নামক এই মানুষটির কাহিনি এবং তার দাওয়াত আমার অসম্ভব ভালো লেগে গেল। হুজুর আরও বললেন—কেউ কেউ ইসা আ.-এর কথা মেনে নিল, খারাপ মানুষেরা তাকে বিশ্বাস করল না। তাকে মেরে ফেলতে চাইল। আল্লাহ সেই দুষ্টু লোকদের সফল হতে দিলেন না, তাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। বরং একটা দুষ্টু লোকের চেহারা ইসা আ.-এর মতো হয়ে গেল, সবাই তাকেই ইসা আ. ভেবে মেরে ফেলল।[২] দুষ্টু লোকগুলোর উপর আমার অনেক রাগ হতো শুনে! আরও জানলাম, ইসা আ. আসমানে চলে যাবার পর তার অনুসারীদের একটা দল তাকেই আল্লাহ বানিয়ে উপাসনা শুরু করে, তার বাবা ছিল না বলে তাকে আল্লাহর পুত্র বলা শুরু করে। তার এই পথভ্রান্ত অনুসারীদের বলা হয় খ্রিস্টান। অথচ ইসা আ. কখনো কাউকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করার কথা বলেননি। যারা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও উপাসনা করবে, আল্লাহ তাদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তি দেবেন। হুজুরের কাছ থেকে এমন অনেক কিছুই জানতাম। আমার শিশুমনে খ্রিস্টানদের কথা ভেবে খুব আফসোস হতো। ইশ, লোকগুলো তো একটুর জন্য বিপথগামী হয়ে গেল; কী দরকার ছিল ইসা আ.-কে আল্লাহ বানিয়ে উপাসনা করার? কীভাবে ওদেরকে জানিয়ে দেব সত্যটা? তখন ঠিক করলাম, বড় হয়ে

---

১ নবীদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা

২ তাফসির ইবন কাসির, সুরা আন নিসার ১৫৭ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টানদের বুঝিয়ে বলব, "*তোমরা ভুল করছ। ইসা আ. তোমাদের বলেননি তার উপাসনা করতে, বরং তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর উপাসনা করতে বলেছেন।*"

এভাবেই আমার ভেতরে দাওয়াত বা দাওয়াহ'র একটা আগ্রহ তৈরি করে দেন শৈশবের সেই কুরআনশিক্ষক। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর মর্যাদা উচ্চ করে দিন।

'দাওয়াত' শব্দটা বরাবরই আমার খুব প্রিয় একটি শব্দ। শব্দটা শুনলেই পোলাও-কোরমা খাওয়ার কথা মনে আসত! শৈশবে কুরআনশিক্ষক যখন বলতেন : রাসুলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের[১] ইসলামের দাওয়াত দিতেন, শুনে খুব ভালো লাগত। পরে অবশ্য ইসলামের দাওয়াত কী—এর মানে বুঝতে পারি। এর মানে হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। আমারও ইচ্ছা করত—মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করব। স্কুলে দেখতাম কিছু সহপাঠী হিন্দু ধর্মালম্বী। আমার তাদেরকে খুব দাওয়াত দিতে ইচ্ছা করত। খুব বলতে ইচ্ছা করত : "*আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করো না। এমনটা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেবেন*" - কিন্তু ওরা কী মনে করবে ভেবে—কাউকেই আর বলতে পারিনি। দায়ি হবার সুপ্ত ইচ্ছা মনের ভেতরেই রয়ে গেল। আরেকটু বড় হয়ে শুনতে পেলাম : খ্রিস্টান মিশনারীরা সারা পৃথিবীতে তাদের ধর্ম প্রচার করে। আফ্রিকার গহীন অরণ্য, আমাজন অববাহিকার দুর্গম এলাকা থেকে শুরু করে পৃথিবীর হেন জায়গা নেই যেখানে তারা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে না। খ্রিস্টান তো তারা, যারা ইসা আ.-এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁকেই উপাস্য প্রভু সাব্যস্ত করেছে, আল্লাহর সাথে শরিক করেছে। মনের কোণে ভাবনা চলে আসত : ইসলাম তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। খ্রিস্টানরা একটা ভুল ধর্মের জন্য এত কষ্ট করছে, আমরা আমাদের সত্য ধর্মের জন্য কী করছি? স্কুল জীবনের শেষ দিকে মরিস বুকাইলির 'বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' এবং 'মানুষের আদি উৎস' বই দু'টি পড়ে এ ব্যাপারে কিছুটা ভরসা পাই।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে জীবনকে নতুনভাবে দেখা শুরু করলাম। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবনা এলো। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন হচ্ছে এমন একটি সময়—যখন প্রত্যেকের ভেতরের 'আসল আমি'টা বের হয়ে আসে। সৎ সঙ্গ এবং কিছু অসাধারণ আলেম ও দায়ির প্রভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিফলন ঘটানোর গুরুত্ব উপলব্ধি হলো। পারিবারিক শিক্ষার কারণে বালেগ হবার পর

---

১ যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে; বহু ঈশ্বরবাদী, মূর্তিপুজারী

Scanned with CamScanner

থেকেই সালাত আদায় করতাম, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু সব সালাত মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে আদায় করা হতো না। অসাধারণ কিছু বড় ভাই এবং সমবয়সী দীনি ভাইয়ের সংস্পর্শে থেকে সকল সালাত মসজিদে পড়া শুরু করলাম। এক সময় কল্পনাও করতে পারিনি তরুণ বয়সে কীভাবে মানুষ দাঁড়ি রেখে, টাখনুর উপরে প্যান্ট পরে চলতে পারে। কিন্তু ক্রমে সেই জিনিসগুলো আমার নিজের জীবনের অনুষঙ্গে পরিণত হলো। ছোট বেলায় অনেকবারই কুরআন 'খতম' করেছি, তবে অর্থসহ পড়ার প্রবণতা ছিল কম। এক রমজান মাসে মূল আরবির সাথে সাথে সম্পূর্ণ কুরআনের অর্থও পড়ে ফেললাম। আল্লাহ আল কুরআনে বলে দিয়েছেন, জিন ও মানবজাতিকে তিনি শুধুমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১]এই আয়াতটি অনুধাবন করলে কারও আর নিজ জীবনের মূল করণীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। আল কুরআন উপলব্ধি করলে যে কেউ বুঝতে পারবে, ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সকল জায়গায় একমাত্র আল্লাহ তাআলার বিধানই অনুসরণযোগ্য। তা না করলে পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। দীনি ভাইদের সাথে 'রিয়াজুস সালিহিন' ও বিভিন্ন হাদিসের কিতাব পড়া শুরু করলাম। প্রখ্যাত দায়িদের লেকচার দেখা শুরু করলাম। পরিচিত হলাম কিংবদন্তি জাকির নায়েক (হাফিজাহুল্লাহ)-এর বই ও লেকচারগুলোর সাথে। আমাদের প্রজন্মের যারা তরুণ বয়সে ইসলাম প্রাকটিস করছে, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই আছে যারা জাকির নায়েকের দ্বারা প্রভাবিত নয়। উলামায়ে কিরামদের বই পড়ে ও লেকচার শুনে বুঝতে পারলাম সহিহ-শুদ্ধভাবে ইসলাম পালনের গুরুত্ব। আমাদের সমাজে অধিকাংশ মুসলিমই মূলত জন্মসূত্রে মুসলিম। সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত আছে বিভিন্ন সামাজিক কালচার এবং বিদআত।[২] মিলাদ, পীরপূজা, মাজারকন্দ্রিক শিরকি কার্যকলাপ এবং বহু নব উদ্ভাবিত কর্ম ও কুসংস্কার ইসলামের নামে প্রচলিত আছে। এটা আল্লাহ্‌র এক বিশাল অনুগ্রহ যে আমরা পিতা-মাতার মাধ্যমেই ইসলাম নামক অমূল্য রতনের সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দাওয়াত পাবার পরেও যদি কেউ সমাজে প্রচলিত বিদআতের অনুসরণ করে শুধুমাত্র এই অজুহাতে যে, "বাপ দাদারা তো এগুলোই পালন করে আসছে" তাহলে সেটা একটা বড় বিভ্রান্তির নামান্তর।

১ আল কুরআন, যারিয়াত ৫১ : ৫৬ দ্রষ্টব্য

২ ইসলামের নামে নব উদ্ভাবিত কর্ম যা সওয়াবের আশায় করা হয়

Scanned with CamScanner

এ ব্যাপারে ইবন আবিল ইজ্জ হানাফি রহ. {১৩৩১-১৩৯০খ্রি./৭৩১-৭৯২হি.}-এর কিছু বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক, "...কেউ যদি সত্যের প্রমাণ সন্ধান ছাড়াই অন্ধভাবে বাবা-মা'কে অনুসরণ করে এবং তার সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়া সত্যকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করছে। এথেকে সতর্ক করে আল্লাহ বলেছেন,

> "এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো, তখন তারা বলে : বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃপুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনোই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।[১]"

এই একই ব্যাপার মুসলিম পরিবারে জন্মানো অনেকের জন্যও সত্য। তারা বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে তাদের বাপ-দাদাদেরই অনুসরণ করে যায়। এগুলো যদি ভুলও হয় তবুও তারা সে ব্যাপারে সচেতন হয় না। এরা পরিবেশের দ্বারা মুসলিম, পছন্দের দ্বারা নয়। যখন এমন কাউকে কবরে জিজ্ঞেস করা হবে : "কে তোমার প্রভু?"

সে বলবে : *"হায়, আমি জানি না। আমি জানি না। আমি লোকজনকে কিছু জিনিস বলতে শুনতাম এবং আমিও তাই বলতাম।[২]"*

নতুন ইসলাম প্রাকটিস করা শুরু করলে অনেকের সামনে ইসলামের বহু রকমের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন মতবাদ চলে আসে। কোনটা সঠিক ব্যাখ্যা? কারা সঠিক পথে আছে? এমন প্রশ্ন দ্বারা আমিও আক্রান্ত হচ্ছিলাম, কিন্তু একজন দরদী আলিমের বই ও লেকচার দ্বারা বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাই। তিনি খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.। এই মানুষটির লেখনী ও বক্তব্যের দ্বারা শিখলাম যে, বিভক্তির মূল কারণ সুন্নাহ থেকে বিচ্যুতি। মুক্তির পথ হচ্ছে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ও নব উদ্ভাবন থেকে দূরে থাকা। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ রাজিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম যেভাবে দীন পালন করেছেন হুবহু সেভাবে দীন পালনের চেষ্টা করলে অধিকাংশ বিভক্তিরই আর অস্তিত্ব থাকে না।

---

১ সুরা বাকারাহ (২) : ১৭

২ *'শারহ আকিদা আত ত্বহাবী'* – ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী (র); পৃষ্ঠা ১৯০ (ইংরেজি অনুবাদ)

Scanned with CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার শুরু করেছি। ফেসবুকে বিভিন্ন ইসলামি পোস্ট দেওয়ার চেষ্টা করতাম। একদিন হঠাৎ এক বন্ধু মেসেজ দিয়ে বাংলাদেশের একজন কুখ্যাত নাস্তিকের লেখার লিঙ্ক দিল। জানাল, তার লেখা পড়ে নাকি তার সব বন্ধুরা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য লিঙ্কটায় ঢুকলাম। ঢুকে তো মাথায় রীতিমতো বাজ পড়ল—এসব কী লিখেছে লোকটা! প্রচলিত সব ধর্ম-বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে, সমালোচনা করে, নিন্দা করে, বিশেষত ইসলাম ধর্মকে অবমূল্যায়ন করে একের পর এক লেখা। আল্লাহ তাআলাকে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, ইসলামের পবিত্র বিষয়গুলোকে নিয়ে জঘন্য গালি, একই সাথে দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে ইসলামকে ভুল প্রমাণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় ভরা ছিল ব্লগের সেই লেখাগুলো। নাস্তিক ব্লগারদের কথা আগেও একটু-আধটু শুনেছি। কিন্তু অবস্থা যে এত ভয়াবহ তা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। প্রায় একই সময়ে ফেসবুকে নাস্তিকদের একটা স্পন্সর্ড আন্তর্জাতিক পেইজ চোখে পড়ে। আস্তে আস্তে ফেসবুক ও ব্লগে ইসলামবিরোধী নাস্তিক চক্রের সাথে পরিচিত হতে থাকি। তাদের দাবিগুলো, বিশেষত আল কুরআন নিয়ে তাদের অভিযোগগুলো খুটিয়ে দেখা শুরু করি। একদম নির্মোহ পর্যবেক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করলাম—এগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন অভিযোগ। শুরু হলো তাদেরকে জবাব দেওয়ার পর্ব, বিতর্ক। কিন্তু এই এই পর্ব যে খুব সুখপ্রদ ছিল তা বলা যাবে না। সুস্থ আলোচনা আর যুক্তির বিপরীতে তাদের পক্ষ থেকে জঘন্য ভাষা, গালি আর আল্লাহ ও রাসুল ﷺ -কে অপমান করার প্রবণতাই ছিল বেশি। যতই তাদের অপপ্রচার দেখতাম, ততই আমার জেদ বেড়ে যেত। তত বেশি দীন নিয়ে পড়াশোনা করতাম। তাদের এই অপপ্রচারগুলো আমাকে উল্টো আল্লাহ্‌র দীনের আরও কাছে নিয়ে আসতে লাগল। নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম কৌশলী।

নাস্তিকদের ফেসবুক পেইজগুলোতে দেখতাম খ্রিস্ট ধর্মালম্বীদের ব্যাপক আনাগোনা—যারা খুব মধুর ভাষায় নাস্তিকদেরকে তাদের ধর্মের দাওয়াত দিত। তাদের মধুর ভাষা দেখে মনে করলাম—এরা নিশ্চয়ই নাস্তিকদের তুলনায় কম উগ্র। কিন্তু বিদেশি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিতর্কের পেইজগুলোতে গিয়ে সেই ভুল ভাঙল। উগ্রতা ও ইসলামবিদ্বেষে তারা নাস্তিকদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়; বরং পড়াশোনা ও অনুসন্ধানের পর ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলাম—ইসলামের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের দাবিগুলো মূলত খ্রিস্টান মিশনারীদের গবেষণা থেকে নেওয়া। অর্থাৎ, ইসলামবিরোধীতার শেকড় যেন একসূত্রে গাঁথা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কিছু

Scanned with CamScanner

আগে থেকেই অন্য ধর্মগুলোকে নিয়ে ঘাটাঘাটির অভ্যাস ছিল। বিশেষত ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার আগেই ডাউনলোড করে ফেলেছিলাম বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির অনুবাদ। অন্য ধর্মগুলোর ব্যাপারে পড়াশোনা করে ও ইসলামের সাথে সেগুলোর তুলনা করে বহু আগেই উপলব্ধি হয়েছে যে—ইসলাম অন্য সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কাজেই তাদের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। ইসলামবিরোধীদের ব্যাপারে অনলাইনে আমার আর্গুমেন্টগুলো এবং নিজস্ব গবেষণাগুলো নোট করে রাখার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। দিন রাত তাদের অভিযোগগুলোর জবাব নিয়ে গবেষণা করতাম, লিখতাম। এ অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে পরবর্তী সময়ে সাহায্য করেছে বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারী অর্গানাইজেশনে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে, তাদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে। পূর্বযুগের মুসলিমগণ যখন আরবের ছোট্ট ভূখণ্ড থেকে যখনই সলামের দীপশিখা হাতে নিয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। পৃথিবীর এক বিশাল ভূখণ্ডের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমার মতো ক্ষুদ্র ও নগণ্য ব্যক্তিকে ও আল্লাহ সাহায্য করেছেন। অনলাইনে একজন রোমানিয়ান ও একজন কেনিয়ান খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে কালিমা পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কতই না ভালো হতো যদি পূর্বযুগের মুসলিমদের মতো সেই সোনালি সুদিন ফিরে আসত, আমাদের সম্মানিত আলিমগণ যদি অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর দিকে আরেকটু মনোযোগী হতেন!

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

> 'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ কর্ম করে এবং বলে—'অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'?[১]

যা আলোকে দেখতে দেয় না তাই হচ্ছে অন্ধকার। অন্ধকার হচ্ছে অজ্ঞতা। আর সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা হচ্ছে নিজের স্রষ্টাকে চিনতে না পারা। আসমান ও জমিনের প্রভু মহান আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধাচরণ করা। যিনি আমাদেরকে আমাদের মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা বলা। অন্ধকারের পেঁচারা আলোকে সইতে পারে না। আঁধারের নোংরা জীবনই তাদের কাছে বেশি পছন্দের। শয়তান

১ আল কুরআন, সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৩

Scanned with CamScanner

তাদের সামনে কুফর ও শিরককে মোহনীয় করে তোলে। মহান আল্লাহ এদের ব্যাপারে বলেন—

'...আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত (মিথ্যা উপাস্য)। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।[১]'

মহান আল্লাহ এ আয়াতে নুর (النُّوْر) বা 'আলো' শব্দটি একবচনে ব্যবহার করেছেন। আর 'জুলুমাত' (الظُّلُمَات) বা অন্ধকার শব্দটির বহুবচন উল্লেখ করেছেন। কেন জানেন? কারণ, মিথ্যার অনেক পথ রয়েছে। আর প্রতিটা পথই বাতিল। নাস্তিকতা, সংশয়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ, হিন্দুবাদ—যে নামেই ডাকা হোক না কেন, প্রতিটা পথ কেবল অন্ধকারেই নিয়ে যাবে। সত্য থেকে দূরে সরে নিয়ে যাবে। আর নুর বা আলোর পথ? তা তো একটিই।[২]

তবে আলোর পথ বা সত্যটাকে চিনতে পারাই শেষ কথা না। অনেকেই সত্যটাকে চিনতে পারে। কিন্তু তার উপর ইমান আনতে পারে না। আবার ইমান আনলেও তার উপর অটল থাকতে পারে না। লক্ষ্য করেছেন আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের ব্যাপারে কী বলেছেন? শয়তান তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। আচ্ছা, যারা কাফির তারা তো এমনিতেই অন্ধকারে রয়েছে। তাহলে, কীভাবে তারা আলো থেকে অন্ধকারে যাবে? কুরআনের তাফসিরকারকেরা এর উত্তর দিয়েছেন। এ আয়াতে ইহুদি-খ্রিস্টানদের কথা বলা হয়েছে। যাদের কিতাবে বেশ ভালোমতোই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা উল্লেখ ছিল। তাই মুহাম্মাদ ﷺ-যে আসবেন, এ ব্যাপারে তারা ইমান এনেছিল। কিন্তু শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর তারা জেদ ও হঠকারিতাবশত ইমান থেকে ফিরে যায়। ঠিক যেন আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে যায়।[৩]

তাই আমাদেরকে স্রষ্টার দেখানো নুর বা আলোর পথের উপর ইমান আনতে হবে। তবে ইমান আনাই যথেষ্ট না। সে ইমানের উপর অটল থেকে ভালো ভালো

---

১ সূরা বাকারাহ ২ : ২৫৭

২ *তাফসির ইবন কাসির*, ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), সূরা বাকারাহর ২৫৭ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৩৫৬

৩ *তাফসিরে জালালাইন*, ১ম খণ্ড, সূরা বাকারাহর ২৫৭ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৫৪০

Scanned with CamScanner

কাজ করতে হবে। শয়তান আর তার অনুসারীরা তো আমাদের মনে সংশয়ের বীজ বপনের চেষ্টা করবেই। ওরা চাইবে, আমরাও যাতে ওদের মতো অন্ধকারে শামিল হই। নর্দমার জীবনকে বেছে নিই। কিন্তু আমাদের সন্দিহান হওয়া চলবে না। নিজ বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। তবেই মহান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। তিনিই আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবেন। এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন—

> যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।[১]

একজন মুসলিম হচ্ছে বাতির মতো। সে নিজে আলোকিত হবে, অন্যকেও আলোকিত করবার চেষ্টা করবে। যে সত্য ও সরল পথ আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে দেখিয়েছেন, এর উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করতে হবে। সর্বদা হতে হবে সত্যসন্ধানী। শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ বলেছেন–

"আল্লাহর পথ সুদীর্ঘ। আমরা সেখানে কচ্ছপের ন্যায় পরিভ্রমণ করছি। পথের শেষ সীমায় পৌঁছতে হবে এটা আমাদের লক্ষ্য নয়; বরং মৃত্যু অবধি পথের উপর টিকে থাকাই আমাদের লক্ষ্য।[২]"

আমরা মহান আল্লাহ্র কাছে চাই, তিনি যেন আমাদেরকে সরল পথকে চেনার আর সরল পথের ওপরেই মরার তৌফিক দেন, আমিন। নিশ্চয়ই হেদায়েত কেবল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই—

> "হে আমাদের প্রভু, সরল পথ প্রদর্শনের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই তো সব কিছুর দাতা।[৩]"

---

১ সুরা বাকারা ২:২৫৭

২ *'আল হুদা ওয়ান নুর'* সিরিজ; টেপ নং ৩২১

৩ সুরা আল-ইমরান ৩ : ৮

Scanned with CamScanner

সেই সময়ের উপাখ্যান

জাকারিয়া মাসুদ, লেখক, সংবিৎ

আমাদের এলাকায় একজন সন্ত্রাসী ছিলেন। বেশ বড় মাপের সন্ত্রাসী। যেমন ছিল তাঁর উচ্চতা, তেমন তাঁর শক্তি। একাই দশজনকে হারিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতা ছিল তাঁর। লোকজন তাঁর ভয়ে চেপে থাকত। কেউ তাঁর সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে সাহস পেত না। তিনি যা বলতেন, তা না করা পর্যন্ত দমে যেতেন না। এমন অপরাধ খুব কমই আছে, যা তিনি করেননি। এলাকার প্রভাবশালী নেতার প্রধান সহযোগী ছিলেন। তাই শত অপরাধও তাকে জেলখানায় আবদ্ধ রাখতে পারেনি। আমরা তাকে 'গুরু' বলে ডাকতাম। ডাকটা তিনিই চালু করেছিলেন। অবশ্যি তার একটা সুন্দর নামও আছে। কিন্তু সে নামটা আমি বলতে চাচ্ছি না।

আমি তখন হাই-স্কুলের ছাত্র। ক্লাস নাইনে পড়ি। প্রাইভেট পড়তে স্যারের বাসায় যাচ্ছি। খুব ভোরে। শীতকাল ছিল বিধায় লোকজনের আনাগোনা ছিল খুবই কম। কুয়াশার মধ্যে একা-একা হাঁটতে কিছুটা ভয় পাচ্ছিলাম। সে ভয়টা আরও বেড়ে গেল যখন সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পাজামা আর সাদা পাগড়ি মাথার কোনো যুবকের দিকে চোখ পড়ল।

ভাবলাম, হয়তো হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। চোখটা বন্ধ করে আবার তাকালাম। তাকিয়েই জবুথবু হয়ে গেলাম। যা দেখছি—সত্যি তো? আমি নিজেই নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। ইনি কি সেই 'গুরু'?

গুরু আমার কাছে এসে বললেন, 'আস-সালামু 'আলাইকুম।'

Scanned with CamScanner

বেশ ক-মাস পর তাঁর সাথে দেখা। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন? আর গুরুর একি দশা? তিনি হুজুর হলেন কবে? গায়ে আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? মনের মধ্যে এই চিন্তাগুলো দাগ কেটে যাচ্ছিল। আমি কিছু বললাম না। কিছু বলছি না দেখে তিনি আবারও সালাম দিলেন। আমি এবারও কিছু বললাম না। তিনি বললেন, 'কী রে, প্রাইভেটে যাচ্ছিস?'

আমি হ্যাঁ বা না, কিছুই বললাম না। চুপ করে রইলাম। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, যা তাহলে। পরে কথা হবে, ইনশাআল্লাহ।'

তিনি চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। দৃষ্টি তাঁর দিকে। মন থেকে কেবল একটাই প্রশ্ন আসছিল—ইনি কি সেই 'গুরু'?

প্রায় সপ্তাহখানিক পর আবার গুরুর সাথে দেখা। তাকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গেলাম। আমাকে বললেন, 'কেমন আছিস, ভাই?'

'ভালো।'

এতটুকু বলতেই তিনি আমার হাত ধরে নিজের দোকানে নিয়ে গেলেন। ছোট্ট একটি দোকান। কুরআন, আতর, টুপি, মিসওয়াক ইত্যাদির দোকান। আমাকে একটি টুপি হাদিয়া দিলেন। এরপর কিছুক্ষণ কথা বললেন। তার কথাগুলোর চেয়ে, তার চেহারার দিকে আমার মনোযোগ বেশি ছিল। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কীভাবে লোকটা এতটা বদলে গেল?

কথা শেষ হলে আমি চলে এলাম। কিন্তু গুরুর কথা বার বার মনের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। মাথার মধ্যে কেবল একটাই প্রশ্ন আসছিল—কীভাবে লোকটা এতটা বদলে গেল? একবার কোনো প্রশ্ন মনে গেঁথে গেলে, তা দূর করা দায়। বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে। আমারও তেমনটা হতে লাগল।

ক-দিন পর আবার গুরুর সাথে দেখা। অবশ্যি আমি তাকে দেখলেও, তিনি আমায় দেখতে পাননি। গুরু হোন্ডায় করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে তাঁর স্ত্রী। তার স্ত্রীকে দেখেও আমি অবাক! একেবারে কালো কাপড়ে সমস্ত দেহ আবৃত করা। সে ভাবীকে সাজগোজ ছাড়া কোনোদিন বাইরে যেতে দেখিনি, তিনিই কালো বোরখায় সারা শরীর আবৃত করে রেখেছেন?

Scanned with CamScanner

একদিন ফোনে দেখি গুরুর মিসকল। পরপর তিনটা মিসকল দিয়েছেন তিনি। আমি দ্রুত ব্যাক করলাম। গুরু জানালেন—সময় থাকলে যেন বিকেলে তার সাথে দেখা করি। আমি রাজি হয়ে গেলাম।

বিকেলে গুরুর সাথে দেখা হলো। আমাদের হাই-স্কুলের পাশে। বকুলতলায়। গুরু আর আমি, বিশাল এক বকুল গাছের নিচে বসে গেলাম। গুরু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেক তো হলো। আর কত? এভাবেই জীবন চালিয়ে দিবি?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আরও বললেন, 'আমাদের জীবন, আর গরু-ছাগলের জীবনের মধ্যে পার্থক্য আছে? নাই। কোনো পার্থক্য নাই। ওরাও খায়, আমরাও খাই। ওরাও চলাফেরা করে, আমরাও করি। ওরাও ঘুমায়, আমরাও ঘুমাই। তাহলে ওদের লাইফের সাথে আমাদের পার্থক্য কোথায়?'

গুরুর কথাগুলো আমার মনে ধাক্কা দিচ্ছিল। একধ্যানে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলাম। তিনি বোঝাচ্ছিলেন—'আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? আমরা কি গরু-ছাগলের মতো করে জীবন চালানোর জন্যেই দুনিয়ায় এসেছি? নাকি আমাদের অন্যকোনো দায়িত্ব আছে? আমরা কি জীবনের উদ্দেশ্যকে তালাশ করেছি কখনো? কখনো কি ভেবে দেখেছি—কেন আমাকে আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? কেন গরু-ছাগল না বানিয়ে মানুষ বানিয়েছেন?'

তাঁর কথা শেষ না হতেই মাগরিবের আজান হলো। তিনি আমাকে জোর করে ধরেই মসজিদে নিয়ে গেলেন। ওইদিনই মনে হয়, প্রথম মাগরিবের নামাজ জামাতে পড়েছিলাম।

গুরুর কথাগুলো মাঝে মাঝে চিন্তা করতাম। আমি কি সত্যিই গরু-ছাগলের মতো জীবনযাপন করছি? আমার কি সত্যিই কোনো উদ্দেশ্য নেই। এসব ভাবলেই মনে হতো—আমিও গুরুর মতো হয়ে যাবো। সব কিছু ছেড়ে দেবো। তা আর হয়ে ওঠেনি। আসলে জাহেলি জীবনের প্রতি খুব মায়া জন্মে গিয়েছিল। এতটাই মায়া যে, তা ছাড়তে আমার কষ্ট হচ্ছিল। আমার জীবনের সাথে তা মিশে গিয়েছিল। গান, বাদ্য-বাজনা, পশ্চিমা সংস্কৃতি, মুভি এগুলো ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। ঘুমুনোর আগে গান না শুনলে—আমার ঘুমই আসত না।

আমার এক ভাই মারা যাওয়ার পর—আমার জন্ম। তাই বাবা-মা একটু বেশিই আদর করতেন। না চাইতেই অনেককিছু এনে দিতেন। বাবা ছিলেন প্রবাসী। যখনই

Scanned with CamScanner

আসতেন, আমার জন্যে শতাধিক ডিস্ক সাথে করে আনতেন। এক বছরে আমি এগুলো দেখে দেখে—একেবারে মুখস্থ করে ফেলতাম। বছরখানেক পর আবার নতুন ডিস্ক আসত। দেশি পোশাক খুব কমই পরেছি। কাছের একজন আত্মীয় থাকতেন ইউকে-তে। প্রায় প্রতি মাসেই নতুন নতুন কাপড় পাঠাতেন। সাথে বাবার আনা কাপড় তো ছিলই।

আমি যখনই ভাবতাম, গুরুর মতো হবো, তখনই জাহেলি জীবন এসে দেয়াল হয়ে দাঁড়াত। আমাকে বাধা দিত। এক পা এগোলে, দু-পা পিছিয়ে যেতাম। হৃদয়ের ভালো অংশটুকু খারাপ অংশের সাথে প্রতিযোগিতা করত। শেষমেষ খারাপ অংশটুকুই বিজয়ী হতো। আর খারাপ বন্ধুদের অবদানের কথা নাহয় বাদই দিলাম।

দেখতে দেখতে ক্লাস টেনে উঠে গেলাম। বাবার একটা বিরাট সমস্যা হলো। কোনোমতেই বাবা সে সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। বাবাকে দেখতাম—সারারাত জেগে থাকতেন। খুব ভোরবেলায় ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে ঘুমুতেন। চিন্তা করতে করতে বাবা অসুস্থ হয়ে গেলেন। বড় ডাক্তার দেখানো হলো। বাবার অসুস্থতা দেখে কেন জানি একটা ধাক্কা খেলাম। নিজের অজান্তেই পণ করে ফেললাম—'যদি বাবা সুস্থ হয়ে যান, তাহলে আমি সব ছেড়ে দেব। ভালো হয়ে যাবো।'

বাবা সুস্থ হলেন। কিন্তু আমি আগের মতোই রয়ে গেলাম। আবারও জাহেলি জীবনে ফিরে গেলাম। বড় বড় গোনাহগুলো—জীবনের দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হলো। দুনিয়া আমার ওপর চেপে বসল। ভোগ-বিলাসিতাই—জীবনের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হলো। মডার্ন থেকে আলট্রা-মডার্ন হতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে এস এস সি ফাইনাল পরীক্ষা চলে এলো। সারা বছর ঘুরে বেড়িয়েছি। ঘোরাঘুরি, আড্ডা, গল্প, ম্যাসেজিং—এসবের পেছনেই সময় চলে গেছে। বইয়ের সাথে আর সম্পর্ক হয়ে ওঠেনি। কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। একদিন বাবা ডেকে বললেন, 'তোমাকে কিন্তু গোল্ডেন এ-প্লাস পেতে হবে।'

বাবার কথা শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমার মতো ছাত্র গোল্ডেন পাবে কীভাবে? ২০০৯ সালে আমাদের স্কুল থেকে মাত্র একজন গোল্ডেন পেয়েছে। আমরা পরীক্ষা দেবো ২০১০-এ। আমার পক্ষে কি সেই একজন হওয়া সম্ভব? বাবাকে কোনোভাবেই বোঝাতে পারি নি যে, আমি গোল্ডেনের উপযুক্ত নই।

নিয়ত করলাম ভালো করে পড়াশুনো করবো। ছোটবেলা থেকেই একটু বেশিই জেদি ছিলাম। অবশ্যি জেদটা আমার আম্মুর কাছ থেকেই পাওয়া। বাবার কথা শুনে, আমার জেদটা আরও বেড়ে গেল। টেস্ট পরীক্ষার পর, আমি টেবিল-চেয়ারের সাথে নিজেকে বেধে নিলাম। টয়লেট ছাড়া টেবিল ছেড়েছি খুবই কম। দিনে কখনো ঘুম এলে, টেবিলেই ঘুমাতাম। শুধু রাতে বিছানায় ঘুমাতাম। তাও খুব কম সময়ের জন্যে। মা-বাবা চিন্তায় পড়ে গেলেন। বাবা খুব করে বোঝাতে লাগলেন—আমি যেন পাগালামো না করি। গোল্ডেন আমার না পেলেও চলবে। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা।

একদিন গুরুর সাথে দেখা। বাবা তাকে আমার ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন। তাকে দেখে আমি পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেও তিনি আমার সামনে এসে হোন্ডা থামালেন। আমাকে বললেন, 'ওঠো।'

কোনো কথা না বলে আমি উঠে গেলাম। তিনি আমাকে বকুলতলায় নিয়ে গেলেন। টানা অনেক্ষণ কথা বললেন। তার কিছুকথা এখনও আমার কানে বাজে। তিনি বলেছিলেন—'পড়াশোনার ব্যাপারে যতটা অনেস্ট, আল্লাহর ব্যাপারেও যদি ততটাই অনেস্ট হতি, কতই না ভালো হতো! তুই একবারও তোর রবের কথা ভাববি না, যিনি তোকে একফোঁটা শুক্রানু থেকে এতটা বড় করেছেন। যিনি তোকে মায়ের পেটে, কারও সাহায্য ছাড়াই বাঁচিয়ে রেখেছেন। যিনি তোর জন্যে আলো, বাতাস, অক্সিজেন ফ্রি করে দিয়েছেন। যদি সিলিন্ডারে করে অক্সিজেন কিনে আমাদের বাঁচতে হতো, তাহলে কতদিন আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম? যদি পানিকে আল্লাহ এভেল্যাবল না করতেন, তাহলে কতইনা প্রবলেম ফেস করতে হতো। এতসব নেয়ামত যিনি তোকে ফ্রিতে দিয়েছেন, তাঁকে তুই কীভাবে ভুলে গেলি? তোর কি কখনোই মনে হয় নাই—তুই ভুলের মধ্যে আছিস? ধোঁকার মধ্যে আছিস?'

গুরুর সব কথা মনে নেই। তবে তাঁর সেদিনের কথাগুলো—আমার ওপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। বাসায় ফিরে আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, আজ থেকে আর নামাজ ছাড়বো না। সেদিন থেকে অল্প অল্প নামাজ পড়া শুরু করলাম।

একদিন নামাজ শেষে একটা লম্বা দোয়া করলাম। নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বলে ফেললাম—'হে আল্লাহ, তুমি আমাকে গোল্ডেন পাইয়ে দাও। আমি যদি গোল্ডেন এ-প্লাস পাই, তাহলে সবকিছু ছেড়ে দেবো।'

Scanned with CamScanner

আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছিলেন। সে বছর আমাদের স্কুল থেকে ছ-জন গোল্ডেন পায়। আমি ছিলাম তাদেরই একজন।

গোল্ডেন পাওয়ার পর, আল্লাহর সাথে আমার ওয়াদার কথা—বার বার মনে হতে থাকে। আমার অন্তরে ঝড় বয়ে যেতে থাকে। আমি কেন আমার ওয়াদা পূর্ণ করছি না? কেন? আমি কি আমার রবকে ফাঁকি দিচ্ছি? না নিজেকেই ফাঁকি দিচ্ছি? কে আমাকে বাধা দিচ্ছে? কোন সে শক্তি—যা আমার আর আমার রবের মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

কিছুদিন পরের ঘটনা। আমি আর গুরু টেইলার্সের দোকানে। গুরু পাঞ্জাবি বানাবেন। আমাকেও সাথে নিয়ে এসেছেন। আমি যেন তার জন্যে ভালো রঙের কাপড় পছন্দ করে দিই। অনেক বাছাই করে গুরুর জন্যে একটা কাপড় কিনলাম। গুরু পাঞ্জাবির মাপ দিলেন। দোকান থেকে বেরোনোর সময় নিজের অজান্তেই মুখ ফসকে বলে ফেললাম, 'খালি একা-একা পাঞ্জাবি বানাবেন? আমাকে বানিয়ে দেবন না?

আমার কথা শুনে গুরু আমায় বুকে জড়িয়ে নিলেন। দর্জিকে দিয়ে আমার মাপ নিলেন। একটা পাঞ্জাবির অর্ডার দিলেন আমার জন্যে। সাদা পাঞ্জাবি। সে পাঞ্জাবিটা এখনও আছে। খুব যত্ন করে রেখেছি। মাঝে মাঝে আমি সেটার ওপর হাত বুলাই। আর আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি।

মহান আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর গোলামকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে সত্যের আলোতে নিয়ে এসেছেন।

Scanned with CamScanner

সংশয় থেকে বিশ্বাস: এক পথিকের গল্প

মো. আবদুল্লাহ সাঈদ খান, এমবিবিএস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

আমার জন্ম একটি মোটামুটি প্র্যাকটিসিং মুসলিম পরিবারে। যদিও আমার পিতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলেম ছিলেন না, কিন্তু তিনি ইসলাম সম্পর্কে স্বেচ্ছায় অনেক বিস্তারিত পড়ালেখা করেছিলেন। তার প্রভাবে আমাদের মা এবং ভাই-বোনদের চেষ্টা ছিল ইসলামের বেসিক আমলগুলো ঠিকমতো করার। সে সুবাদে আমিও ছোটবেলা থেকে চেষ্টা করতাম, যেন মৌলিক ইবাদতগুলো মিস না হয়।

কিন্তু শয়তান আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছে যে, সে মানুষকে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করবে। তাই স্বাভাকিভাবে অন্য দশজনের মতো আমিও তার শিকার হয়ে পড়ি। কিশোর বয়স থেকেই আমার মাঝে সংশয়ের বীজ রোপিত হতে শুরু করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতে সংশয় আমাকে কখনোই পুরোপুরি কুপোকাত করতে পারেনি। ফলে, আমার ইতিহাস হলো একটি যুদ্ধের ইতিহাস। সংশয়ের বিরুদ্ধের বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের ইতিহাস। মজার বিষয় হলো, ইমানকে লক্ষ্য করে আসা বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আমার মাথায় অন্য কোনো বই বা মানুষের প্ররোচনায় আসেনি। হ্যাঁ, দু-একজন বামপন্থী, নাস্তিক দু-একবার হিন্ট দিয়েছে বটে। কিন্তু আমার মস্তিষ্কের জন্য ওগুলোই হয়তো যথেষ্ট ছিল। পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন সন্দেহপূর্ণ প্রশ্ন মাথায় একাই খেলা করত।

তবে অন্তর্দ্বন্দ্বের এই সময়টা যে খুব আরামে কাটিয়েছি তা নয়। এখনো মনে পড়ে, প্রথম প্রথম এই সংশয়বাদী প্রশ্নগুলো নিয়ে যখন ভাবতাম, বুকে চিন চিন ব্যাথা করত। বুক চেপে আসতে চাইত ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। ডাক্তার হওয়ার

Scanned with CamScanner

সুবাদে এখন বুঝি যে, এগুলো ছিল প্যানিক এটাকের লক্ষণ যা তীব্র এনজাইটি থেকে আসত। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা'র কৃপায় সংশয় নিরসন হওয়ার সাথে সাথে দারুণ এক প্রশান্তি মনে এসে জায়গা নিত। পরবর্তী সময়ে জানা ও চিন্তার ম্যাচুরিটির সাথে সাথে বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে। এখন নাস্তিকদের অযুক্তি, কুযুক্তি যতটুকু বুঝতে পারি—তা এই তীব্র মানসিক যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফসল।

যতটুকু মনে পড়ছে আমার—প্রথম সংশয়ের শুরুটা হয় তাকদির নিয়ে। তখন নবম শ্রেণিতে উঠেছি কেবল। কিন্তু এমন একটি বিষয় নিয়ে সংশয় মনে দানা বেঁধেছে, যেটি নিয়ে বেশি ভাবলে বিভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি।

তাকদির সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো সাধারণত যে ধরনের হয় তাকে সংক্ষেপে দুটি বাক্যে নিয়ে আসা যায়—

১) আল্লাহ যদি সবকিছু নির্ধারণ করে রাখেন তাহলে আমাদের বিচার কেন হবে?

২) আল্লাহ যেহেতু সবকিছু লিখেই রেখেছেন তাহলে আমি আমার মতো যা ইচ্ছে করতে থাকি।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী যারা তাকদির নিয়ে চিন্তা করেন, তাদের মধ্যে কয়েকটি পরিণতি লক্ষ করা যায়। একদল এই সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যেন ইমানে সমস্যা না হয়। আরেকদল এটির ভুল অর্থ বুঝে নিয়ে পাপ কাজ অবলীলায় করতে থাকে। অর্থাৎ, সে তাকদির-এ বিশ্বাসও করে আবার পাপ কাজও করে। তবে, তাকদির সংক্রান্ত বিভ্রান্তি থেকে নাস্তিক হয়ে যাওয়া লোকের সংখ্যা কম। যদিও এ বিষয়টি নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করতে নাস্তিকরা বেশ তৎপর।

কিন্তু আমি তো নাছোড়বান্দা। বুকের তীব্র ব্যাথাটাকে কমাতে আমাকে একটি স্যাটিসফ্যাক্টরি উত্তর খুঁজে নিতে হবে। তাই আমি এই সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা ও অধ্যয়ন শুরু করলাম। প্রথমে জানার চেষ্টা করলাম যে—তাকদির আসলে কী? হাদিস এবং আকিদার বইগুলো থেকে বুঝতে পারলাম যে, তাকদির বলতে বোঝায়, গাছের প্রতিটি পাতার নড়াচড়া থেকে শুরু করে মানুষের প্রতিটি আমলই আল্লাহ কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত। এই পর্যায়ে এসে জিলাপীর প্যাঁচটা আরও বেড়ে গেল। কারণ, তাকদির-এ বিশ্বাস একটি মৌলিক বিশ্বাস। সুতরাং উপরের কথাগুলো

Scanned with CamScanner

সত্য। আবার, এটাও সত্য যে, মানুষের আমলের উপর বিচার হবে। আমি ভাবতে লাগলাম, এ দুটোর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় করা যায়?

আমি ইসলামি প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কয়েকটি বই-এর আশ্রয় নিলাম। সিনিয়রদের প্রশ্ন করলাম। *'তাকদির'* শিরোনামে একটি বইও পড়েছিলাম, যার লেখকের নামটা মনে নেই। কয়েকবছরের পড়াশোনা থেকে প্রাপ্ত উত্তর এবং নিজের চিন্তার আলোকে আমি দুটি বিষয় এভাবে সমন্বয় করলাম—

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সময়েরও স্রষ্টা। কিন্তু, আমরা সময়ের অধীন এবং আমাদের চিন্তা-চেতনাও সময়ের অধীন। আল্লাহ তাআলার অনুমতি সাপেক্ষে সবকিছু ঘটে গেছে। ফলে তিনি সবকিছু জানেন। এমনকি আমরা 'স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি' দিয়ে কোন পথ বেছে নেবো তার খুঁটিনাটি তার জানা। হাশরের ময়দানে কী বিচার হবে তা-ও তার জানা। জান্নাত ও জাহান্নামের অসীম সময় পর্যন্ত জ্ঞান তার নখদর্পণে। আমি অন্য যে কোনো পথ বেছে নিলে কী করতাম এবং আমার পরিণতি কী হতো, সে সম্পর্কেও তিনি অবগত। তিনি তার সেই জ্ঞানের আলোকেই সবকিছু 'পূর্বনির্ধারণ' করে লিখে রেখেছেন আমাদের 'সময় জ্ঞানের সাপেক্ষে'।

লক্ষণীয়, আল্লাহ তাআলার সাপেক্ষে পূর্ব নির্ধারণ বলতে কিছু নেই। কিন্তু, আমরা যেহেতু সময়ের অধীনে তৈরি, তাই আমাদের সময়ের সাপেক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই লেখাগুলোই পূর্বনির্ধারণ। অর্থাৎ, 'তাকদির' আল্লাহ তাআলার পারস্পেকটিভ থেকে সৃষ্ট একটি বাস্তবতা (রিয়েলিটি)। মহাবিশ্ব, স্থান ও সময়সহ অস্তিত্বশীল হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছেয় এবং তা হয়েছে তার লিপিবদ্ধ 'তাকদিরের' আলোকে।

কিন্তু আমি ভাবলাম, আল্লাহ পূর্বনির্ধারণ করে রেখেছেন, এই বিষয়টিতে আমাদের কেন বিশ্বাস রাখতে হবে, বা এই বিষয়টি কেনইবা জানতে হবে? এর অন্যতম কয়েকটি কারণ হলো : আল্লাহর বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা তৈরি। হতাশ না হওয়া এবং অতিমাত্রায় 'দরদী' না হয়ে ওঠা। অতিমাত্রায় দরদী হয়ে যাওয়া বলতে বুঝাচ্ছি যে, কোনো কোনো সময় আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহকে অস্বীকারকারী এমন ব্যক্তি, যারা অনেক ভালো কাজ করেছেন, তারা কেন জান্নাতে যেতে পারবে না? এর মূল উত্তরটা 'তাকদির'-এর মধ্যে নিহিত

Scanned with CamScanner

আছে। এ প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করা উত্তম হবে যে, 'তাকদির' হলো আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সাপেক্ষে সৃষ্ট বাস্তবতা। অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহই জানেন—তিনি উক্ত ব্যক্তিকে স্রষ্টাকে চেনার কতটুকু সুযোগ দিয়েছিলেন এবং সে তার কতটুকু ব্যবহার করেছে। আল্লাহ এও জানেন, যে সে অন্য কোনো পথ বেছে নিলে বা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিলে বিশ্বাসের ওপর কতটুকু অটল থাকতে পারত এবং কতটুকু ভালো কাজ করত। অর্থাৎ, তার পথ নির্বাচন ও পরিণতি আল্লাহর অসীম জ্ঞানের সাপেক্ষে সৃষ্ট তাকদির। কিন্তু, আমাদের জ্ঞান যেহেতু সীমাবদ্ধ, আমরা আল্লাহর নির্ধারণকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যোগ্যতা রাখি না।

তাকদির-এর পর যে বিষয়টি নিয়ে আমি সংশয়ে পড়ে যাই তা হলো—কুরআন কি সত্যই আল্লাহপ্রেরিত গ্রন্থ কি না? এই প্রশ্নটির একটি পূর্ণ উত্তর পেতে পেতে আমার মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ার পার হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম মরিস বুকাইলির 'বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান', মুহাম্মদ সিদ্দিক রচিত 'নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন' এবং আবুল আলা'র তাফসির বইটি আমাকে সাহায্য করেছে। তখন ইন্টারনেট দুঃষ্প্রাপ্য ছিল। মেডিকেলের ফার্স্ট ইয়ারে যখন ইন্টারনেটে কিছুটা এক্সেস করা যাচ্ছে তখন হারুন ইয়াহিয়ার 'মিরাকল অব দি কুরআন' বইটি হাতে পাই, যা উপকারে এসেছিল। উল্লেখ্য, হারুণ ইয়াহিয়া বর্তমানে 'সেক্স-কাল্ট'-এর লিডারদের মতো হয়ে গেছেন, যেটি শুরুর দিকে ছিল না। এছাড়াও আরেকটি বই পড়ে আমি প্রথমে খুব প্রভাবিত হয়েছিলাম, যার শিরোনাম ছিল *ইহার উপর উনিশ*। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ড. বিলাল ফিলিপ্স রচিত আরেকটি বই 'The Qur'an's Numerical Miracle: Hoax and Heresy' থেকে উনিশ সংক্রান্ত মিরকাল খুঁজতে গিয়ে রাশাদ খলিফার কুরআনবিকৃতি সম্পর্কে জানতে পারি এবং এও জানতে পারি যে, কুরআন অন্যতম প্রধান মুজিজা হলো এটি একটি সাহিত্যিক মিরাকল। এছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী *সিরাত ইবনে হিশাম* এবং *আর রাহিকুল মাখতুম* থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

যে পয়েন্টগুলোতে আমি কুরআনে আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যপারে নিশ্চিত হই তার মধ্যে কয়েকটি হলো :

» রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ালেখা না জানা সত্ত্বেও কুরআনের মতো এমন একটি গ্রন্থ প্রচার করা। যার চ্যালেঞ্জ তৎকালীন আরবি

Scanned with CamScanner

সাহিত্যে চূড়ান্ত উন্নতির যুগের কোনো সাহিত্যিক বা কবি গ্রহণ করতে পারেনি।

» মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এমন একটি স্থান থেকে এমন একটি জাতি গঠন—যারা অল্প সময়ের মধ্যে অর্ধপৃথিবী শাসন করেছে, যেটা তার বার্তাবাহক হওয়ার প্রমাণ।

» কুরআনে কোনো বৈজ্ঞানিক অসামঞ্জস্য না থাকা।

» কুরআনের কিছু বর্ণনা যা বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমেই নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেমন : ভ্রূণবিদ্যার বিভিন্ন স্তর সংক্রান্ত বর্ণনা ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের কথা।

» কুরআনের গাণিতিক গাঁথুনি।

» কুরআনের ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা।

কুরআনে লিটারারির মিরাকাল নিয়ে বিস্তারিত কোনো বই বাংলায় বা ইংরেরিতে আমার মেডিকেলে পাঁচ বছরে পাইনি। বর্তমানে নোমান আলি খানের লেকচারসহ বেশকিছু বই ও ভিডিও লেকচার পাওয়া যায়।

এ সময় সংশয়বাদী আরও অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছিল, যার উত্তর বিভিন্ন বই থেকে পেয়েছি। দ্বাদশ শ্রেণি থেকে আমার মাথায় বিবর্তনের ভূত চেপে বসে। অর্থাৎ, এই সময় প্রথম ডারউইনবাদ সংক্রান্ত সংশয় শুরু হয়। যদি ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির রুল দিয়েই জীবের উৎপত্তি ও প্রজাতির আবির্ভাব ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে কি আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেননি? মানুষ কি এপ থেকে এসেছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে শুরু হয় আমার বিবর্তনবাদ ও ডিজাইনতত্ত্ব সংক্রান্ত দীর্ঘ পড়ালেখা—যা গত পনেরো বছর যাবৎ চলছে।

প্রশ্নটাকে মূলত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। জীবের উৎপত্তি এবং প্রজাতির উৎপত্তি। বর্তমান বিবর্তনবাদীরা জীবের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নটি আলাদা বলতে চাইলেও আগে এটি বিবর্তনের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। যাইহোক, এ সংক্রান্ত পড়ালেখা শুরু করি মুহাম্মদ সিদ্দিকের *‘বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব’* এবং মাওলানা আবদুর রহীম-এর ‘বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব’-বই দুটো দিয়ে। মরিস বুকাইলির *‘Origin of man’* বইটি পড়ি ইংরেজিতে।

এ সংক্রান্ত সংশয় দূরীভূত হতে শুরু করে মেডিকেল ফার্স্ট ইয়ারে। এ সময়

Scanned with CamScanner

প্রথম যে বইটি আমার সবচেয়ে বেশি উপকারে আসে তা হলো হারুন ইয়াহিয়ার *'Darwinism Refuted'*। মনে পড়ে বইটি নেট থেকে ডাউনলোড করে ডেস্কটপের কম্পিউটার স্ক্রিনে রাত জেগে পড়ে শেষ করেছিলাম। অধিকন্তু, এই সময়ে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি পড়ে জীবের গঠন শৈলী নিয়ে আমি নিজে নিজেই ভাবতাম যে—এগুলো একজন ডিজাইনার ব্যতীত একা একা আসা কি আদৌ সম্ভব? হারুন ইয়াহিয়ার বইটি পড়ে উত্তরটা যেন আরও সহজ হয়ে গেল।

এরপর পড়ালেখা আরও বিস্তৃত হয়। সরাসরি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের ডারউইনবাদ ও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সংক্রান্ত বইগুলো পড়া শুরু করি ফোর্থ ইয়ার থেকে। চার্লস ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিস* বইটি পড়তাম বুঝে বুঝে। উদ্দেশ্য ছিল—বিবর্তনবাদকে মূল থেকে বুঝবো। পাশাপাশি ডিজাইন সংক্রান্ত বইগুলো পড়ায় ডারউইনবাদের কতটুকু ঠিক, আর কতটুকু অতি প্রচারণা সে সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হতে শুরু করে। ডারউইনবাদ ও ডিজাইনতত্ত্ব সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত পড়ালেখা করতে গিয়ে আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারি যে—ডারউইনবাদ আসলে একটি ফাঁকা কলসি, যা বাজে বেশি। অর্থাৎ, পপুলার বইগুলোতে এবং আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলের টেক্সট বইগুলোতে ডারউইনবাদকে যতটুকু প্রমাণিত হিসেবে পড়ানো হয়, ডারউইনবাদ তার চেয়ে বহুগুনে প্রমাণশূন্য। আবার, ডারউইনবাদ যদি সত্যও হতো, তথাপি একে নাস্তিকতার ভিত্তি হিসেবে প্রচার করার কোনো কারণ ছিল না।

ডারউইন প্রদত্ত বিবর্তনতত্ত্বের মূল কথা ছিল—প্রতিটি প্রজাতি নিজেকে টিকিয়ে (এক্সিসটেন্স) রাখার জন্য যুদ্ধ (স্ট্রাগল) করে। যুদ্ধটা হয় প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বেঁচে থাকার উপকরণ নিয়ে। প্রজাতিতে জন্মান্তরে যে ভ্যারিয়েশন তৈরি হয় তার মধ্যে যে ভ্যারাইটি-টি বিদ্যমান উপকরণ বেশি ব্যবহার করতে পারে সে টিকে যায়। এভাবে জন্ম থেকে জন্মান্তরে মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে এককোষী প্রাণী পৃথিবীর সকল প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে!

প্রথমত, ডারউইনের মূল তত্ত্ব যে বিষয়টি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারেনি তা হলো—কীভাবে ভ্যারিয়েশন তৈরি হচ্ছে? দ্বিতীয়ত, ডারউইন দৃশ্যমান মৃদু পরিবর্তন (মাইক্রোইভল্যুশন) থেকে বড় পরিবর্তনের (ম্যাক্রোইভল্যুশন) ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত এভিডেন্স দেখাতে পারেননি। তিনি তার সময়ে প্রাপ্ত ফসিল এভিডেন্সের আলোকে বলার চেষ্টা করেছেন এবং যথেষ্ট ফসিল না থাকার ব্যাপারটিও স্বীকার করেছেন। কিন্তু ডারউইনের সময় কোষের ভিতরের

Scanned with CamScanner

বিশাল মলিকিউলার জগত সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় মলিকিউলার পর্যায়ে কীভাবে এই বড় পরিবর্তন আসতে পারে—সে বিষয়ে কোনো ধারণাই তিনি দেননি।

গ্রেগর জোহানস মেন্ডেলের বংশগতির সূত্র আবিস্কার এবং ওয়াটস ও ক্রিকের বংশগতির ধারক হিসেবে ডিএনএ আবিস্কারের পর আর্নস্ট মেয়ার ও ডবঝানস্কি মিলে র‍্যানডম মিউটেশনকে ভ্যারিয়েশন তৈরির প্রক্রিয়া হিসেবে প্রস্তাবনা করে তৈরি করেন মডার্ন সিনথেসিস অব ইভল্যুশন। এটি নিও-ডারউইনিজম নামেও পরিচিত।

তাদের এই প্রস্তাবনার পর মেয়ার নিজে এবং পরবর্তী অনেক বিজ্ঞানী র‍্যানডম মিউটেশন এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই প্রমাণিত হয়েছে—র‍্যানডম মিউটেশন প্রজাতির ক্ষতি আনে, কোনো উপকারী ভ্যারিয়েশন তৈরি করে না। যদি কোনো প্রজাতিতে র‍্যানডম মিউটেশন বেঁচে থাকতে সাহায্য করেও থাকে, তা হয় ওই প্রজাতির গুরুত্বপূর্ণ এক বা একাধিক কার্যক্রম ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে কমে গিয়ে। যেমন : সিকেল সেল এনেমিয়া নামক রোগটি মানুষের রক্তে হিমোগ্লোবিনের সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু ম্যালেরিয়াপ্রবণ অঞ্চলে এই সংশ্লিষ্ট মিউটেশনটি ডিএনএ-তে থাকলে মানুষ বেঁচে যায়। এই বেঁচে যাওয়া অনেকটা 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' প্রবাদটির মতো।

অর্থাৎ, র‍্যানডম মিউটেশন 'ক্ষুদ্র' বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারলেও 'বড়' বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে না। তারপরও জোরপূর্বক নিও-ডারউইনিজমকে বিজ্ঞান হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ডারউইনের পর দেড়শ বছরে জীবাশ্ম প্রমাণের কী হলো? গত দেড়শ বছরে বহু জীবাশ্ম আবিষ্কার হয়েছে। সেসব জীবাশ্মের আলোকে ডারউইনবাদীরা দাবি করে যে, কোনো কোনো প্রজাতির ক্ষেত্রে জীবাশ্মের মধ্যবর্তী প্রজাতিগুলো খুব স্পষ্টভাবে পাওয়া গেছে, সুতরাং বিবর্তনবাদ প্রমাণিত। কিন্তু একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, তাদের এই দাবি অনেকাংশেই মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে তারা সরীসৃপ থেকে পাখির বিবর্তন, চতুষ্পদী প্রাণী থেকে তিমির বিবর্তন, ঘোড়ার বিবর্তন এবং এপজাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের বিবর্তন সংক্রান্ত কয়েকটি ধারাবাহিক অঙ্কিত চিত্র দেখায় এবং এদের ফসিল পাওয়া গেছে বলে দাবি করে। কিন্তু, এদের প্রদর্শিত ফসিল প্রমাণ হয় উদ্ধারকৃত অসম্পূর্ণ হাড়ের উপর ভিত্তি করে নির্মিত

Scanned with CamScanner

অথবা, উক্ত ফসিলকে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের (কাইন্ড) প্রাণীর মধ্যে কোন দলে ফেলা যায় তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যেমন : আর্কিওপটেরিক্স নামক পালক ও লেজ বিশিষ্ট ফসিলটিকে পূর্ণাঙ্গ পাখি বা প্লাটিপাসের মতো মোজাইক কোনো প্রাণীর মধ্যে ফেলা যায়।

তবে, এর চাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে—জীবাশ্মের উপর ভিত্তি করে তারা এক ধরনের প্রজাতি (যেমন : সরীসৃপ) থেকে আরেক ধরনের প্রজাতি(যেমন : পাখি) আসার যে দাবি করছে তা তাত্ত্বিক বা মলিকিউলার বায়োলজির আলোকে সম্ভব কি না? যে কোনো একজন জীববিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই বিবেচনা করে দেখতে পারে, এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কতগুলো দরকার। যেমন : পাখির উদাহরণটা নিয়েই যদি একটু চিন্তা করি—একটি সরীসৃপকে পাখি হতে হলে সরিসৃপের ত্বকের স্কেলকে পালকে পরিণত হতে হবে। পালকের সাথে সংশ্লিষ্ট মাংসপেশীতে পরিবর্তন আসতে হবে। মাংসপেশীর সাথে সংযুক্ত নার্ভের পরিবর্তন লাগবে। নার্ভকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রেইনের অংশে পরিবর্তন আসতে হবে, ব্রেইনের নিউরনের সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামিং-এর পরিবর্তন আসতে হবে, পাখির শ্বাসযন্ত্রকে একমুখী হতে হবে—যেন ওড়ার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা না হয়—পাখির হাড়গুলো হালকা হতে হবে যেন ওড়ার সময় ভারে পড়ে না যায় এবং এইভাবে এই লিস্ট আরও বড় করা যায়। সামান্য একটু চিন্তাতেই বোঝা যাচ্ছে—এই ধরনের ট্রানজিশন এলোপাতাড়িভাবে আসার বিষয়টি অলীক কল্পনা। অধিকন্তু, সরীসৃপের ডিএনএ-তে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আনতে যে পরিমাণ সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন দরকার তা 'এলোপাতাড়ি' মিউটেশনের মাধ্যমে আসা আদৌ সম্ভব কি না এই প্রশ্ন যদি কোনো মলিকিউলার বায়োলজির ছাত্র 'নিরপেক্ষ'ভাবে চিন্তা করে সে উক্ত সম্ভাব্যতা হেসে উড়িয়ে দেবে।

তারপরও, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তা আনবিক জীববিজ্ঞানী ও গণিতবিদরা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নিয়ে হিসেব কষেছেন। তারা বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে—র‍্যানডম মিউটেশন বা তৎপরবর্তী প্রস্তাবিত অন্যান্য আণবিক প্রক্রিয়ায় একা একা এ ধরনের পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা নেই এবং সময়ও নেই।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তাদের এই বিষয়গুলো আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি এবং সাথে আনবিক জীববিদ্যার পাঠ্যপুস্তক গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি, প্রোবাবিলিটি ও স্ট্যাটিসটিক্স-এর বেসিক বুঝে নিয়েছি, প্রয়োজনে অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিয়েছি যেন তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ,

Scanned with CamScanner

তাদের প্রস্তাবনা আমার কাছে অনেক বেশি স্যাটিসফেকরি মনে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার পড়া বেস্ট বইগুলোর মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া জরুরি বোধ করছি— মাইকেল বিহে-এর *Dawin's Black Box* ও *Edge of Evolution*, স্টিফেন মেয়ার-এর *Signature in the cell* ও *Darwin's Doubt*, উইলিয়াম ডেম্বস্কি ও জোনাথান ওয়েলস-এর '*The Design of Life*', জোনাথান ওয়েলস-এর '*Icons of Evolution*' ও '*Zombie Science*', উইলিয়াম ডেম্বস্কি-এর '*The design inference*' এবং '*No free Lunch*'। এই বইগুলো একেকটা মাস্টারপিস এবং বইগুলোতে মলিকিউলার বায়োলজির এভিডেন্স ও ম্যাথমেটিক্স-এর উপর ভিত্তি করে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

যখন বায়োকেমিস্ট্রি থেকে প্রোটিন, আরএনএ এবং ডিএনএ-র বিস্তারিত গঠন জেনেছি তখন থেকেই নিজেই ক্যালকুলেশন করতাম যে এলোপাতাড়িভাবে এদের আসার সম্ভাবনা খুবই নগন্য এবং ডিজাইন ছাড়া এগুলো আসা সম্ভব নয়। মজার বিষয় হলো, ডিজাইন সংক্রান্ত বইগুলোতে আমার চিন্তাভাবনার এনডর্সমেন্ট পেয়েছি। ফলে ভাবনাগুলো পাকাপোক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, একদল বস্তবাদী বিজ্ঞানী আছেন যারা নিওডারউইনিজমের পদ্ধতিগত ত্রুটি আলোচনা করছেন ঠিকই; কিন্তু বস্তুবাদের প্রতি তাদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসতে পারছেন না। তারা প্রস্তাবনা রাখছেন 'এক্সটেন্ডেড ইভল্যুশনারি সিনথেসিস' অথবা 'দি থার্ড ওয়ে' নামে তৃতীয় কোনো পদ্ধতির যেগুলো প্রকৃতপক্ষে আদিম কোষে প্রয়োজনীয় জেনেটিক তথ্যের উপস্থিতি আছে ধরে নিয়ে সামনে আগায়। অন্যদিকে, একদল বিবর্তনবাদী আছে যারা বিশ্বাস করেন যে—প্রজাতির উদ্ভব বিবর্তনের মাধ্যমেই হয়েছে, তবে তা স্রষ্টার পথনির্দেশনায় হয়েছে। এর মধ্যে আবার দুটি ভাগ আছে। একদল মনে করেন, পৃথিবীর প্রথম দিকের কোষেই (আদিকোষ) এই পথনির্দেশনা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরেকদল বলতে চান যে, সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় মিউটেশন স্রষ্টার গাইডেন্সে হয়েছে। এই দুই দলই প্রকৃতপক্ষে জীবজগতের সৃষ্টিতে ডিজাইনারের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নিচ্ছেন। সুতরাং, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (ID) তাত্ত্বিকদের সাথে এদের মৌলিক পার্থক্যটা হলো, আইডি তাত্ত্বিকরা জীবজগতে ডিজাইন আবিস্কারের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রস্তাবনা করছেন এবং তারা ডিজাইনারের প্রকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানোর বিষয়টি দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে গাইডেড বিবর্তনে বিশ্বাসীরা সরাসরি ডিজাইনারের

Scanned with CamScanner

প্রস্তাবনাটাকে সাথে উল্লেখ করছেন।

খুব সংক্ষেপে এই ছিল আমার বিবর্তনবাদ থেকে ডিজাইনতত্ত্বে ধাবিত হওয়া এবং বিবর্তন সংক্রান্ত সংশয় দূর হওয়ার পথপরিক্রমা। তবে আমার এই জার্নিতে আরও দুটো অধ্যায় হলো মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে আল্লাহর প্রয়োজনীয়তা এবং আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্ন।

বিগব্যাং-এর সত্যতা আবিস্কার এবং পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্রের ফাইন টিউনিং মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে ডিজাইনারের উপস্থিতিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। একজন ডিজাইনারের প্রয়োজনীয়তা এড়াতে নাস্তিক পদার্থবিদদের আবিস্কারগুলো এতটাই হাস্যকর যে, এগুলোকে সিরিয়াসলি নেওয়ার কোনো কারণ কখনো পাইনি। গণিতবিদ রোজার পেনরোজ হিসেব কষে দেখিয়েছেন, আমাদের মহাবিশ্বের অস্তিত্বে আসার সম্ভবনা ১০-এর পর ১০ টু দি পাওয়ার ১২৩ টি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি হবে তার মধ্যে একবার। এলোপাতাড়ি তত্ত্ববাদী নাস্তিকদের জন্য এটি একটি মহাবিপদ। এজন্য নাস্তিক ম্যাক্স টেগমার্ক 'মাল্টিভার্স' নামক তত্ত্ব দিয়েছেন। যার অর্থ হলো ১০ টু দি পাওয়ার ১০ টু দি পাওয়ার ১২৩ (১০^১০^১২৩) টি মহাবিশ্ব আছে যা আমাদের থেকে 'সময়-স্থানিকভাবে বিচ্ছিন্ন'। 'সময়-স্থানিকভাবে বিচ্ছিন্ন'-এর অর্থ হচ্ছে এই তথাকথিত মহাবিশ্বগুলোর সাথে আপনি কখনোই যোগোযোগ করতে পারবেন না। যেহেতু এত সংখ্যক ইউনিভার্স আপনি কল্পনা করতে পারছেন, অতএব, এর মধ্যে আমাদের মহাবিশ্ব থাকতেই পারে! তত্ত্বের বক্তব্য থেকেই দেখতে পাচ্ছেন যে, এটি একটি অবাস্তব গাণিতিক হিসাব—যার অবতারণা করা হয়েছে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য। অর্থাৎ, এই ধরনের তত্ত্বগুলো পিছনে নাস্তিকদের নিরন্তর পণ্ডশ্রমের কারণ যতটা না বৈজ্ঞানিক, তার চেয়ে অনেক বেশি আদর্শিক। এ সংক্রান্ত যত আর্টিকেল ও বই পড়েছি এবং যত ভিডিও দেখেছি তার মধ্যে তিনটি বই আমি রিকোমেন্ড করতে চাই—স্টিফেন বার-এর *'Modern Physics and Ancient Faith'*, মাইকেল ডেনটন-এর *'Nature's Destiny'* এবং পাউল ডেভিস-এর *'The Goldlilock's Enigma'*।

আপনি যখন বিজ্ঞানজগতের গভীরে অধ্যয়ন করবেন তখন দেখবেন—বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে নাস্তিকরা তাদের কালো থাবা বসিয়ে রেখেছে। তারা প্রতিটি ডিসিপ্লিনে তাদের মনগড়া তত্ত্ব বিজ্ঞানের মোড়কে পরিবেশন করেছে যেন স্রষ্টাকে অস্বীকার করা যায়। এ রকম আরেকটি জায়গা হচ্ছে 'আত্মার অস্তিত্ব'। একজন মেডিকেল

Scanned with CamScanner

সায়েন্সের ছাত্র হিসেবে আমাকে মানুষের ব্রেইনের গঠন বেশ ভালোভাবেই পড়তে হয়েছে। আবার অন্যদিকে আত্মা ও মন নিয়ে আগ্রহ থাকায় আমি এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছি। আমার পড়াশোনা থেকে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলি যে, আমাদের মনকে ডেনিয়েল ডেনেটদের মতো শুধু ব্রেইনের গঠনের কার্যকরী ফল বলা যায় না, অথবা মনকে খুবই উচ্চমানের কম্পিউটার প্রোগ্রামও বলা যায় না। সুতরাং 'মন' এমন একটি জিনিস যা কোনো বস্তুবাদী স্কেল দিয়ে পরিমাপযোগ্য নয়। এটি যে পরোক্ষভাবে আত্মার অস্তিত্বের দিকে নির্দেশ করে আমার কাছে তা পরিষ্কার, আলহামদুলিল্লাহ। এ বিষয়ে আমি যে দু-তিনটি বই-এর কথা বলতে চাই তা হলো—ম্যারিও বুয়েরেগার্দ-এর *'The Spiritual Brain'*, মার্ক বেকার ও স্টুয়ার্ট গোতজ-এর *'Soul Hypothesis'* এবং রোজার পেনরোজ-এর *'Emperor's New Mind'*।

এখন আমার পড়াটা আরও বিস্তৃত হয়েছে। আগে ধর্মের দর্শন নিয়ে পড়েছি খুব কম। এখন এই অধ্যায়টিতে প্রবেশ করেছি এবং আবিষ্কার করেছি যে—কয়েকজন বিশ্বাসী দার্শনিক গত পঞ্চাশ বছরে এই ক্ষেত্রটিতে এত বেশি উন্নতি করেছেন, যেন এখানে নাস্তিকদের কফিনে শেষ পেরেক লাগানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম লেইন ক্রেইগ-এর পাশাপাশি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আলভিন প্লানটিঙ্গা ও রিচার্ড সুইনবার্নের নাম উল্লেখ করতেই হয়।

অল্প অল্প করে লিখতে লিখতে অনেক কথা লিখে ফেললাম। আমি প্রথমে বলেছিলাম, আমার পড়াশোনার শুরুটা হয়েছে সংশয় থেকে। আল্লাহর রহমতে এখন সংশয়টা নেই, তবে পড়া-শোনা-লেখাও থেমে নেই। এক সময় পড়তাম বিভ্রান্তি দূর করতে। বিভ্রান্তি দূর হলে আল্লাহর ইচ্ছেয় আত্মার প্রশান্তি চলে আসত। এখনও পড়ি আর আল্লাহর অস্তিত্বের বিশালতা দেখে মাথা সেজদায় অবনত হয়ে আসে।

আমার এই দীর্ঘ জার্নিতে আমি লেখালেখির সুবাদে আমার মতোই সংশয় কিংবা নাস্তিকতা থেকে উঠে আসা কিছু আল্লাহর বান্দার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি—যাদের পড়ালেখা, জ্ঞান ও উপলব্ধির ব্যাপ্তির কাছে আমার প্রচেষ্টা কিছুই না। এমন বেশ কয়েকজন লেখকের জীবনীও আপনারা এই বইটিতে পড়েছেন বা পড়বেন। আমি যখন তাদের লেখা পড়ি নিজের কর্মের দুর্বলতা দেখে আত্মগ্লানিতে মাথা নিচু হয়ে আসে। আমি তওবা করি, আবার পাপ কাজে নিমজ্জিত হই, আবারও আল্লাহ তাআলার কাছে এক বুক আশা নিয়ে ক্ষমা চাই।

Scanned with CamScanner

ছোটবেলায় যখন সংশয়ে পড়ে যেতাম এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে সংশয় থেকে মুক্তি পেতাম তখন কুরআনের দুটি আয়াত আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনুভব করতাম :

পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া আসার মধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিমান লোক উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠনাকৃতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাদের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন। (তারা আপনা আপনি বলে ওঠে :) হে আমাদের প্রভু, এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত।[১]

আর, এখন যখন নিজের আত্মার সাথে জুলুম করে ফেলি মনে হয় যেন আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লাহ আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন :

(হে নবি, আপনি বলে দিন) হে আমার বান্দারা, যারা নিজের আত্মার ওপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২]

---

১ সুরা আল ইমরান: আয়াত : ১০-১১

২ সুরা যুমার : আয়াত : ৫৩

Scanned with CamScanner

আমি এবং আমাদের গল্প

মাহমুদুর রহমান, কিংসভিল, মেলবোর্ন, ভিক্টোরিয়া।

২০১২ সালের এক দুপুর বেলা। মেয়েকে স্কুল থেকে পিকআপ করতে গিয়েছি বিশপ স্ট্রিটে। ওর স্কুল আমার বাসা এডগার স্ট্রিটের পরের গলিতে, হাঁটা দূরত্বে। বাপ-মেয়ে স্কুল থেকে গল্প করতে-করতে ফিরছিলাম। লক খুলে ঘরে ঢুকেই একটা বিরাট ধাক্কা খেলাম। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক আফ্রিকান চোর আমার ল্যাপটপ কোলে নিয়ে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে বেলকনির দিকে ছুটে গেল। ওকে ভয় পেতে দেখে ভীষণ রাগ হলো আমার। এটা সম্ভবত স্বভাবসুলভ পিতৃত্ব যে, সন্তানের উপর বিপদ এলে শত্রুপক্ষ কত শক্তিশালী সে হিসেব থাকে না। চোরটাকে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আমার ঘরে কী করছিস?" কালো পাহাড় আমতা আমতা করে বলল, 'ইয়ে মানে, আমি ভেবেছিলাম—এটা আমার বন্ধুর বাসা'।

'বন্ধুর বাসায় জানালা ভেঙে ঢুকলি কেন?' জানতে চাইলাম। সে বলল, 'দেখো মাইট, এই রইল তোমার ল্যাপটপ। আমাকে আর ট্রাবল দিয়ো না। আমি চলে যাচ্ছি'। 'তুই কোথাও যাচ্ছিস না। আগে তোর পুরা বডি সার্চ করব, তুই হয়তো ছোটখাটো কোনো দামি জিনিস চুরি করেছিস'- বললাম আমি।

আমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকটাকে কথার ফাঁদে আটকে রেখে সময় নেওয়া; যাতে লোকজন জড়ো করে ওকে পুলিশে দিতে পারি। চোরটা নেশার ঘোরে দুলছিল। আমার কথা উপেক্ষা করে দরজা খুলে হাঁটা ধরল এরপর। আমারও কী হলো জানি না, পেছন থেকে তার গেঞ্জির গলা টেনে ধরলাম আর পাশের বাড়ির ডেভিডকে ডাকতে লাগলাম। তিন-চারবার ডেকেও তার সাড়া পেলাম না। হয়তো হিয়ারিং

Scanned with CamScanner

এইড খুলে বাথটাবে গলা ডুবিয়েছে বুড়োটা। অথবা কে জানে, ঘুমোচ্ছে হয়তো! শেষে চোরকে বললাম, 'দাঁড়া, আগে তোকে চেক করে নিই, তারপরে দেখা যাবে'।

ওর তুলনায় লিলিপুট সাইজের একটা লোকের সাহস দেখে চোরটা মনে হয় ভড়কে গিয়েছিল। সুবোধ বালকের মতো দু'হাত তুলে সারেন্ডারের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। ডান হাতে প্রায় একহাত লম্বা স্ক্রুড্রাইভার, যেটা দিয়ে সে জানালার ফ্লাইস্ক্রিন খুলে ঢুকেছে। জিনিসটা স্রেফ নামিয়ে আনলে আমি শেষ। জেদের বশে সেটাকে পাত্তা না দিয়ে আমি তার পকেটগুলো সার্চ করতে লাগলাম। কিছুই পেলাম না। শেষ পর্যন্ত ব্যাটাকে আটকে রাখার আর কোনো রাস্তা না পেয়ে বললাম, 'যা ভাগ'।

চোরটা হেঁটে হেঁটে তার গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমি পকেট থেকে ফোনটা নিয়ে ক্যামেরা অন করে তার পিছে পিছে হাঁটতে লাগলাম। সে তার গাড়ির দরজা খুলে ঢোকার আগে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বিরক্তিভরে জানতে চাইল, 'হোয়াট এলস ইউ ওয়ান্ট মাইট?'

ওই সুযোগে আমি ওর গাড়ির নাম্বারপ্লেটসহ ওর চমৎকার একটা ছবি তুলে ফেললাম। তারপর বললাম,- 'নাথিং ম্যান...জাস্ট গেট আউট হিয়ার'।

ওদিকে পাশের বিল্ডিং, যেখানে আরেক বাংলাদেশি ফ্যামিলি থাকেন, সেখান থেকে মহিলারা সব দেখছিলেন। তাদের মধ্যে আমার বাচ্চার মাও ছিলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেননি। এমনকি বুদ্ধি করে কেউ ট্রিপল জিরোতে কলও করেননি। আমি নিজেই আমার ল্যান্ডলর্ডকে ফোন করে ডেকে এনে বললাম, 'ভিক, তোমার বাড়ির জানালা ভেঙে চোর ঢুকেছে দেখো'। রাশিয়ান বুড়োটা বেশ হতভম্ব হলো। কারণ, এসব চুরিধারির সাথে ওরা ফ্যামিলিয়ার না। বললাম, 'হা করে দেখছ কী? আমায় নিয়ে থানায় চলো'। . . .

পাশের বিল্ডিংয়ের আল-আমিন ভাই বিকেলবেলা বাসায় এলেন। সালাম শেষে লাজুক হেসে বললেন, 'ভাই, আপনার বাসায় এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, আর আমি প্রতিবেশী হয়েও আপনার পাশে দাঁড়াতে পারলাম না। খুব আফসোস লাগছে, ভাই'।

আল-আমিন ভাই প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে আমার পাশের বিল্ডিংয়ে থাকছেন। তিনি

Scanned with CamScanner

বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ তেমন একটা হয় না। এর পেছনে বড় কারণ হলো, তিনি প্র্যাকটিসিং মুসলিম আর আমি তখন প্র্যাকটিসিং জাহেল। ভূমিকা শেষ করে ঘটনার বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন তিনি। সব শুনেটুনে চলে যাবার আগে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়ালেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, 'সন্ধ্যায় আসেন না আমার বাসায়। চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে'।

প্রথম পরিচয়েই ভাইকে এত ভালো লাগল যে, আগেপিছে কিছু না ভেবেই সম্মতি দিলাম। তখন বুঝতে পারিনি—এখন বুঝি যে ওই দাওয়াত স্রেফ চায়ের দাওয়াত ছিল না। ওটা কোনো খোশগল্প, ক্রিকেট, রাজনীতি, হলিউড-বলিউড, গিবত, কুটনামি বা বায়বীয় ফিলসফি ঝাড়ার আড্ডার দাওয়াত ছিল না। ওই সময়টাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার জন্যে বিশেষভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন—যেন, আমি আমার গোটা জীবনের দিকে ফিরে তাকাতে পারি। জীবনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করি, আর সে অনুযায়ী কর্মপন্থা স্থির করতে পারি। এটা তিনি (সুবহানাহু ওয়া তাআলা) সবার জন্যেই করেন। সবার জীবনেই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা বার বার ঘটে। তারপরেও সবাই তা থেকে শিক্ষা নেয় না। সে যাইহোক, কথামতো গেলাম সন্ধ্যাবেলা। আল-আমিন ভাই আমাকে এমনভাবে হাসিমুখে ঘরে এনে বসালেন, যেন তিনি আমার কতকালের বন্ধু! টুকটাক আলোচনার ফাঁকে আমাকে চা-নাশতায় ব্যস্ত রেখে একটা ডকুমেন্টারি ভিডিও অন করে দিলেন। এরপর আর কারও মুখে কোনো কথা নেই। ভিডিওটা আদনান ওকতার নামের একজন টার্কিশ লেখকের। যাকে অনলাইনে সবাই হারুন ইয়াহ্ইয়া নামে জানে। সেটা ছিল মায়ের পেটের ভিতরে ভ্রূণের জন্ম ও পরিপূর্ণ মানবসন্তান হয়ে বেড়ে ওঠার গোপন রহস্যের ভিডিও—যাকে বলা হয় অ্যাম্ব্রিওলজি। বিজ্ঞান তার সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে রহস্যগুলো জানতে পেরেছে মাত্র অর্ধশতাব্দী বা তারও কম সময় আগে, সেই একই রহস্য নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা আছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হওয়া কুরআনে। এই ভিডিওতে মানবজন্মের প্রতিটা স্টেজ এবং সে সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনাগুলো যেন চোখে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভিডিওর ডেসক্রিপশন আর কুরআনের আয়াত যখন মিলে যাচ্ছিল, আমি তখন যেন অন্য কোনো দুনিয়ায়। আমার গায়ের লোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠছিল। কারণ, আমি জানি—এই কুরআন কখনো পরিবর্তন হয়নি। এমনকি একটা দাঁড়ি-কমাও নয়। আমাকে এর আগে কেউ এভাবে কুরআনের কোনো আয়াতকে ব্যাখ্যা করে শোনায়নি। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, অলৌকিকত্ব, এর গভীরতা, এর প্রজ্ঞা,

Scanned with CamScanner

এর রচনাশৈলী কখনোই আমি দেখিনি এর আগে। সুবহানাল্লাহ্! যেহেতু এর প্রতিটি আয়াত নাজিল হয়েছে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে, তাই এর কোথাও কোনো ভুল থাকা সম্ভব নয়।

অতএব, কুরআনে বর্ণিত বিচার দিবস, জান্নাত, জাহান্নাম, সৎকাজের পুরস্কার, পাপকাজের শাস্তি—এগুলো সবই সত্যি। আমার পাপের পাহাড়ের দিকে পিছু ফিরে আতঙ্কিত বোধ করলাম। কাঁদলাম, তওবা করলাম আর শপথ করলাম—শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আর একটা ফরজ সালাত বাদ দেবো না। তারপর? তারপর শুধু ত্যাগ আর যোগের ইতিহাস। কুরআন আর সুন্নাকে একটু একটু করে জানতে চাওয়ার ইতিহাস। এগুলো ভালোলাগার ইতিহাস, ভালোবাসার ইতিহাস। এটাই আমার হুজুর হবার ইতিহাস।

Scanned with CamScanner

গল্পটা হাসি-কান্নার

শিহাব আহমেদ তুহিন, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ছোটবেলা থেকেই আমি ছিলাম প্রচণ্ড জেদী ছেলে। বাবাকে হারিয়েছিলাম খুব অল্প বয়সে। একটা সময়ে আমাদের ছিল খুব টানা-পোড়নের সংসার। সে সময়ে কত রকম বায়না ধরে যে মাকে বিপাকে ফেলেছিলাম! মনে হলেই লজ্জা লাগে।

খুব ইমোশোনাল ছিলাম। এত আবেগ দিয়ে নাকি জীবন চলে না। কখনো যুক্তি কিংবা ফলাফল বিচার করে কোনো কাজ করতাম না; বরং কাজ শেষ হলে নিজেই সে কাজের পিছনে একটা যুক্তি দাঁড় করাতাম। ছেলেবেলা মানেই ছিল ক্রিকেট খেলা। স্কুলে না গিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখা। তারপর কৈশোর এলো। এক রাশ আবেগ এসে ভর করল। কোনো একজনকে অজানা কারণে মনে ধরল। কিন্তু বেশ ভালোমতোই জানতাম, পাহাড়সম লজ্জা নিয়ে কাউকে কিছু বলার সাহস আমার নেই।

হতাশ লাগত। জীবনের কোনো মানে খুঁজে পেতাম না। এরকম কত মনখারাপ করা রাত হুমায়ুন আহমেদ-জাফর ইকবালের বই, রবীন্দ্রনাথের *গীতি-বিতান* পড়ে পড়ে শেষ করেছি—তার ইয়ত্তা নেই। কত রাত কল্পনার ডানায় ভর করে ডায়েরি লিখে শেষ করেছি সেটার হিসেবও আমার কাছে নেই। আমার ক্লাসমেটদের উপন্যাসের বই গিফট করতাম। *মেঘ বলেছে যাব যাব* উপন্যাসটা কত্তো ছেলেকে যে পড়িয়েছিলাম। হুমায়ুন-সাহিত্য চিন্তা-চেতনায়, কথায়-কাজে হেঁয়ালিপনা এনে দিল। পরে জানতে পারলাম, জীবন নাকি এত হেঁয়ালিতেও চলে না।

ছিলাম আর দশটা ছেলের মতো। একেবারেই সাধারণ। আলাদা করে চোখে পড়ার মতো কিছু আমার কখনোই ছিল না।

Scanned with CamScanner

ক্লাস টেনে থাকতে ডিসকভারি চ্যানলে স্টিফেন হকিং-এর একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম। তার সহজ যুক্তিগুলো খুব ভালো লাগত। বাহ! এত সুন্দর করে বিজ্ঞান বোঝানো যায়! বিজ্ঞানের প্রতি কিছুটা ভালোবাসা সৃষ্টি হলো। কিন্তু মাঝখান দিয়ে চিড় ধরল আমার ঈশ্বরবিশ্বাসে। আধুনিক এস্ট্রোনমাররা যা করেন স্টিফেন হকিংও তাই করলেন।তিনি বিজ্ঞানের মাঝে খুব সূক্ষ্মভাবে নাস্তিকতা ঢুকিয়ে দিলেন। সেসময়ে তার বলা সবকিছু বুঝে ফেলেছিলাম—এমনটা দাবি করব না। আর "ঈশ্বর বলতে কেউ নেই"—এটাও তিনি আমাকে পুরোপুরি বোঝাতে পারেননি। আসলে বিজ্ঞান দিয়ে পুরোপুরি বোঝানো সম্ভবও না। তবে সন্দেহ জিনিসটা খুবই দূষিত। একবার ঢুকে গেলে সহজে আর বের হতে চায় না।

সেই দূষিত দেহ আর মন আমাকে টানা দুইমাস মসজিদের চৌকাঠ মাড়াতে দেয়নি। জুমআর নামাজ পর্যন্ত পড়িনি। মা জুমআর দিন হালকা বকাবকি করে থেমে যেতেন। কিন্তু বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন কখনোই হইনি। মনের এই অবস্থার কথা পরিবারের কারও সাথেই সেভাবে শেয়ার করিনি। ক্লাসমেটদের অনেককেই জিজ্ঞেস করতাম, "প্রমাণ করতে পারবা, ঈশ্বর আছেন?"

সবাই চোখ বড় বড় করে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। কেউ হয়তো রসিকতা ভেবে হাসত। ক-দিন পর এসএসসি দিবে এমন ছেলের মুখে এধরনের প্রশ্ন শুনতেও তো অদ্ভুত লাগে।

তবে আমি সবসময়ই স্রষ্টাকে জানার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে রেখেছিলাম। আর সেসময়েই হঠাৎ আমাদের ক্যাবলে নতুন একটা চ্যানেল যুক্ত হলো—'পিস টিভি বাংলা'। আমার এখনো মনে আছে, যত যাই হোক, যত পরীক্ষাই থাকুক, কখনোই 'সত্যের উন্মোচন' আর 'সম্মুখ সমরে' এই দুইটা অনুষ্ঠান মিস করতাম না। মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। মনে হলো, এত সুন্দর প্রজ্ঞাপূর্ণ জীবন-বিধান অবশ্যই একজন স্রষ্টা পাঠিয়েছেন।

একসময় ভালো লাগা শুরু হলো ধর্মের প্রতি। পরিচিত হলাম কিছু ভাইয়ের সাথে—যারা আমাদের দেশের প্রচলিত ধর্ম-মতকে উপেক্ষা করে বিশুদ্ধভাবে ইসলাম প্র্যাক্টিস করার চেস্টা করতেন। কিন্তু আমার আবেগ এসে আমার যুক্তিকে বাঁধা দিল। এত মুভি-গান, তাকে নিয়ে লেখা কবিতা-উপন্যাস সব শুধু ধর্মের কারণে ছেড়ে দিতে হবে? দাঁড়ি রাখতে হবে, টাখনুর উপরে কাপড় পরতে হবে, এই করা যাবে না, সেই করা যাবে না—এত কিছু মানা সম্ভব?

Scanned with CamScanner

কিছু সময় থমকে থাকলাম।

কলেজ লাইফে ইচ্ছা করল পুরো কুরআনের বাংলাটা পড়ে দেখতে। কুরআন পড়ার সময় যে বিষয়টা আমাকে নাড়া দিত, সেটা হচ্ছে 'থট প্রসেস'। কোনো আয়াত পড়ে আমি যখন তা নিয়ে চিন্তা করতাম, তারপরের আয়াতেই দেখতাম আল্লাহ্ তাআলা বলছেন, "তোমরা কি ভাব যে..." - বলেই যেন আমার ভাবনাটাকে কোট করে দিলেন! কী আশ্চর্য! 'আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন'- এর সেই বাংলা অনুবাদের কাছে আমি আজীবন ঋণী থাকব। এটি আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে। বেঁচে থাকার একটা মানে দিয়েছে। আমার ভেতর তৈরি করেছে জানার স্পৃহা।

একসময় টেবিলের তাকে *মেঘ বলেছে যাব যাব, গীতিবিতান*-কে সরিয়ে জায়গা করে নিল হাদিসের বইগুলো। তারপরের পথ ছিল কণ্টকময়। সেটাও পার হয়েছে আশা-হতাশার দোলাচলে।

কেউ যখন প্রথম ইসলাম প্র্যাক্টিস করা শুরু করে, তখন তার ইমানের লেভেল অনেক হাই থাকে। একসময় পরিবেশ ও সঙ্গের দোষে ইমান উঠা-নামা শুরু করে। মাঝে মাঝে সে নিজেই এমন কাজ করা শুরু করে যেটা সে প্রথম অবস্থায় চিন্তাও করতে পারত না। ব্যাপারটা এমন কখনোই না যে, আজ থেকে সে ইসলাম প্র্যাক্টিস করা শুরু করল, আর তারপর কখনোই তাকে কোনো পাপ-পঙ্কিলতা স্পর্শ করবে না। সে একদম মাসুম হয়ে যাবে। পথটা সরল। কিন্তু নফস, এই সমাজ,বার বার তাকে হোঁচট খাওয়ায়। কিন্তু তাও সে উঠে দাঁড়ায়। পদস্খলন ঘটে। তারপরেও সে থাকে স্রষ্টার দয়াপ্রার্থী। তিনি তো বলেছেন, আকাশসম গোনাহ নিয়েও ক্ষমা চাইলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

মাঝে মাঝে নেটে বসে ক্লাসমেটদের ফ্যান্টাসিতে ভরা জীবনটা দেখি। বান্ধবীদের নিয়ে রসালো স্ট্যাটাস, মুভি নিয়ে রিভিও। শুধু 'চিল' করার জীবন। আল্লাহ্ চাইলেই আমাকেও সেখানে রাখতে পারতেন। এটা ভেবে নিজের হতাশ জীবনে এক চিলতে আলো খুঁজতে চেষ্টা করি।

আমি নিজেকে ট্রুথ সিকার ভাবতে ভালোবাসি। ভালোবাসি তাদের যারা সত্যকে হৃদয় দিয়ে খুঁজে। হোক সে আস্তিক বা নাস্তিক—সত্য খোঁজার চেষ্টা করলে, হৃদয় দিয়ে চাইলে, আল্লাহ পথ দিয়ে দেন। কেউ তাঁর দিকে এক হাত অগ্রসর হলে তিনি তার দিকে দু-হাত অগ্রসর হন। কেউ তাঁর দিকে হেঁটে আসলে তিনি তার দিকে দৌড়ে আসেন।

Scanned with CamScanner

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, আমি মুসলিম কেন? তবে বলব—আমি নাস্তিক নই; কারণ, আমি বিশ্বাস করি না—এই অসীম মহাবিশ্ব শূন্য থেকে কোনো বাহ্যিক ফোর্স ছাড়া আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েছে। এত সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিক মহাবিশ্ব কোনো স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, সেটা বিশ্বাস করতেও আমার কষ্ট হয়। আমি খ্রিস্টান নই; কারণ, আমি বিশ্বাস করি না, একজন মানুষ ঈশ্বরের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারেন, আর তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের পাপের ভার বহন করতে পারেন। আমি ইহুদিও নই; কারণ আমি মনে করি না, স্রষ্টার ধর্ম কোনো গোষ্ঠীর বাপ-দাদার সম্পত্তি। ভিন্ন জাতির কারও তাতে প্রবেশে এত বাধা থাকবে। একেশ্বরবাদী রিলিজিওন হিসেবে এরপর বাকি থাকে কেবল ইসলাম। যেটা আমার কাছে অন্য যে কোনো ধর্মের চেয়ে রেশনাল মনে হয়েছে।

যারা ভাবে—'ইসলাম পালন করলে আমার হাতে এক লম্বা হারামের লিস্ট ধরিয়ে দেওয়া হবে—এই করা যাবে না, ওই করা যাবে না, জগতের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হবে'—তাদের জন্য কিছু কথা বলে শেষ করি। কারণ, আমি বেশ লম্বা একটা সময় এই ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলাম। আমরা যেমনটা ভাবি—ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও সেরকম না।

এখানেও আনন্দ আছে। কান্না আছে। একটু সময় দিন। আসমান ও জমিনের রবকে একান্তে ডাকুন। একসময় মনে হবে, চোখের পানি কি এতই সস্তা যে, উপন্যাসের বই কিংবা মুভির সিন দেখে কাঁদতে হবে? কাঁদতে যদি হয়, তো কত সত্যি গল্পই সামনে পড়ে আছে। মুসআব ইবনে উমাইরের রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর গল্প, খুবাইবের রাজিয়াল্লাহু আনহু-এর গল্প, আহমেদ ইবনে হাম্বলে রহ.-এর গল্প, উমার মুখতার রহ.-এর গল্প। এ এক লম্বা লিস্ট। সবার জন্য এক রাত করে কাঁদলেও মনে হয় জনম শেষ হয়ে যাবে। শত মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের কারণেই আমরা আজকের ইসলামকে পেয়েছি।

এগুলো তো কষ্টের কথা। আনন্দের কিছু কি নেই?

হ্যাঁ আছে, থাকবে না কেন? সেটাও এক লম্বা লিস্ট। বর্ষার দিনে আনন্দ করে বৃষ্টিবিলাস করলে, খালি পায়ে হেঁটে হিমুগিরি করলে সেটাও সওয়াবের খাতায় লেখা হয়। যদি তা আল্লাহর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবেসে করা হয়ে থাকে। একইভাবে পূর্ণিমার রাতে প্রিয়তমাকে নিয়ে ঘুরতে যাওয়া, তাকে

Scanned with CamScanner

চিমটি দিয়ে দুজনে মিলে দৌড়াদৌড়ি করা, তার দিকে প্রেমময় দৃষ্টিতে তাকানো, তাকে জড়িয়ে ধরা—সবই ইবাদতের অংশ। যদি তা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আপনি যা যা ছাড়বেন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার চেয়ে অনেক উত্তম কিছু দান করবেন। গান শোনা ছেড়ে দিলে তিনি আমাদের অন্তরে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দেবেন। আফাসির কণ্ঠে সুরা মুলকের সামনে কি এই পৃথিবীর কোনো সঙ্গীত দাঁড়াতে পারবে? মনে হয় না। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হারাম রিলেশান ত্যাগ করলে তিনি পবিত্র কারও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের জীবনটাকে রাঙিয়ে দেবেন।

আমাদের জীবনটা খুব ছোট। যেন শুরু করার আগেই শেষ। এ জীবনে আমরা কেন এসেছি, কী করছি, কোথায় বা যাচ্ছি—এই চিন্তাগুলো করা খুব জরুরি । কিন্তু আমরা তা করি না। আমাদের ভয় হয়—যদি নির্মম কোনো সত্য বের হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এই দুনিয়ার মোহ আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে।

আচ্ছা, জীবন মানে আসলে কী? ক্যারিয়ারের পিছনে ছুটতে ছুটতে অর্ধেক জীবন শেষ করে দেওয়া, স্ত্রী আর ছেলে-মেয়েদের পিছনে বাকিটুকু শেষ করে দেওয়া, তারপর বৃদ্ধবয়সে হুইল চেয়ারে বসে না মেলা জীবনের হিসেব মিলাতে মিলাতে কবরে চলে যাওয়া? এটার মানেই কি জীবন? এর জন্যেই কি আমরা পৃথিবীতে এসেছি? শুধু বেঁচে থাকার জন্য, নিজের জীনটাকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যে জীবন, সে জীবন তো কুকুরও বাঁচে, শেয়ালও বাঁচে।

সত্য বোঝার চেষ্টা না করলে মানুষ আর দুপেয়ে জন্তুর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে কি?

Scanned with CamScanner

ফিরে পাওয়া গুপ্তধন

ফয়সাল বিন আলম (তারেক), টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার (বুটেক্স), এমবিএ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

জীবনের গল্প সাহিত্যিকদের কল্পনাকেও হার মানায়। গল্প, উপন্যাস, নাটকের কাহিনির সাথে জীবনের খুব বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায় পৃথিবীর বহু আলোচিত গল্প , উপন্যাস, সিনেমার রসদ 'জীবন থেকে নেওয়া'।

ঢাকা শহরের একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ঘরে ঘরে তখন আধুনিকতার সাথে তাল মেলানোর প্রাণান্ত চেষ্টা। আমরাও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না। যদিও আমাদের ছোটবেলায় গ্যাজেট, ইন্টারনেটের এত প্রচার-প্রসার ছিল না তবে ঘরে ঘরে টিভি, ভিসিআর, অডিও প্লেয়ার, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিডিও গেমসের দোকান এসব ঠিকই ছিল।

মা, বাবা আর দু'বছরের ছোট বোন—এই ৪ জন মিলে আমাদের ছোট পরিবার। পরিবারের একমাত্র ছেলে হিসেবে এবং বৃহৎ পরিবারের 'বড় মিয়ার বড় ছেলে' হিসেবে আত্মীয়-স্বজনের কাছ আদর-আত্তির কোনো কমতি কখনোই ছিল না।

মুসলিম পরিবারে জন্মানোর সুবাদে আরবি শেখা, কুরআন খতম করা—এসব কমন ব্যাপার আমাদের ক্ষেত্রেও ছিল, সন্তানদের নামাজের ব্যাপারেও তারা অসতর্ক ছিলেন না। তবে এই ইসলাম সম্পর্কে জানা কিংবা জানানোর পুরো প্রক্রিয়াটাই ছিল প্রচলিত সামাজিক গন্ডিতে আবদ্ধ। আরবিতে অজুর লম্বা দোয়া, নামাজের নিয়ত শিখতে হয়েছে; আমার নামাজের সাথে বোনের নামাজের পার্থক্য করা হয়েছে, *মকছুদুল মোমেনিন* ঘরে ইসলামের আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে! পরিবারে ইসলামের চর্চা ভালোই ছিল—তবে তা এডজাস্টেড। মডারেট মুসলিম

Scanned with CamScanner

হিসেবে আমরা নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি আবার নাটক, সিনেমাও দেখেছি, ধুমধাড়াক্কা গানের তালেও নেচেছি। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং উপলব্ধির দৈন্য আমাদেরকে হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করতে দেয়নি।

ছোট্ট বয়স থেকেই পড়াশোনার ব্যাপারে যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেই যে শিশু শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে স্কুলে ঢুকেছিলাম, এরপর পুরো স্কুল লাইফে কেউ আমাকে আর প্রথম স্থান থেকে সরাতে পারেনি। ফার্স্ট বয় এন্ড ফার্স্ট ক্যাপ্টেন হওয়াটা এক প্রকার রেগুলার প্র্যাকটিস হয়ে গিয়েছিল।

রেজাল্টের পর একবার এক স্কুলফ্রেন্ড প্রশ্ন করেছিল—'তোর কি পড়াশোনা করতে এতই ভালো লাগে?'

- আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলাম—'না'

- 'কী কস? পড়তে ভালো না লাগলে কেউ বার বার ফার্স্ট হয় নাকি?'

মুচকি হেসে বলেছিলাম—'আমি ফার্স্ট হই আমার আম্মাকে খুশি করার জন্য'।

আসলেই তাই, আব্বা-আম্মার ধ্যান-জ্ঞ্যান যাবতীয় এটেনশানের কেন্দ্রেই ছিল আমাদের একাডেমিক রেজাল্ট—সেটাই ছিল প্রায়োরিটি, বাদ মে বাকি সাব।

আম্মা সুশ্রী ছিলেন, স্কুলের বৈতরণী পার করেই আব্বার সাথে বিয়ে হয়ে যায়, ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর আমি চলে আসায় আর কন্টিনিউ করতে পারেননি—আমাকে নিয়েই তখন রাজ্যের ব্যস্ততা। আমি যখন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দিচ্ছি ঠিক তখন আম্মা ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছেন, দুজন একসাথে রাত জেগে লেখাপড়া করছি—সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!

তবে এসব আমাদের শৈশব বা কৈশোরের বিনোদনে বড় দাগে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। আম্মা উত্তম-সুচিত্রার অন্ধভক্ত ছিলেন, আমাদের বাসায় বিশাল লম্বা এন্টেনা লাগানো হয়েছিল যাতে কলকাতার বাংলা চ্যানেল, দুএকটা হিন্দি চ্যানেল টিভিতে দেখা যায়। সে সুবাদে হিন্দি ভাষায় হাতেখড়ি ছোটবেলা থেকেই, ইংরেজি ভাষার বহু আগেই হিন্দিতে কথা বলতে পারি, সব কথা বুঝতে পারি! সময়ের সাথে সে অনুরাগ বলিউডি গান আর সিনেমার প্রতি আসক্তিতে রূপ নিয়েছে। খান সাহেবদের মুভি রিলিজ হয়েছে কিন্তু দোকান থেকে ক্যাসেট ভাড়া করে এনে তা বাসার সবাই (আব্বা ছাড়া) মিলে দেখা হয়নি, এ.আর.রহমান সাহেবের নতুন এ্যালবাম বের হয়েছে কিন্তু সংগ্রহ করা হয়নি—এমন নমুনা কম। এদেরকে তখন

Scanned with CamScanner

মনে হতো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত(!) যারা কিনা নিজের যোগ্যতা দিয়ে শুধু ভারত না, প্রায় সারা বিশ্বই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে!

গল্প-উপন্যাস পড়ার দিকে ঝোঁক কৈশোর থেকেই। তারুণ্যে হুমায়ূন আহমেদ বলতে তো অজ্ঞান। তাকে মানুষ কম, ম্যাজিশিয়ান বেশি মনে হতো। সত্যি বলতে কি, যৌবনে যতবার বই কেনার জন্য বইমেলায় গিয়েছি—প্রত্যেকবার প্রথম টার্গেটই ছিল তাঁর বই কেনা। এছাড়াও ব্যক্তি হিসেবে তাঁর একাডেমিক এক্সিলেন্স, মাল্টিডাইমেনশনাল কোয়ালিটি—এসব তাঁর প্রতি ভক্তিকে দিনকে দিন কেবল প্রলম্বিত করেছে।

এছাড়াও সুনীলের *সেই সময়*, সমরেশের *উত্তরাধিকার*, *কালবেলা*, *কালপুরুষ*, *মাধবীলতা*; শীর্শেন্দুর *পার্থিব*—এসব ছিল অলটাইম ফেবারিটের তালিকায়। বিশাল বিশাল উপন্যাস গিলেছিলাম গোগ্রাসে। এসব বই, মুভি, গান 'উদারপন্থী, আধুনিক, রোমান্টিক' বানানোর বাহানায় কখন যে আমাকে মৌলিক ইসলাম থেকে কত দূরে সরিয়ে দিয়েছে সে হুঁশ তো আর তখন নেই।

মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই আমি বেশ সংস্কৃতিমনা, সঙ্গত পারিপার্শ্বিক কারণেই। সবসময়ই চাইতাম বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে। নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে স্কুলে বড় পরিসরে একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের সূত্রপাত করেছিলাম। নটরডেম কলেজে পাঁচটা ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিলাম—যার মধ্যে নাট্যদল, আবৃত্তিদল ছিল আমার কাছে মুখ্য। কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে থাকতেই ভিকারুননেসার মেয়েদেরকে সাথে নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে তিন ঘণ্টাব্যাপী 'সাংস্কৃতিক শো' এর আয়োজন করেছিলাম। বুটেক্সে (তখন ঢাকা ভার্সিটির অধিভুক্ত কলেজ ছিল) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তির পর সুযোগ-সুবিধার অভাবে সাংস্কৃতিক চর্চা সীমিত হয়ে ডিবেট, সামাজিক সংগঠন এসবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর বুটেক্স থেকে বের হয়েই দেশসেরা ডিবিএল গ্রুপের নিটিং ইউনিটে চাকরির প্রস্তাব পেয়ে সাথে সাথেই তা লুফে নেওয়া। তখন ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত টেক্সটাইল প্রকৌশলী মাত্রই গণবিচ্ছিন্ন একজন মানুষ, যে সময়ের অভাবে বিয়ে করারই সাহস জুগিয়ে উঠতে পারে না, ফেসবুক থাকলেও লগ ইন করার ফুরসত পায় না; সামাজিক—সাংস্কৃতিক একটিভিটি তো অনেক পরে!

দেড় বছর চাকরি করে হাঁপিয়ে উঠলাম, প্রোডাকশনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকা

Scanned with CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ ইভিনিং প্রোগ্রামে 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস' ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়ে গেলাম। ঢাকা ভার্সিটিতে গিয়ে সংস্কৃতিমনা যুবকের পালে আবার হাওয়া লাগল, ভিতরের জমে থাকা বারুদ জ্বলে উঠল। আবার কালচারাল প্রোগ্রাম, আড্ডা, ফ্রি মিক্সিং, বন্ধু-বান্ধবীদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো...কিছুদিনের মধ্যেই নাট্যজগতে ভালোভাবে ঢুকে যাওয়া, একটা নাট্যদলের সাথে যুক্ত হয়ে শিল্পকলা একডেমিতে নিয়মিত রিহার্সাল, স্টেজ পারফরমেন্স।

ইংরেজি বর্ষের ১ম দিন নিজের বার্থডেটা আসলে ফেসবুক ওয়ালের দিকে তাকালে মনে হতো আমিই বাদশাহ। রাত বারোটা বাজার সাথে সাথে কে আগে উইশ করবে—তা নিয়ে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যেত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে পাঁচ ওয়াক্ত কম্পোলসারি নামাজ তখন আমার কাছে অপশনাল, সময়-সুযোগ পেলে পড়ব—এই টাইপ।

এদিকে লেকচারার হিসেবে জয়েন করলাম একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে। বনানীতে ক্যাম্পাস, বেশ রিলাক্সড জব—ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম। নিজের ক্লাস লেকচারেও তখন 'মানবতাবাদী' হওয়ার টনিক যাতে সেক্যুলার আদর্শের ছটা থাকলেও ইসলামিক আদর্শের লেশমাত্র নাই! অন্যদিকে কয়েকজন পার্টনার মিলে আমরা ততদিনে একটা 'প্রোডাকশন হাউজ' দিয়ে বসে আছি।

একদিনের ঘটনা। আমাদের প্রোডাকশন থেকে একটি নাটকের শুটিং চলছে। নাটকে বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় তারকা। হিরোইন যে, সে ঠিক সেই সময়টায় ছোট ও বড় পর্দা মিলিয়ে জনপ্রিয়তার একেবারে তুঙ্গে। তাদের সাথে আমিও আছি একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। অচিরেই সেলিব্রেটি হয়ে যাচ্ছি—মাথায় এমন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

সারাদিন শুটিং হয়েছে, রাতেও চলছে। লোকেশন আশুলিয়া বেড়িবাঁধের কাছাকাছি শুটিং স্পট। রাত ৯টা। হিরোইনের সাথে শট—আমার শেষ শট। অল্প সময়েই শেষ হলো—আজকের মতো আমাদের ঝামেলা শেষ। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। কিন্তু নায়িকার মধ্যে কোনো তাড়াহুড়া দেখতে পেলাম না। একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম—

- 'আপনার ছেলে-মেয়ে নেই'?

- 'হ্যাঁ, আছে তো একটা পিচ্চি—ছেলে।'

Scanned with CamScanner

- 'ও এখন কার কাছে? কে দেখছে ওকে?'

- 'আম্মা আছে, কাজের মেয়েরা আছে। কল এসেছিল বেশ কয়েকবার, কান্নাকাটি করছিল।'

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম—'ছোট বাচ্চাকে ফেলে সারাদিন, আমাদের সাথে এত রাত পর্যন্ত শুটিং করলেন, যখন শুনলেন কান্নাকাটি করছে...চলে গেলেন না কেন?'

আমার কথা শুনে সে এমনভাবে তাকাল যেন সে কোনো আশ্চর্য কথা শুনল। নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল—'এটা তো রেগুলার ব্যাপার, আর আমরা প্রফেশনাল। এসব ঠুনকো ইমোশন পাত্তা দিলে আজকে এ পজিশনে আসতে পারতাম না'।

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, কেউ যেন আমার কানে সীসা ঢেলে দিল। একজন মায়ের মুখে আমি এ কী শুনলাম?? বাসায় ফেরার পথে কথাটা বার বার আমার কানে বাজতে লাগল। বাচ্চার কান্নারত চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল—আমার মনে হলো, ওদের এই কষ্টের জন্য আমিও দায়ী। আমার নাটকের শুটিং করতে গিয়েই তো ওদের মা এত রাত পর্যন্ত বাইরে, এর ফাইন্যান্স তো আমার প্রোডাকশন হাউজ থেকেই হচ্ছে!

গত কয়েক বছরের টুকরো টুকরো আরও নানা ঘটনা, মিডিয়ার জানা কিংবা শোনা কাহিনিগুলো মনে পড়তে লাগল। বুঝে গেলাম—এটা নষ্টদের জায়গা, নষ্ট হওয়ার জায়গা, নষ্ট করার জায়গা—এরা সেলিব্রেটি হওয়ার ধান্দায় বাহিরে 'সুখী মানুষ, মহৎ মানুষ'—এসব সাজলেও ভিতরে ভিতরে আর মানুষ থাকে না।

ধাক্কাটা খুব জরুরি ছিল। ভেতরে জেদ চেপে গেল। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিলাম—প্রোডাকশন থেকে বেরিয়ে যাবো। মিডিয়াতে আর কোনোদিন এক পয়সাও বিনিয়োগ করবো না। খুব ভালো হয় যদি এই নাটকটাও প্রচারিত না হয়। কিছু ক্ষতি না হয় হবে—হোক।

মহান আল্লাহ্‌র কী অসীম লীলা! চ্যানেলের সাথে কি এক ঝামেলায় নাটকটা শেষ পর্যন্ত টেলিকাস্ট হলো না। আমি বেরিয়ে আসার কয়েক মাস পরেই প্রোডাকশন হাউজটাও বন্ধ হয়ে গেল—আলহামদু লিল্লাহ্‌।

এটা তো গেল মিডিয়া থেকে বেরিয়ে আসার, মিডিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার গল্প।

Scanned with CamScanner

কিন্তু আমার ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক লাইফস্টাইল?

তবে হ্যাঁ, আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে নানাবিধ হারামের মধ্যে ডুবে গেলেও চারিত্রিক স্খলন ঘটেনি কিংবা কোনো বড় ধরনের ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়িনি। হালাল অর্থের বদৌলতেই বোধ করি হয়নি। বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন টিসিবি'তে। সুদীর্ঘ চাকরি-জীবনের সীমিত আয়ে খারাপ ছিলাম না। তবে বাহুল্যের অবকাশও খুব একটা ছিল না। আর্লি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে ২০০০ সালে যখন নিউইয়র্ক চলে যান তখন আমি পড়ি ক্লাস টেনে, সেখানে তিনি ছিলেন টানা ৮ বছর। ফিরে এসেই বাড়ির কাজে হাত দেওয়া, বোনের বিয়ে এসব।

টিউশনি করতাম কলেজ লাইফ থেকেই, টাকার প্রয়োজনে না—ভালো লাগত বলে করতাম। ব্যবসার প্রতিও ঝোঁক ছিল, কলেজ লাইফ থেকেই প্রাইমারি, সেকেন্ডারির শেয়ার ব্যবসায় যুক্ত ছিলাম, অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী হলেও বরাবরই আল্লাহ্ বড় ধরনের লোকসানের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এমবিএ শেষ করে ২০১৩ তে এসে নিজের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে ফেললাম যাকে আরও ৮ বছর আগে থেকেই চিনি। জাহেলি কায়দায় বেশ ধুমধাম করেই বিয়ে হলো। ছবি ফেসবুকে দিয়ে লাইক আর কমেন্টের বন্যায় ভেসে যাওয়া, মেকি আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা। বিয়ের পর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়া শুরু হলো। বিয়ের ঠিক পরপরই দেশের আরেকটি সুনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সিনিয়র লেকচারার' হিসেবে জয়েন করলাম।

আমার বিয়ের চার বছর আগেই বোনের বিয়ে হয়েছে, বোন তখন ফাইনাল ইয়ার মেডিকেল স্টুডেন্ট, হাজবেন্ডও ডাক্তার। ভগ্নিপতি সুমন ভাইয়ের মধ্যে ইদানিং বেশ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ইসলামিক বই, লেকচার শোনার প্রবণতা, দাড়ি রাখার ইচ্ছে এসব। একদিন আমাদের বাসায় বেড়াতে এসে তিনি সবাইকে নিয়ে একসাথে বসে ড. তৌফিক চৌধুরীর একটা ভিডিও লেকচার ছেড়ে দিলেন। সাড়ে ৩ ঘন্টার একটা ভিডিও লেকচার—টপিক 'জার্নি টু দ্য হেয়ার আফটার'।

যে কোনো মুসলিমকে নাড়া দেওয়ার মতো একটা লেকচার। জুমআর খুতবা কিংবা ওয়াজ—জীবনে তো কম শুনিনি (খিলক্ষেত থেকে পল্টন ময়দানে গিয়েও ওয়াজ মাহফিলে অংশ নিয়েছি), কবর-জান্নাত-জাহান্নাম নিয়ে আলোচনাও কম শোনা হয়নি; কিন্তু এই লেকচারটা যেন সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

Scanned with CamScanner

লেকচারটা আম্মার এত ভালো লেগেছিল যে—প্রায়ই দেখতে চাইতেন। আর ল্যাপটপের অপারেটর হিসেবে আমাকেও থাকতে হতো। আমারও ভালো লাগত—নতুবা কে এসব নিয়ে সাড়ে ৩ ঘণ্টা বসে থাকে?

তৌফিক চৌধুরীর প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হলো—একজন ডাক্তার, অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গায় হসপিটালে যিনি কাজ করেন, তিনি সে সব ছেড়ে কী কারণে মদিনায় গিয়ে আরবি শিখে মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন, এরপর আবার 'মার্সি মিশন' এর মাধ্যমে দাওয়াহ এর কাজ শুরু করলেন—তা একটু বোঝার চেষ্টা করলাম। তার অন্যান্য লেকচার শোনার আগ্রহ তৈরি হলো। এই ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেশবরেণ্য অন্যান্য স্কলার যারা আছেন, তাদেরও কিছু কিছু লেকচার শুনতে লাগলাম। ইসলামিক বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ল। টের পেলাম, এতদিন যে ইসলামের অনেক কিছু জানি বলে ভাবতাম, প্রথমত তা ভুল এবং দ্বিতীয়ত তাতে অনেক ভেজাল আছে। সঠিক রেফারেন্সের আলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে ঠিকঠাক মতো জানি এমন জিনিস খুব কমই আছে।

ইতিমধ্যে আইসিডি'র আয়োজনে গুলশানের ইমানুয়েলস সেন্টারে একদিন এক দিনব্যাপী সেমিনারে অংশ নিলাম সুমন ভাইয়ের অনুরোধে । টপিক—ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে, বক্তা—ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ এবং ড. মোহাম্মাদ মানজুর ই ইলাহী। সেমিনার নারী-পুরুষ সকলের জন্যই কিন্তু নারীদের জন্য পর্দার আড়ালে পৃথকভাবে বসার, প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা আছে। অনুষ্ঠানের বেশির ভাগ শ্রোতাই যুবক, তরুণ—আমার চেয়ে কম বয়সী অনেকেই আছে। প্রায় সবার পরনে পাঞ্জাবি—পায়জামা, অধিকাংশের মুখে দাড়ি, মেয়েদের সবাই বোরখা—এমনকি মায়েদের সাথে আসা ছোট মেয়েরাও। আমার পরনে শার্ট আর জিন্স—জীবনে প্রথমবারের মতো নিজেকে ও নিজের পোশাককে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ বেমানান মনে হলো!

দীন পালনে সচেষ্ট এমন বেশ কয়েকজনের সাথে পরিচিত হলাম, তাঁদের কেউ কেউ আমার চাইতেও ভালো পজিশনে আছেন, কেউ জব করছেন, কেউ বিজনেস কিন্তু তাদের সাধারণ বেশভূষা আর অসম্ভব আন্তরিকতা দেখে সেটা বোঝার কোনো উপায় নেই।

চিন্তা করলাম—আমি কোন গ্রহের আর এরা কোন গ্রহের? আমি যদি নিজেকে

Scanned with CamScanner

মুমিন দাবি করি তাহলে এরা কী? আমি ঠিক নাকি এরা ঠিক? যদি এরা ভুল না হয়ে থাকে তবে অবশ্যই আমি ভুল পথে আছি, আমাকে শোধরাতে হবে।

সামনে রমাজান মাস—একটা বড় সুযোগ। হুট করেই একদিন নিজের সবগুলো জিন্স, ট্রাউজার টেইলার্স থেকে লম্বায় ছোট করে ফেললাম। প্রথম প্রথম মানুষের চোখে তো বটেই নিজের কাছেও বেখাপ্পা লাগত তবে সেটা একটা জব্বর ডিসিশান ছিল—চাইলেও তখন আর ফেরার সুযোগ নেই।

রমজান শুরু হতেই ফরমাল প্যান্টগুলোকেও সাইজ করে ফেললাম, আর শেইভ করবো না সিদ্ধান্ত নিলাম—কাঁহাতক আর সারাক্ষণ হারামের মধ্যে ডুবে থাকা যায়? এভাবেই ২০১৪ সালের রমজান মাস থেকে টাখনুর উপর প্যান্ট পরা ও দাড়ি রাখার শুরু। যেটাকে প্রথমদিকে খুব দুঃসাধ্য কাজ মনে হয়েছিল, সেটা আল্লাহ্ একেবারে সহজ করে দিলেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য মানুষের বাঁকা চাহনি, তিতা কথা সহ্য করার মানসিক আত্মতৃপ্তিটাও বেড়ে গেল।

সে বছরই আব্বা-আম্মা হজ করে এলেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে এসে আমার বোন নাহিমা ও তাঁর হাজবেন্ড সুমন একপ্রকার হুট করেই ওই বছরেই হজে যাবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ফেলল। বোন ততদিনে পর্দা করতে শুরু করেছে কিন্তু তাই বলে এত অল্প বয়সে হজে যাচ্ছে কেন—সেটা বুঝতে পারলাম না। আমাদেরকে যখন বলল, তখন আমরা উল্টো তাদের যাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুললাম। বোঝাই যাচ্ছে, ইমানে তখনো দুর্বলতা আছে।

এপ্রিলে সুখবর পেলাম বোন সন্তানসম্ভবা, আমরা নিশ্চিত যে—ওদের যাওয়া হচ্ছে না। কিন্তু বোন নাছোড়বান্দা—সে যাবে। বোঝালাম যে, এই অবস্থায় কোনোমতেই যাওয়া উচিত না, দু'বছর পর আমরা সবাই একসাথে যাই, কিন্তু তার এক কথা—সে এ বছরই আল্লাহ্‌র ঘরে যাবার নিয়ত করেছে, আল্লাহ্ই দেখবেন। আমরা সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম।

সুমন ভাই কয়েকজন স্কলারের পরামর্শ নিলেন, তারা বললেন এ অবস্থায় না যাওয়াই উত্তম, তবে আরববিশ্বের মহিলারা প্রেগন্যান্ট অবস্থায় এবং ছোট ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে হরহামেশাই হজে যাচ্ছে। এবার তিনি রেগুলার চেকআপে থাকা গাইনি ডাক্তারের পরামর্শ চাইলেন—ম্যাডাম আবার আগের বছরই উমরাহ্ করে এসেছেন, তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন শুধু সতর্ক থাকতে বললেন। ফলে আর

কোনো বাধা রইল না। ওরা মানসিকভাবে হজের প্রিপারেশান শুরু করে দিল।

আমার তখন একটু একটু খারাপ লাগতে শুরু করেছে। একমাত্র ছোট বোন তার হাজবেন্ডকে সাথে নিয়ে এই অবস্থায় হজে চলে যাচ্ছে—আর আমরা পারলাম না! অন্তরের গহীন কোণের ইচ্ছেটা যিনি শোনার তিনি ঠিকই শুনে ফেললেন। জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন সুমন ভাই আমাকে ফোন করে বললেন, তাদের এজেন্সির হজের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা এক ব্যক্তি রোড এক্সিডেন্টের শিকার, ফলে তিনি ও তাঁর স্ত্রী এ বছর যেতে পারবেন না। ফলে রিপ্লেসমেন্টে দুইজন যেতে পারবে। আমি আর সাবরিন যেতে চাইলে সেদিনের মধ্যেই জানাতে হবে। শোনামাত্র আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল, শরীরের কম্পন বেড়ে গেল। আল্লাহ্ কি তার কুদরত দেখানো শুরু করে দিলেন? কিন্তু সাবরিন কি যেতে চাইবে? ও যেতে না চাইলে আমি কি একা যাবো? অনেক টাকার ব্যাপার—সেটারই বা কী হবে?

মনের মধ্যে টেনশন নিয়ে সাবরিন কে বললাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে ও এক কথায় বলল—'যাবো'।

- 'যাবা? কিন্তু কীভাবে? হুট করে এত টাকা কই পাবো?'

- 'আমার হজের টাকা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না—সেটা আমি ম্যানেজ করবো। তুমি শুধু তোমারটা রেডি করো'

আমার মনে হলো—এক পাহাড় সমান দুশ্চিন্তা নেমে গেল, আমার টাকা ইনশাআল্লাহ্ ম্যানেজ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ কি তাহলে সত্যিই আমাদের হজে নিয়ে যাচ্ছেন? আমার বোন, ভগ্নিপতির সাথে যাচ্ছি আমিও যাচ্ছি? ওকে দেখভাল করার সুযোগ পাচ্ছি?

আল্লাহ্র কী অপার মহিমা! একদম শেষ মুহূর্তের রিপ্লেসমেন্ট হাজি হিসেবে অনেক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেল। মসজিদুল হারামের হাতিমে বসে আব্বা-আম্মা তার পরিবারের বাকি সদস্যদের দ্রুততম সময়ে একসাথে হজের তাওফিক প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু সেটা যে এভাবে ঠিক পরের বছরই সত্য হয়ে যাবে—সেটা কে ভাবতে পেরেছিল?

সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখে ইহরামের উদ্দেশ্যে পরিহিত আবায়াই ছিল সাবরিনের জীবনে ১ম বারের মতো পরিহিত বোরখা। হজ-সফরে আমাদের সাথে ছিলেন

Scanned with CamScanner

শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম। এটাও আল্লাহ্‌পাকের এক বিশেষ নেয়ামত যে, এজেন্সি থেকে হজের সকল হুকুম আহকাম যথাসম্ভব সহিহ সুন্নাহ অনুযায়ী পালন করার চেষ্টা করা হয়েছে, ফলে কষ্ট হয়েছে; কিন্তু আফসোস থাকেনি। সেখানে গিয়ে আরও ঘনিষ্ঠভাবে শাইখের কাছ থেকে আরও অনেক কিছুই শিখতে পেরেছি।

৪৫ দিনের অসাধারণ সেই সফরে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন—চোখের সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপটাকে মানুষের লাইফস্টাইলে প্রতিফলিত হতে দেখা। ফেরার সময় জমজম পানি, খেজুর ছাড়াও আমার সাথে ছিল প্রায় ৫০ কেজি ওজনের বই যা হারামাইন ও বিভিন্ন দাওয়াহ সেন্টার থেকে সংগ্রহ করা এবং দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে কেনা।

সৌদি এয়ারলেন্সের ফিরতি ফ্লাইট। আমি আর সাবরিন পাশাপাশি বসে। দুজনই চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে আছি। বার বার কাবার চেহারা ভেসে উঠছে মনের পর্দায় আর চোখ সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আমার দিকে ফিরে ও বলল—'আমি কিন্তু গিয়ে জবটা ছেড়ে দেবো। ফ্রি মিক্সিং বন্ধ। এখন থেকে শুধু ঘর-সংসার করবো'

আমি পুরা থ' বনে গেলাম। ভালো করে তাকালাম ওর দিকে। দুর্দান্ত একজন স্টুডেন্ট, সারা জীবন স্কুলের ফার্স্ট গার্ল, প্রাইমারি ও জুনিয়র ট্যালেন্টপুল স্কলারশিপ, এসএসসিতে গোল্ডেন A+, ভিকারুননেসা থেকে এইচএসসিতেও গোল্ডেন A+, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি ডিপার্টমেন্ট থেকে অনার্স, মাস্টার্স করা একটা মেয়ে যার ক্যারিয়ার শুরু এপোলো হসপিটাল, তারপর স্কয়ারে হসপিটাল ফার্মাসিস্ট হিসেবে যথেষ্ট সুনামের সাথে যে কাজ করে আসছে, যার কিনা এখন ক্যারিয়ারের পিক টাইম চলছে—গ্রাফ উর্ধমুখী; ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ সচেতন, আশাবাদী একজন নারী—তাঁর মুখে হঠাৎ এই কথা।

ফেরার পর দ্রুত বেশ কিছু পরিবর্তন এসে গেল। আমার প্রমোশন হলো। সাবরিন ঠিকই ফিরে রিজাইন দিয়ে দিল। আমি বলেছিলাম, ফ্যাকাল্টি হিসেবে কোথাও জয়েন করে পরে ছাড়তে। কিন্তু সে দেরি করেনি। ২০১৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অফিস তাকে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছে।

আমি প্রতিবেশীদের নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে সাপ্তাহিক 'ইসলামিক আলোচনা' শুরু করলাম। ফেসবুকে টুকটাক দাওয়াহ-এর কাজ শুরু করলাম। আল্লাহ্ বরকত ঢেলে দিলেন—মার্চের ১ম সপ্তাহে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ চলে এলো। আমরা দুজনই

Scanned with CamScanner

কন্যা সন্তান চেয়েছিলাম, ২৭শে অক্টোবর আল্লাহ্ আমাদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত প্রথম সন্তান হিসেবে একটি কন্যা সন্তান দান করলেন। আমরা তাঁর নাম রাখলাম—'জুনায়রা'।

পরিশিষ্ট :

গুপ্তধন কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের কাছেই আছে। এর নাম 'ইসলাম'। আমাদের শুধু এর সন্ধান জেনে বের করে নিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন একটু অনুসন্ধান, অনুধাবন আর অনুসরণ।

ইসলাম যেটার অনুমতি দেয়নি সেটাকে যখন আমরা নিজেদের যৎসামান্য বিবেক বুদ্ধি খরচ করে নিজের জন্য জায়েজ প্রমাণের চেষ্টা করি—সেটা কেবল আমাদের জ্ঞানের দৈন্য ও দূরদর্শিতার অভাবে। আপনি আমি বার্ডস আই ভিউ মিস করলেও আরশের উপর যিনি আছেন তিনি ফর্মুলায় ভুল করেননি। আমাদেরকে তাই ফর্মুলাটা বুঝতে হবে আর বোঝার জন্য পড়তে হবে। আমাদের প্রতি এটাই কিন্তু আল্লাহর প্রথম আদেশ—'পড়ো'। অথচ আমরা কী করছি? আমাদের সমাজে কত পার্সেন্ট মুসলমান আছে—যারা পুরো কুরআন নিজের ভাষায় আদ্যোপান্ত বোঝার চেষ্টা করেছে, জানার চেষ্টা করেছে আল্লাহ্ তাকে কী বলতে চেয়েছেন? নামকাওয়াস্তে মুসলিম হয়ে আমরা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো কী করে?

হারিয়ে যাওয়া সুখ-শান্তির সন্ধান পেতে চাইলে আমাদের আল্লাহ্র পথে আসতে হবে, নিজেদের লাইফ স্টাইলে কুরআন সুন্নাহর প্রতিফলন থাকতে হবে। আল্লাহ্ জোর করে আমাদেরকে সঠিক পথে ফেরাবেন না, আমাদেরকে চাইতে হবে। আপনি সিনসিয়ারলি চাইলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই আপনাকে আর পথচ্যুত করতে পারবে না; কারণ, স্বয়ং আল্লাহ্ তখন আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন।

"যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[১]"

---

১ সহিহুল বুখারি ৭৫৩৬,৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭

চলতে ফিরতে যেমন দেখেছি

সাইফুর রহমান, পিএইচডি, মলিকুলার বায়োলজি, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি

অন্য আট-দশটা বাঙালি ছেলে যেভাবে বেড়ে ওঠে, সেভাবেই আমার বেড়ে ওঠা। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সন্তান হিসেবে উত্তরাধিকারসূত্রে যতটুক ধর্মীয় রীতি আর ধর্মবোধ আমার প্রাপ্য ছিল, ততটুকুই পেয়েছি। সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়ানো, টইটই করে এ মাঠ থেকে ও মাঠ দাপিয়ে বেড়াতে আমাদের কি আর জুড়ি থাকে?

জন্মসূত্রে মুসলিম পরিবারে জন্মেছি। আমাদের নামের আগে 'মোহাম্মদ', আর নামের শেষে 'খান' 'রহমান' ইত্যাদি পদবি দেখে মানুষ ঠিক ঠিক বুঝে নেয় যে, আমরা সাচ্চা মুসলমানের বাচ্চা। অথচ মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার করে আজান হয়, কিন্তু আমাদের আর মসজিদের আঙিনা মাড়ানো হয়ে ওঠে না। মসজিদটা কিছু মাদরাসা পড়ুয়া হুজুর, ইমাম আর এক পা কবরে দিয়ে বসা বুড়োদের জন্যই।

আমার বেড়ে ওঠাও এরকম। নামকাওয়াস্তে দীন পালন করা একটা পরিবেশে বড় হয়েছি। খুব ক্রিকেট পছন্দ করতাম। সারাদিন পড়ে থাকতাম ক্রিকেট মাঠে। সন্ধ্যার আগে ভুল করেও ক্রিকেট-মাঠ থেকে ঘরে ফিরতাম না। আমি কোনোদিনও আমার আম্মার হাতে নামাজে না যাওয়ার জন্য মার খাইনি। কিন্তু খেলার মাঠ থেকে সন্ধ্যায় ফেরার জন্য কত শত বকা যে আম্মা দিয়েছিল, তা এখনো দিব্যি মনে আছে। কেউ ভাববেন না যে, আমি ছোটবেলা থেকেই একেবারে ধর্মহীন ছিলাম। আমি কিন্তু এলাকার বাৎসরিক মিলাদ এবং ওয়াজ মাহফিলগুলোর একেবারে সামনের সারির শ্রোতা ছিলাম। আমার সেই ধার্মিকতা যতটা ধর্মের জন্য, তারচেয়ে বেশি বিরিয়ানির প্যাকেট পাওয়ার লোভ।

Scanned with CamScanner

তখন পড়ি ক্লাস নাইনে। কুরআন পড়তে জানি না। একটা সময়ে মনে হলো, - 'আরে! মুসলমান হয়ে কুরআনটাই যদি পড়তে না পারি, মুসলমানিত্বটাই বা আর থাকল কই?'

আমার এই ভাবনার উদ্রেক যতটা না আমার ধর্মীয় বোধের প্রকাশ থেকে, তারচেয়েও বেশি আমার মুসলমানিত্ব নিয়ে প্রেস্টিজ হারানোর। সহপাঠীরা রমজান মাস এলেই গড়গড় করে কুরআন তিলাওয়াত করে। কুরআন খতম দেয়। একেকজন একটা, দুইটা তিনটা করেও খতম দেয়। আমি বেচারা আমপারাও পড়তে পারি না। অবশ্য, ছোটবেলায় মক্তবে সুরা ফাতিহা থেকে সুরা ফিল পর্যন্ত মুখস্থ করেছিলাম। সেই সুরাগুলো দিয়ে আমার সাপ্তাহিক জুমআর কাজটা দিব্যিই হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু মুসলমানের তাগড়া এক ছেলে কুরআন পড়তে জানে না, এই অপবাদ শোনার আগে নিয়ত করলাম, তিলাওয়াতটা শিখে নেওয়ার। মনে পড়ে, এলাকার একজন হাফেজের কাছ থেকে নিজ উদ্যোগে ক্লাস নাইনে থাকতেই প্রথম কুরআন তিলাওয়াত শিখেছিলাম।

যখন কুরআন শিখে ফেললাম পুরোপুরি, তখন অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করতে লাগল মনের ভিতর। কেন জানি না, তখন শুধু আমার কুরআন পড়তেই মন চাইত। এই-ই বুঝি কুরআন পাঠের মজা? আস্তে আস্তে মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম। প্রথম প্রথম তিন ওয়াক্ত। একটা সময়ে চার... এভাবেই...।

স্কুলজীবন শেষ করে যখন কলেজজীবনে আসি, তখন যেন আমি একেবারেই পালটে গেলাম। আগে তো টেনেটুনে চার ওয়াক্ত পড়তাম, কলেজজীবনে এসে আমি হয়ে উঠলাম একেবারে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি। আলহামদু লিল্লাহ। কলেজজীবনের সময়গুলো আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল। এই সময়গুলো আমাকে ভিন্নভাবে জীবনকে বুঝতে শিখিয়েছে। ভিন্নচোখে জীবনকে চিনতে শিখিয়েছে। কুরআনপাঠের মজা তখন আমাকে এতটাই পেয়ে বসেছে যে, আমি দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। আমাদের বাসার পাশের ফ্ল্যাটে একটা দারুল ইফতা গড়ে ওঠে। সেখানে আট-দশজন মুফতি প্রতিদিন কুরআন-হাদিস থেকে দারস দিতেন। ফিকহের বিষয়াদি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। আমি সুযোগ হলেই সেখানে ছুটে যেতাম। তাদের সোহবত আমার খুব ভালো লাগতে শুরু করে। একেকটা মানুষকে যেন জ্ঞানের জাহাজ মনে হতো আমার। সেসময় অনুবাদ করা কুরআন, বিভিন্ন ইসলামিক বই পড়তে শুরু করি। আমি ডুবে যাই এক অন্য জগতে।

Scanned with CamScanner

আমি হারিয়ে যাই এক ভিন্ন দুনিয়ায়। এই দুনিয়া জ্ঞানের। এই দুনিয়া আলোর।

এরপর উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে চলে আসলাম জার্মানিতে। মনে হলো একখণ্ড নরকে এসে পড়েছি। চারদিকে ফেতনার ছড়াছড়ি। মনে আছে, জার্মানিতে প্রথম যেদিন ক্লাসে গেলাম, সেদিন আমার এক সহপাঠীর হাতে মদের বোতল দেখেছিলাম। আস্তাগফিরুল্লাহ! এও কী সম্ভব? আমি বুঝতে পারলাম, এটা ইউরোপ। এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশের কোনো মফস্বল এলাকা নয়। এদের না আছে নীতি, না আছে নৈতিকতা। অথচ, বিশ্বকে এরাই সভ্যতা শেখাতে ব্যতিব্যস্ত। মুখের কথার ফুলঝুরিতে এরা যেন সভ্যতা ফেরি করে চলে।

জার্মানি থেকে আসি ইংল্যান্ডে। ক্যামব্রিজে ইউনিভার্সিটিতে পা দেওয়ার আগে আমি ততদিনে ফেতনা এবং তার হালত বুঝতে শিখে গেছি, চিনতে শিখে গেছি। ইউরোপের স্বর্গরাজ্য হলো এই ইংল্যান্ড। এখানে, এই পরিবেশে এসে আমার বিগড়ে যাওয়ার কথা ছিল। ধর্মহীন হয়ে পড়ার কথা ছিল। কথা ছিল ভোগবাদী আর বস্তুবাদী দুনিয়ার পরানো রঙিন গ্লাস চোখে দিয়ে আমি আমার চারপাশটাকে 'থোড়াই কেয়ার' করবো। কিন্তু এসবের কিচ্ছু হলো না, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাকে এই ফেতনাময় মাটিতেও দীনের উপর অটল রেখেছেন। বলা চলে, ক্যামব্রিজে এসে আমি দীনের প্রতি আগের চেয়েও আরও অনেক বেশিই ঝুঁকে পড়ি। বিভিন্ন স্কলারদের বইপত্র, লেকচার শুনতে শুরু করি। অবসরে দীর্ঘ কুরআন তিলাওয়াত হয়ে ওঠে আমার নিত্যদিনকার অভ্যাস, আলহামদু লিল্লাহ। এই ক্যামব্রিজে এসেই আমি প্রথম দাঁড়ি এবং টাখনুর উপরে প্যান্ট পরতে শুরু করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

পিএইচডি'র তৃতীয় বর্ষে আছি। গবেষণার কাজ নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। মহান রাব্বুল আলামিনের রহমতে আমাদের বেশকিছু পেপার সাইন্টিফিক জার্নালে প্রকাশ পেয়েছে। নতুন আরেকটি ফাইন্ডিংস পেয়েছি যেটা সাইন্টিফিক ওয়ার্ল্ডে ঝড় তুলতে পারে।

খুব ছোটবেলা থেকে ইচড়ে পাঁকা টাইপের থাকলেও, বুঝ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ আমাকে রাস্তা চিনিয়েছেন। মহান রাব্বুল আলামিন যেন আমাকে এই হিদায়াতের রাস্তাতেই অটল রাখেন, আমিন।

Scanned with CamScanner

দ্য আগলি ডাকলিং

রেহনুমা বিনতে আনিস, মাস্টার্স ইন ইংলিশ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক-নট ফর সেল

আশির দশক। আবুধাবি। একটি আন্তর্জাতিক ইংরেজি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছি। বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি বিধায় বাবা-মা খুব চিন্তিত, ভর্তি পাব কি না। আর সব পারলেও হয়তো ইংরেজিতে আটকে যাব। লিখিত পরীক্ষা সমাপ্ত হলো। এবার মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ইসলামিক স্কুল হওয়ায় ছেলেদের এবং মেয়েদের শাখা একই বিল্ডিংয়ের দুই প্রান্তে অবস্থিত, শিক্ষকও পৃথক। কিন্তু মেয়েদের শাখার শিক্ষিকা তখনো শ্রীলংকা থেকে এসে পৌঁছননি। তাঁর অনুপস্থিতিতে ছেলেদের শাখার শিক্ষককে আপাতত মৌখিক পরীক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলো। পরবর্তী সময়ে শ্রীলঙ্কান শিক্ষিকার কাছে অসম্ভব স্নেহ এবং সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু সেদিন তাঁর অনুপস্থিতি আমার জন্য এক অন্য জগতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

পরীক্ষা-কক্ষে ঢুকেই ভড়কে গেলাম। পরীক্ষক এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। দীঘলদেহী, সোনালি চুল ও দাড়ি। তিনি সুন্দর করে সালাম দিয়ে বসতে বললেন। টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর আমাকে একটি গল্প রিডিং পড়তে দিলেন। গল্পটি ছিল হ্যান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসনের 'দ্য আগলি ডাকলিং'। অনেকেই ছোটবেলায় এই গল্পটি পড়ে থাকবেন। আমার জন্য এটি ছিল এই গল্পের সাথে প্রথম পরিচয়। পড়া শেষ হলে তিনি আমাকে গল্পটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে বলতে বললেন। বললাম, এটি একটি হাঁসের ছানার গল্প। সে জন্ম থেকে অবাঞ্ছিত। সে দেখতে তার ভাইবোনদের মতো হলুদ এবং তুলতুলে নয়; বরং ধূসরবর্ণের, বৃহৎ এবং কদাকার। সেজন্য মা তাকে নিয়ে লজ্জিত। খামারের অন্যান্য

Scanned with CamScanner

প্রাণীরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, তেড়ে আসে। এসব সইতে না পেরে সে একদিন পালিয়ে গেল। যেতে যেতে কিছু শুভ্র এবং রাজকীয় দর্শন পাখি দেখে সে ভাবল, 'হায়, আমি যদি তাদের মতো সুন্দর হতাম!' তারপর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে সে স্থান-থেকে-স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু কেউ তাকে ভালোবাসল না। এভাবে পার হয়ে গেল একটি বছর। আবারও বসন্ত এলো। পুনর্বার আশ্রয়হীন হয়ে পড়া হাঁসের ছানাটি ভাবল, 'এই জীবন আর ভালো লাগে না'। হ্রদের স্বচ্ছ এবং শান্ত জলে সেই রাজকীয় পাখির ঝাঁককে ভাসতে দেখে সে সিদ্ধান্ত নিল, তাদের কাছে এগিয়ে যাবার। হয়তো তারা হাঁসের ছানাটির কদর্যতায় বিতৃষ্ণ হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে। এমন অসাধারণ পাখিদের দ্বারা জীবনাবসান হলে মরেও শান্তি! তাকে দেখে শ্বেতশুভ্র রাজহাঁসের ঝাঁক চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। সে চোখ বন্ধ করে ভাবল এই বুঝি তারা তাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে! কিন্তু তাদের প্রশংসাবাক্য শুনে সে অবাক হয়ে চোখ মেলে হ্রদের পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করল। রাজহাঁসের ঝাঁকের ঠিক মধ্যখানে ভাসছে সবচেয়ে সুন্দর রাজহাঁসটি। সেই কদাকার হংসশাবকটি প্রকৃতপক্ষে একটি রাজহাঁস!

শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, এই গল্প থেকে আমি কী শিখলাম। আসলে আমার মাঝে এই গল্পটি এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেক দিক থেকেই আমি ছিলাম এই হংসশাবকের মতো। বললাম, এই গল্পটি মানুষের মাঝে লুক্কায়িত সম্ভাবনার কথা বলে, আশার কথা বলে, বাইরেটা দেখে বিচার করা থেকে বিরত থাকার কথা বলে। তিনি বললেন, 'ঠিক তাই। তোমাকে একটা গল্প শোনাই। আমি ছিলাম এক অমুসলিম যুবক। আমার প্রতিবেশী ছিল এক মুসলিম পরিবার। তারা দেখা হলেই অদ্ভুত এক সম্বোধনে অভিবাদন জানাত। সে বয়সে মানুষ কোনোকিছুকে খুব একটা পাত্তা দেয় না। আমি তাদের এই অদ্ভুত আচরণ উপেক্ষা করতাম। একদিন নানান কারণে আমার মন প্রচণ্ড বিক্ষিপ্ত। ঘরে শান্তি লাগছে না, তাই বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু রাস্তায় যার সাথেই দেখা হচ্ছে সে সম্ভাষণ জানাচ্ছে, 'গুড মর্নিং!' আমি দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ভাবছি, 'এমন ব্যাড একটা দিনে তোমরা গুড কী দেখছ?' আমি জানি আমার সমস্যার জন্য তারা দায়ী নয়, এর সমাধান করাও তাদের দায়িত্ব নয়। তবু অহেতুক লোকজনের ওপর মেজাজ খারাপ হতে লাগল। মেজাজ চরমে পৌঁছলে কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারি ভেবে বাসায় রওয়ানা দিলাম। বাসার দরজার সামনে এসে দেখি পাশের বাসার ভদ্রলোক

Scanned with CamScanner

স্ত্রী পরিজন নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছেন। আমাকে দেখে দরাজ হাসি দিয়ে বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। অকারণেই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম। তেড়ে গিয়ে বললাম, 'কী বলেন প্রতিদিন, ছাই, কিছুই বুঝি না! কী বলছেন ইংরেজিতে বলেন!' তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, 'আমি বলছিলাম, 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'।' হঠাৎ আমার কেমন যেন লেগে উঠল, 'আহ, শান্তি! এই শান্তির খোঁজেই তো পুরোটা শহর চষে বেড়ালাম ভোর থেকে!' তাকে গিয়ে ধরলাম, 'আমার এই শান্তি চাই। আপনি এই সম্ভাষণ কোথায় পেয়েছেন?' তিনি খুব অবাক হলেন। কিন্তু সামলে নিয়ে জানালেন, বিশ্বব্যাপী সমস্ত মুসলিম উম্মাহর সেতুবন্ধন এই সালাম। আমরা সবাই আমাদের ভাইবোনদের শান্তির জন্য প্রার্থনা করি, তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিই, তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। এই কথা শুনে আমি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করলাম। ইসলামের সৌন্দর্যে অবগাহন করতে করতে একসময় ইসলাম কবুল করলাম। আজ আমি একজন মুসলিম। আলহামদু লিল্লাহ, আমি জানি, প্রতিটি মুহূর্তে আমার রাব্ব আমার পাশে রয়েছেন, তিনি আমার প্রতিটি প্রার্থনা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ, তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের পরিপূর্ণ করে দেওয়ার জন্য তিনি সদা উৎসুক। সুতরাং, আমাদের কোনো অবস্থাতেই আশাহত হওয়া উচিত নয়। বরং বিশ্বাস এবং উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

ভর্তি পেলাম। ওই স্কুলে পড়তে পড়তে তার ব্যাপারে আরও জানার সুযোগ হলো। তার আচার ব্যবহার এবং সহযোগিতাপূর্ণ আচরণের কারণে তিনি ছিলেন সকল শিক্ষকদের মধ্যমণি। তার নিখাদ ইসলামি জীবনযাত্রার জন্য তিনি ছিলেন সবার শ্রদ্ধার পাত্র। অ্যাসেম্বলিতে প্রতিদিন তিলাওয়াত এবং হাদিস পাঠের পর যেকোনো একজন শিক্ষক সংক্ষিপ্ত আকারে শিক্ষামূলক বক্তব্য রাখতেন। তার পালা এলে তিনি শেখাতেন কীভাবে শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, কীভাবে তার পদ্ধতিগুলো জানা থাকলে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি, কীভাবে তাকে পরাজিত করা যায়। আমাদের ইংরেজি এবং বিজ্ঞান শিক্ষিকা তার মতোই ক্যাম্পাসে অবস্থিত শিক্ষকদের কোয়ার্টারে থাকতেন। তারা জানান, এই অমায়িক ভদ্রলোক কীভাবে ইসলামের ছায়ায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তার অনুমতিসাপেক্ষে একদিন আমাদের তার বাসায় নিয়ে দেখালেন, কীভাবে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদলে নিজের জীবনকে ঢেলে সাজিয়েছেন। প্রাচুর্যে সাজানো জীবন ত্যাগ করে মাটিতে শয্যা পেতে ঘুমানো অভ্যাস করেছেন। পোশাক এবং খাওয়া-দাওয়ায় নিয়ে

Scanned with CamScanner

এসেছেন আমূল পরিবর্তন। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে নিজের পরিবার ছেড়েছেন, হয়েছেন দেশান্তর। তিনি কেবল কথায় নয় কাজে, আচরণে এবং চিন্তায় ইসলামকে ধারণ করেছেন। নিজে ইসলামের পরশে সিক্ত হয়েই সন্তুস্ট থাকেননি; বরং অন্যদের ডেকে চলেছেন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের পরিধি পরীক্ষার হলের ওই পনেরো মিনিট। কিন্তু একজন মানুষ চাইলে অল্প সময়েই ইসলামের বাণী মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারে, তার আচরণ দ্বারা এর যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, কয়েকটি মুহূর্তের মাঝে এক জীবনের খোরাক বিলিয়ে দিতে পারে। তার সাথে ওই কয়েকটি মুহূর্ত আমার ধ্যান-ধারণায় এনেছিল আমূল পরিবর্তন। একজন মানুষ যে জীবনের অধিকাংশ সময় ইসলামের অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানত না, সে যদি এভাবে ইসলামে নিবিষ্ট হয়ে যেতে পারে, তবে আমাদের মাঝে কেন থাকবে এতটা অনাগ্রহ, অজ্ঞতা, মূর্খতা, কপটতা, অলসতা, সর্বোপরি আনুগত্যের অভাব? আমরা কেন কেবল নিজেদের ভালো থাকা নিয়েই ভাবিত হব, কেন অন্যদের ভালো থাকাকে নিজের মতোই অগ্রাধিকার দিতে কার্পণ্য করব?

সে বছরটি ছিল আমার জীবনের অন্যতম কঠিন এক বছর। একদিকে ছিল নতুন স্কুলে নতুন মিডিয়ামে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া। আমার ইংরেজিতে দক্ষতার অভাবে অনেকেই পুলকিত হতো। বড় বড় সুরা মুখস্থ করা, আরবিতে হাদিস এবং নামাজের মাসআলা মুখস্থ করা ইত্যাদি আরবিতে পূর্ববর্তী ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকায় বেশ কস্টকর ছিল। বেশ কয়েক ক্লাস লাফিয়ে আসায় অন্যান্য বিষয়ে অসুবিধা না হলেও অংকে দুর্বলতা লক্ষ করতে থাকি। বৃধ অংক শিক্ষকের নির্লিপ্ততা কোনোভাবেই এই বিঘ্ন অতিক্রমে সহায়ক ছিল না। ভালোভাবে স্কার্ফ পরতে জানতাম না, এটা নিয়ে শিক্ষিকারা তীর্যক মন্তব্য করতেন। আমাদের ক্লাসে এক পাকিস্তানি মেয়ে ছিল, যার বাবাকে মুক্তিযোদ্ধারা পা ভেঙে দিয়েছিল। সে আমার সাথে এমন আচরণ করত, যেন আমি ব্যক্তিগতভাবে ওর বাবার পা ভেঙে দিয়েছি। অসুস্থ হয়ে তিনমাস হাসপাতালে হাসপাতালে কাটালাম। একবার মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। কিন্তু ওই বছরটি আল্লাহ আমাকে কয়েকটি আলৌকিক সাহায্য দিয়ে উজ্জীবিত রেখেছিলেন। বছরের মাঝামাঝি এসে আমি ইংরেজিতে এতখানি দক্ষতা অর্জন করলাম যে ওই বছর আর কেউ ক্লাসটেস্ট থেকে শুরু করে কোনো পরীক্ষায় হাইয়েস্ট নাম্বার পায়নি। বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলাম ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু এই বিষয়ে যে আমি এত জ্ঞান রাখি, তা সে বছরই আমি টের পাই। ক্লাসের আরবি

Scanned with CamScanner

মেয়েদের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সুরা, হাদিস, নামাজের মাসআলা আরবিতে শিখতে এবং বুঝতে ওরা আমাকে সাহায্য করতে শুরু করে। স্কার্ফ পরতে শেখায়। আমার ওজন ছিল ক্লাসের অন্যান্য মেয়েদের ওজনের অর্ধেকেরও কম। ক্লাসের অন্যান্য পাকিস্তানি মেয়েরা তাই আমাকে ওই প্রতিশোধপরায়ণ পাকিস্তানি মেয়েটির কাছ থেকে বাঁচিয়ে রাখত। একজন ছিল দেখতে হুবহু আমার মতো। সে বলত, আমাদের নিশ্চয়ই জমজ হবার কথা ছিল, কিন্তু দুজন দুই দেশে জন্মেছি। খেলার মাঠে এই সাথিরা এমনভাবে আমাকে ঘিরে থাকত যে, আমার শারীরিক দৈন্য আমার চোখেই পড়ত না। হাসপাতালে এক আরব নারীর দেওয়া পথ্যে শেষ পর্যন্ত আমি ডাক্তারদের পর্যবেক্ষণের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই। অংকের বাধা অতিক্রম করতে অবশ্য আরও দুই বছর লেগেছিল। বুঝেছিলাম, অংক একটি স্টেপ বায় স্টেপ প্রসেস। অন্যান্য বিষয়ে কিছু জিনিস বাদ গেলেও সামলে নেওয়া যায়। কিন্তু অংকে মিসিং লিঙ্ক থাকলে পরের স্টেপ বোঝা যায় না। তাই ক্লাস ওয়ান থেকে টানা ক্লাস নাইন পর্যন্ত সব অংক করে সব প্রক্রিয়া বুঝে তবেই ক্ষান্ত দিয়েছিলাম। ওই বছরই প্রথম আমার লেখা ইয়াং টাইমস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তারপর আলহামদু লিল্লাহ, পেরিয়ে গিয়েছে অনেক পথ। পেয়েছি অনেক ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব।

এই পুনরুজ্জীবিত বিশ্বাসের পেছনে অবশ্যই অবদান ছিল আমার সেই পনেরো মিনিটের শিক্ষকের। তাই শিক্ষক হবার পর নিজেকে তার আদলে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করেছি। আমি যে আলোর ছোঁয়া পেয়েছিলাম, তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি সবার মনে। আর আমার সেই শিক্ষক এর কিছুমাত্র না জেনেও নিজের খাতায় বুঝে পাচ্ছেন অফুরন্ত বোনাস পয়েন্টস।

Scanned with CamScanner

প্রত্যাবর্তন!

এস. এম. নাহিদ হাসান, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

নিশ্চয়ই সকল প্রসংসা মহান আল্লাহর। সালাত ও সালাম তার রাসুল, রসুলের পরিবার ও রসুলের ওই সকল সাথির উপর কিয়ামত-অব্দি যারা তার অনুসরণ করবে।

আমার দীনে প্রত্যাবর্তনের প্রাথমিক ইতিহাসটা একটু ঘোলাটে। কারণ, এর সাথে অনেক বিষয় জড়িত ছিল। নারীর প্রতারণা, জাকির নায়েক, তাবলিগের মেহনত, ভয়াবহ স্বপ্নগুলো, না কবরের আজাবের সেই শ্বাস বন্ধ করা ভিডিও—ঠিক কোনটা যে আমার প্রত্যাবর্তনের মূল ইতিহাস, বোঝা কঠিন। কোনটাকে ফোকাস করব!

তখন ২০০৪ সাল। সোহরাওয়ার্দী হল, পলাশী। ভার্সিটির হলের তাবলিগের ভাইয়েরা দাওয়াত দিতেন। শুনতাম, কিন্তু মনে রাখতাম না। হলে তাবলিগ আর শিবির উভয়ই ছিল। তবে শিবিরের ভাইয়েরা বই-টই দিলে তা তাবলিগের ভাইয়েরা নিয়ে যেতেন! এজন্য শিবির খুব একটা সুবিধা করতে পারত না। তাছাড়া তাবলিগের ভাইদের বেশভূষা ও দরদী ব্যবহার ছিল আকর্ষণীয়। যাইহোক, দুনিয়াসক্ত এক যুবকের কানে কোনো মন্ত্রই বেশিক্ষণ টিকত না। 'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনি।'

একবার রুম চেঞ্জ করে আমার এক আল্লাহওয়ালা বন্ধুর রুমে গেলাম। সে নামাজও পড়ত আবার নাটক-সিনেমা ইত্যাদি ইত্যাদি দেখত। পাশের রুমে ছিল আরেক আল্লাহওয়ালা বন্ধু। এই দুজন তখন আমাদের মাঝে আল্লাহওয়ালা; কারণ, ওরা তো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। পক্ষান্তরে আমি ছিলাম মোহাচ্ছন্ন। শরীর গঠনের জন্য সবার সামনে হাফপ্যান্ট পরে ব্যায়াম করতাম আর বিকালে এই কোণা ওই কোণা

Scanned with CamScanner

ঘুরে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে তাবলিগে একদিন দুইদিন সময় দিতাম। ফিরে এসে আবার এই রেস্টুরেন্ট ওই রেস্টুরেন্ট।

অনার্স ২য় বর্ষে সম্ভবত ফিরে আসার শুরু যখন বর্তমান যুগের 'জাস্ট ফ্রেন্ডের' সাথে বিচ্ছেদের শুরুও ছিল। একটা সম্পর্কের শেষ না হলে মনে হয় আরেকটা সম্পর্ক হয় না। পাঠক, এই লাইনটা দয়া করে আরেকবার পড়ুন। হারাম সম্পর্ক শেষ না হলে হালাল সম্পর্ক শুরু হয় না।

এরই মধ্যে হলো কি, প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম যে, মশারীর উপর সাপ! প্রায়ই! আসল ঘোরাটা শুরু হয় কবরের আজাব নামক এক ভিডিও দেখে! ওরে বাবা, সেই ভিডিও আমি পুরোটা দেখতে পারিনি। অর্ধেক দেখেই মৃত্যুভয় আমার উপর এত প্রবল হলো যে, বেশি কিছু বোঝার দরকার নাইরে বাবা, নামাজ পড়তে হবে। আল্লাহকে আকুল আবেদন করলাম যে, আপনি যদি উপায় না করেন কোনো উপায় নেই। সত্যিই, আমি ছিলাম প্রচণ্ড ভীতু। যেমন আজও আছি। তাবলিগের ভাইদের সাথে ওঠাবসা বেড়ে গেল। বিশেষ করে সিনিয়র এক ভাই আমার উপর ভর করলেন ঠিক জিন ভর করার মতো। তার অবদান ভোলার মতো নয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। তাকে সম্মানিত করুন।

তাবলিগ আর মোহ—এই দুই জিনিস তার নিজ নিজ আড্ডায় বেশ শক্তিশালী ছিল। যখন তাবলিগে যাই তখন রব্বানি আর যখন ঘুরতে যাই তখন শয়তানি। আসলে মোহটা বেশ পুরোনো ছিল বলে ছেড়ে যাওয়া সহজ হচ্ছিল না; কিন্তু অনার্স শেষ বর্ষে যখন পুরোনো মোহটা পুরোপুরি বিদায় নিল তখন নিজের করে কিছু সময় পাওয়া গেল। ওই সময়টায় কীভাবে যেন পরিচয় হয় ডা. আব্দুল করিম জাকির নায়েকের সাথে। সামনা-সামনি নয়, আর সবার মতো মনিটরের স্ক্রিনে। তাকে চিনি, কিন্তু তিনি চেনেন না—এমন পরিচয়। মা শা আল্লাহ, আমি যেন আখিরাত, আল্লাহ, নবী—এগুলোর হাকিকত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম তখন আমার কাছে এক বাস্তবিক সত্য, নিছক বিশ্বাস নয়। সব কিছুই যেন যৌক্তিক সত্য! এই মেহনতে এতই সিরিয়াস হয়েছিলাম যে, হারুন ইয়াহিয়া আর জাকির নায়েক থেকে ধার করা জিনিষপত্র দিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানিয়ে লোকসমাগম শুরু করে দিলাম! আর আল্লাহও আমার দুই হিন্দু বন্ধুকে আসল ধর্মে প্রত্যাবর্তন করার তৌফিক দিলেন। একজন এখন তাবলিগ করেন আর একজন সম্ভবত বিদেশে গিয়ে দীন ছেড়ে দিয়েছে। যাহোক, আমার জন্য সেটা বেশ উপকারী হয়েছিল। এই

Scanned with CamScanner

পর্যায়ে আমার জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়, যা আগেও নিভু নিভু ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, হলের তাবলিগের ভাইয়েরা আমার এই চিন্তা গবেষণা আর কপমারেটিভ পড়াশুনাকে ভালো চোখে নেয়নি। তবে সেই সময় যেহেতু সিনিয়র ছিলাম কেউ সাহস করে বাধাও দেয়নি। ওই সময় এক ব্যাচ জুনিয়র রাসেল আহমাদ আমার সাথে মাআরিফুল কুরআন আর রিয়াযুস সালেহীনের তালিমে যোগ দেয় যা কেবল আমার রুমেই আমরা চালাতে পেরেছিলাম। ইবনে কাসির নামে কোনো তাফসির আছে বলে কেউ বলেনি। হাফিজ মুনির উদ্দিন আহমাদের সহজ সরল অনুবাদে আমি এতই মজা পেয়েছিলাম যে, হলের মসজিদে এক কপি রেখে দিয়েছিলাম, যেন সবাই মজাটার সন্ধান পায়। কিন্তু কে বা কারা সেটা সরিয়ে ফেলেছিল! হাফিজ মুনির উদ্দিনের সহজ সরল অনুবাদই কুরআনের সাথে আমার সম্পর্কের শুরুটা করে দিয়েছিল সন্দেহ নেই।

এমন চলার পথে আবারও ধোঁকায় পড়ে গেলাম। দীনি নেক সুরাতে নতুন ফিতনা। নেক বলছি; কারণ, সেও ছিল আমার মতো মুখোশ সর্বস্ব দীনী। দুইয়ে দুইয়ে চার, আবার! আসলে একজন অবিবাহিত বাইশ-তেইশ বছরের যুবকের জন্য নারী এমন এক বিষ—যা মরে যাওয়ার নিশ্চয়তা দিলেও আকণ্ঠ পান না করে উপায় থাকে না। এই ধোঁকাসহ সামনে চলতে লাগলাম। মেহনত মেহনতের জায়গায় আর শয়তান শয়তানির জায়গায়। প্রায় একবছর শেষে শেষবারের মতো নারীর ছোবল থেকে মুক্ত হলাম তিন চিল্লার উসিলায়। আসলে শেষ দিকে খুব খুব বিরক্ত ছিলাম। আর সত্যিকার অর্থেই এর থেকে মুক্ত হওয়ার একটা ভালো সুযোগ ছিল তিন চিল্লায় মোবাইল অফ রাখার বাধ্যকতা। শেষ পর্যন্ত ওটা কাজে দিয়েছে। প্রত্যাবর্তন ইতিহাসে এটা অবশ্যই একটা টার্নিং পয়েন্ট ছিল। সম্ভবত ওই সময় মোবাইল অফ না রাখলে আজকের ইতিহাসটা অন্যরকম হতে পারত। আল্লাহ বাঁচিয়েছেন।

তাবলিগ করলেও আমার সাথে তাদের একটা পার্থক্য ছিল যে, আমি সবার কথা শুনতাম। বইপত্র পড়তাম। পীরের জিকিরের মেহনতও বেশ ভালো লাগত। আলিমদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতাম। ওরা যদিও আলিমের সোহবতের কথা বলত, ইলমের কথা বলত, কার্যত তারা তার প্রাকটিস করত না। এমনকি কুরআনের অর্থ পড়তে দেখলেও কপালে চোখ তোলার চাহনি দিত। এসব আমার ভালো লাগেনি। তবুও মেহনতটা ছিল পরিবর্তনের মেহনত। একসাথে অনেক আল্লাহওয়ালা লোক অনেকদিন থাকলে তার একটা প্রভাব পড়বেই। শুধু তাবলিগ বলে কথা না।

Scanned with CamScanner

শেষ চিল্লার একদম শেষ দিকে মসজিদের মিম্বরে দেখলাম খুব পরচিত কিন্তু অদেখা বুখারী শরীফ। অনেক শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন উল্টিয়ে দেখা হয়নি। পাতা উল্টাচ্ছি আর অবাক হচ্ছি! কী ব্যাপার, অনেক কিছুই তো আমার সাথে মিলছে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে অনেক কিছু লেখা, যা তিনি নামাজে করতেন, অথচ আমি যে ভিন্ন রকমে করি! ব্যাপারটা কী! তাহলে কি আমার জানার বাইরেও অনেক কিছু আছে? তাহলে কি অন্যভাবেও নামাজ পড়া যায়!! মাজহাব বলতে যে কিছু আছে বা ইমামগণ যে আছেন, এগুলো বিশাল বিশাল বক্তৃতা দেওয়া মুবাল্লিগের কিছুই জানা ছিল না। ঠিক করলাম, বাসায় ফিরে বিষয়টা তদন্ত করব। ব্যাপারটা কী, জানা দরকার।

বাসায় ফিরে যে কাজটা প্রথম করলাম, সেটা হলো তাফসির ইবনে কাসির কিনে পড়া শুরু করলাম। আগে দেখি কুরআনে কী আছে। মজা পেয়ে গেলাম। দীনকে আবিস্কার করতে লাগলাম নতুন করে। ধীরে ধীরে সালাতসহ অন্যান্য মাসআলার বিষয়গুলো জানার চেস্টা করলাম। আগের মতোই সবার থেকে শুনতাম। নাসির উদ্দিন আলবানী (রহ.) ও নবীজির (স) নামাজ বইদুটো পাশাপাশি পড়লাম। বুঝলাম, জানার আছে অনেক কিছু। দুই রাকাত সালাত সম্পর্কে জানতে চার পাঁচটা বই পড়া লাগল। আসলে তাফসির ইবনে কাসির আমার জানার আগ্রহ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। কোনো বিষয়কে উল্টিয়ে পালটিয়ে না দেখলে প্রশান্তি পেতাম না।

এভাবে চলতে থাকল। প্রত্যাবর্তনটা তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে। কিছুদিন পর জানলাম যে, আমি আসলে হানাফি; কিন্তু হানাফি কেন, তা ঠিক বুঝতাম না। সবাই হানাফি তাই আমিও হানাফি। এর বেশি কিছু পাইনি। তরিকতের জ্ঞানও ছিল না। পরে জানলাম, আমাদের অনুসৃত তরিকা হলো চারটি। চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ারদিয়া, মুজাদ্দেদিয়া। হানাফি নয়, মালেকি নয়, শাফেয়ি নয়, এরা তাহলে কারা! আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম হয়ত এগুলোর রহস্যের ভেদ জানেন না। আমিও জানতাম না। কীভাবে জানবো! ছোটবেলা থেকে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য বলতে কেবল মিলাদে দাঁড়ানো আর বসার ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। এর বেশি মতভেদ তো দেখিনি! আশ্চর্য হলাম তখন, যখন দেখলাম আমি কেবল ফিকহে হানাফি; কিন্তু আকিদায় আশারি-মাতুরিদি। আল্লাহর উপর বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব! এইটার ফয়সালা করতে চলে গেছে প্রায় পাঁচটা বছর! শুধু কি আল্লাহ, নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিয়েও বিশ্বাসের মারপ্যাঁচ। কোথায় যাবো!

Scanned with CamScanner

দীন মানার আগে দীনের সুরাতটা পরিস্কার হওয়া উচিত। জানতে চাইলাম।

জানতে চাওয়ার এই তৃতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে উপকৃত হয়েছি ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) থেকে। তার বইগুলো আমার ইসলামকে একটা প্রশস্ততা দিয়েছে। কারও কথা চোখবুজে বিশ্বাস করে যখন শান্তি পাচ্ছিলাম না তখন তার কথাগুলো বেশ প্রশান্তি দিয়েছে। সবাই যে সুন্নাহ সুন্নাহ করে সুন্নাহ বোঝার মূলনীতি; কিন্তু তার এহইয়াউস সুনান বই থেকেই প্রথমে বুঝতে শিখি। জ্ঞানের শুদ্ধতার বিষয়টা তার হাদিসের নামে জালিয়াতি থেকে শিখেছি। আর আকিদার খুঁটিনাটি জানতে তার ইসলামি আকিদাও বেশ কাজে দিয়েছে। ফিকহের জন্য আমার আরেক বিশ্বাসের নাম ছিল ইসলাম কিউঁ এ। এখনও কিছু জানতে যতই আলিমদের কাছে যাই ইসলাম কিউঁ এ না দেখলে আশ্বস্ত হতে পারি না।

ইসলাম যতটুকু বুঝি তার আসল ভিত্তিটা তৈরি হয় যখন আমি আমার সমস্ত পড়াশুনাকে কম্পাইল করতে থাকি। তখন ইসলামের অনেক অজানা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়। কুরআন আর হাদিসের আলোকে নিজের অনেক চিন্তা ও কর্মকে যাচাই করতে শুরু করি। চেনা-জানা মানুষগুলোকে, চেনা-জানা চিন্তাগুলোকে আবার চিনতে শুরু করি। নতুন করে আমি আবিস্কার করি, যে দীনকে অনেক দিন ধরে দেখছি তার অনেক কিছুই দীন নয়! দীন যে কুরআন হাদিসে ছিল তা তো এখনও কুরআন হাদিসেই রয়ে গেছে! প্রত্যাবর্তনের এই ধাপটাই হলো সত্যিকারের প্রত্যাবর্তন।

সত্যি কথা হলো, প্রত্যাবর্তন এখনও চলছে। নিয়ত ঢেউয়ের মতো। ওঠা-নামা কিংবা এই মত থেকে ওই মত। মৃত্যু অবধি বোধহয় এই প্রত্যাবর্তন শেষ হবে না। নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই তার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

Scanned with CamScanner

ফিরে আসার গল্প

আশরাফুল আলম সাকিফ, এমবিবিএস, যশোর মেডিকেল কলেজ, লেখক, অ্যান্টিডোট

প্রত্যেকের জীবনেই কিছু গল্প থাকে। কারও ক্ষেত্রে সেটা সাদাকালো, আবার কারও ক্ষেত্রে তা রঙিন। কারও জীবনের গল্পগুলো তুলি দিয়ে একবারেই আঁকা যায়। আবার কারও জীবনের গল্প আঁকতে গেলে বার বার মুছে ঠিক করতে হয়। আমার আল্লাহ্'র দিকে ফিরে আসার গল্পটিও এমন। বার বার মুছে ঠিক করতে হয়েছে; কিন্তু তবুও পরিপূর্ণতা পায়নি। এখনো প্রতিনিয়ত ভুলগুলো মুছতে থাকি। আঁকি জীবনের নতুন নতুন সব চিত্র। অনেকের মতো হয়তো সুন্দরভাবে চিত্রায়ণ করতে পারি না। তাই বলে কি আঁকা থামিয়ে দেবো? না, থেমে থাকবো না। আমার সাধ্যমতো আমি আঁকবো। আল্লাহ তাআলা তো আমার চেষ্টা দেখবেন। নিশ্চয়ই তিনি উত্তম প্রতিফলদাতা।

খুলনার ভৈরব নদীর পাশে নিম্ন-মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে আমার জন্ম। ছোটবেলা থেকেই আব্বুকে দেখেছি সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে। কিন্তু প্রাকটিসিং মুসলিম ছিলেন না। আম্মু আবার এদিক থেকে ছিলেন খুবই পিছিয়ে। আম্মুকে মাঝে মাঝে সালাত আদায় করতে দেখতাম। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ্, তাঁদের উপর করা কষ্ট এবং দোয়ার বরকতে দুজনকেই এখন প্রাকটিসিং বলা যায়। কেন তাদের পূর্বের অবস্থা আপনাদের জানালাম? নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য তো আছেই!

ছোটবেলায় আমি তেমন ইসলাম মেনে চলতাম না। আসলে জানতামই না, মানবো কী করে? আমার এক চাচাতো ভাই আছে। তার নাম সাগর। আমি যখন সালাতই

Scanned with CamScanner

আদায় করতাম না, তখন থেকেই ও নিয়মিত সালাত আদায় করত। আমরা এবং আমার চাচারা একই বাসায় থাকতাম। সাগর যখন নিয়মিত সালাত আদায় করতে যেত, তখন গেটের কাছে এসে উঁচু গলায় বলত, 'আম্মু নামাজ পড়তে যাচ্ছি।' সাগরের এই কথা শুনে আমার আম্মুও আমাকে সালাত আদায় করার জন্য বলতেন। কিন্তু আমি রাজি হতাম না। তবুও জোর করে পাঠাতেন! জোর করে কি আর কাউকে দিয়ে কিছু হয়? আমাকে দিয়েও হয়নি। আম্মু জোর করে সালাত আদায় করতে পাঠালেও আমি মসজিদের আশে পাশে ঘুরে চলে আসতাম। কখনো কখনো আম্মু সাগরকে জিজ্ঞাসা করত যে, 'আমি কি নামাজ পড়েছি?' তখন দেখলাম, এ তো বিপদ! কী করা যায়? শয়তানের বুদ্ধিতে একটি উপায় বের করলাম! তারপর থেকে আমাকে আম্মু জোর করে পাঠালে আমি মসজিদে গিয়ে সালাতে ঠিকই দাঁড়াতাম, কিন্তু অজু ছাড়া। আর যায় অজু নেই, তার সালাত হয় না! এই ছিল আমার অবস্থা! ব্যাপারগুলো এখনো আমাকে হাসায়।

দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি খুলনার রোটারী স্কুলে। স্কুলে থাকাকালীন বন্ধুদের মধ্যে দেখতাম মেয়েকেন্দ্রিক কলহ। সবসময় গ্রুপিং চলত বন্ধুমহলে। ব্যাপারগুলো মোটেই ভালো লাগত না। তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, খুলনায় আর থাকবো না। এস.এস. সি পরীক্ষার পরে আব্বুর পোস্টিং হয়ে গেল কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়। আব্বু-আম্মু চিন্তা করতে লাগলেন—কোথায় আমাকে এইচ.এস.সি পড়াবে? তখন আমার ভাই রাজশাহী মেডিকেলে অধ্যয়নরত ছিলেন। অনেক চিন্তা ও পরিকল্পনার পরে আব্বু-আম্মু ঠিক করলেন যে, আম্মু আমাকে নিয়ে বাসাভাড়া করে রাজশাহীতে থাকবেন। আব্বু ভেড়ামাড়ায় অফিসের কোয়ার্টারে থাকবেন। সেখান থেকে প্রতি সপ্তাহে রাজশাহী আসবেন। আমিও সিদ্ধান্তে সম্মতি জানালাম। কয়েকটি কলেজের ফর্ম তুলেছিলাম। সব কলেজেই ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু সবার সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলাম নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজেই ভর্তি হব।

১৮ জুন, ২০১২। আব্বুর সাথে রাজশাহীতে বাসা খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। পরের দিন ভর্তি হতে গেলাম কলেজে। ভর্তি হয়ে আবার বাসা খুঁজলাম কিন্তু এবারও পেলাম না। তখন আব্বুকে বললাম, 'আব্বু, কুষ্টিয়া জেলা কলেজে ভর্তি হই? কলেজ তো একটা হলেই হয়। পড়াশোনা তো নিজের মধ্যে।' আব্বুও রাজি হয়ে গেলেন। কলেজে গিয়ে প্রাণিবিদ্যার সাইদুর রহমান স্যারের কাছে গিয়ে বললাম, 'স্যার, আমি ভর্তি বাতিল করতে চাই। কুষ্টিয়ায় কলেজে পড়ব।' স্যার রেগে গিয়ে বললেন, 'রাজশাহীর এই কলেজে ভর্তি হতে মানুষ ছোটবেলা থেকে

Scanned with CamScanner

স্বপ্ন দেখে। আর তুমি এখান থেকে ভর্তি বাতিল করে কুষ্টিয়া গিয়ে ভর্তি হবে? জানো, এখান থেকে প্রতি বছর কত শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়? তো তুমি কী জন্য যেতে চাচ্ছ?' আমি বললাম, 'স্যার, থাকার মতো বাসা খুঁজে পাচ্ছি না।' স্যার ধমক দিয়ে বললেন, 'কতদিন মায়ের আঁচলের তলায় থাকবে? বাহিরের জগতকে চেনার চেষ্টা করো। বাসা পাচ্ছ না তো কী হয়েছে? হোস্টেলে থাকবা!' এটুকু বলে আব্বুকে মোটিভেট করা শুরু করলেন তিনি। আব্বুও স্যারের কথায় রাজি হয়ে গিয়ে বললেন, 'ঠিকাছে আব্বু, তোমার স্যার যখন বলছেন, তুমি হোস্টেলে থেকেই এই কলেজেই পড়াশোনা করো।' কথাটি শুনে চোখে পানি চলে এসেছিল। অনেক কষ্টে সেদিন কান্না চাপিয়ে রেখেছিলাম। একা একা কীভাবে থাকবো? কিছুটা চাপা স্বভাবের কারণে কাউকে কষ্টের কথা বলিনি। তারপর, আব্বু থেকেই হোস্টেলে থাকার সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে এলেন। আমি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে লাগলাম। এভাবেই চলে গেল একটি বছর।

অক্টোবর, ২০১৩। মাঝরাতে একটি স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। একধরনের অস্থিরতা কাজ করছিল ভেতরে। যা দেখলাম, সত্যিই কি আমি সেটা দেখার যোগ্য। একবার ভাবছিলাম, যা দেখেছি সত্য; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল যা দেখেছি, তা সত্য না। আলেমদের কাছে গেলাম, তারাও আমার অবস্থার সাথে আমার দেখা স্বপ্নকে মেলাতে পারলেন না। আমি চিন্তিত মনে ফিরে এলাম। মাথা থেকে সব মুছে ফেললাম!

এরপর কিছুদিন পরে এস.আই আব্দুল মোমিন ভাই কিছু তাবলিগের ভাইদের নিয়ে হোস্টেলে এলেন। আমাদের ব্লকে যারা ছিল, সবাইকে এক জায়গায় করে হাজি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মুকিত সাহেবের সাথে তার কিছু অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। ইঞ্জিনিয়ার মুকিত সাহেবের আখলাক শুনেই ভক্তি চলে এসেছিল। তার সাথে সরাসরি দেখা হলে কী হতো, তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কথাবার্তা শেষে আমাকে বললেন, 'তুমি আমাদের সাথে ৩ দিন তাবালিগে কিছু সময় দাও।' আসলে এই ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা কম ছিল। এলাকায় দেখতাম, মসজিদ থেকে একসাথে বের হয়ে তাবলিগের ভাইয়েরা আমাদের খেলার মাঠে এসে সালাতের দাওয়াত দিতেন। তখন তো তাদের দেখলেই সবাই দৌড়ে পালিয়ে যেত। আমিও তাদের দেখাদেখি পালাতাম। তখন তো বুঝতাম না। এখন বুঝি, বিষয়টি কত ঘৃণ্য ছিল! মানুষ আল্লাহর দিকে আমাকে ডাকতে আসত, আর আমি পালিয়ে বেড়াতাম। কী ইমান এনেছিলাম আমি? একে কি ইমান বলে? যেই আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে নিয়েছি, সেই আল্লাহর পথে যারা ডাকতে আসত, তাদের দেখেই পালিয়ে

Scanned with CamScanner

বেড়াতাম? ছিঃ! যা-ই হোক, এজন্য তখন আমি মোমিন ভাইয়ের দাওয়াতে হ্যাঁ বলতে পারিনি। আমি দেহভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম যে, আমি রাজি না। কিন্তু তিনি তো নাছড়বান্দা! আমাকে নিয়েই ছাড়বেন। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে আমাকে তিনি রাজি করাতে পারলেন না। তারপর বলছিলেন, 'আচ্ছা ঠিকাছে, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো। আল্লাহ তাআলা যদি তোমার অন্তরকে আল্লাহ্র রাস্তায় সময় দেবার জন্য তৈরি করেন, তাহলে তুমি আমাদের সাথে যেয়ো।' আমি সম্মতি দিলাম।

কিছুদিন পরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলো। তখন হোস্টেল থেকে তাবলিগের ভাইয়েরা ৩ দিনের জামাতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমাকেও তাদের সাথে যেতে বলল। কেন জানি একবারেই রাজি হয়ে গেলাম। যেদিন জামাত বের হবে, সেদিন আমার কিছুই করা লাগল না। তাবলিগের ভাইয়েরা এসেই সব কিছু গুছিয়ে নিজের কাঁধে করে নিয়ে গেলেন। আমি চিন্তা করলাম, বাহ! আমার কোনো কষ্টই করা লাগল না। আমার ভাগ্য খুব ভালো ছিল। জীবনের প্রথম জামাতেই এমন কিছু মানুষ পেয়েছিলাম, যাদের আমি এখনো ভুলতে পারি না। রায়হান রাজু ভাই, আব্দুল্লাহ ভাই, রাকিব ভাই, মুফাজ্জল ভাই, ডা. ফরিদ ভাই প্রমুখ সবাই আমল এবং আখলাকে ছিলেন অনুসরণ করার মতো। আল্লাহ তাআলা সকল ভাইদেরকে দীনের উপর অটল রাখুন। আমিন।

জামাতে প্রথম রাত। ইশার সালাত শেষে কিছু আলোচনা করছিলেন ডা. ফরিদ ভাই। মানুষ যে কত সুন্দর করে কথা বলতে পারে, আর সেই কথাগুলোর প্রভাব যে একজনের অন্তর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে, সেটা ফরিদ ভাইকে না দেখলে হয়তো অজানাই থেকে যেত! যে ব্যক্তি নিজের বলা কথার উপর আমল করে, তার কথার দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয়। কিন্তু কেউ যদি নিজে আমল না করে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে, তবে সেই কথা অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে না। হয়তো ফরিদ ভাইয়ের কথাগুলো মানুষকে প্রভাবিত করেছে তার বলা কথাগুলোর উপরে নিজের আমল থাকার কারণে। সেদিন তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাদের দামি করে তৈরি করেছেন। আর একমাত্র তার ইবাদত করার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর আমরা তাকে ভুলে বসে আছি।' আমি চিন্তা করলাম, কথা তো ঠিক। আমাকে তো কেউ আগে এভাবে আদর করে কথাগুলো বুঝিয়ে দেয়নি। ঠিক করে নিলাম, আজ থেকে তাহলে নিয়মিত সালাত আদায় করার চেষ্টা করবো। তারপর আল্লাহ্র হুকুম মানার

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তোয়াক্কা না করা সম্পর্কে বললেন, 'ভাই তোমরা শুনে রাখ, তুমি যদি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন সহ সকল পরিবারের অবাধ্যও হয়, তবুও আল্লাহ তাআলা একসময় সেই সমস্ত ব্যক্তিকে তোমার উপর সন্তুষ্ট করে দেবেন, যারা তোমার উপর আল্লাহ্‌র হুকুম মানার জন্য অসন্তুষ্ট ছিল। আর যদি তুমি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করো, তাহলে একসময় আল্লাহ তাআলা ওই সকল ব্যক্তিকে তোমার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন, যাদেরকে খুশি করতে তুমি আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছিলে। ভালো করে শুনে নাও, স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য হারাম, যদিও সেই সৃষ্টি নিজের পিতা-মাতা হয়!' এই কথাটি আজীবনের মতো অন্তরে গেঁথে গেল। তারপর দাড়ি নিয়ে বলতে গিয়ে বললেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি দাড়ি সেইভ করে, তাহলে আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পান।[১]' আব্বুর মুখে সবসময়ই দাড়ি দেখেছি। এজন্য এটাকে তেমন ভিনদেশি মনে হয়নি। চিন্তা করলাম, আল্লাহ্‌র রাসুলকে কষ্ট দেব? অনেক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজ থেকে আর দাড়ি কাটবো না। মিউজিক সম্পর্কে বলেছিলেন, 'মিউজিক শোনা হারাম। যারা মিউজিক শোনে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের কানে কিয়ামতের দিন গরম সীসা ঢেলে দেবেন।' আমি চিন্তা করলাম, কী? মিউজিক হারাম? আমাকে তো এর আগে কেউ এই কথা বলেনি। আমার বাসায় তো সবসময় চলে! তবুও হারাম শোনে এবং কানে সীসা ঢালার শাস্তি সম্পর্কে জেনে এটাও বাদ দেবার নিয়ত করলাম। আবার তার দিকে তাকালাম। তিনি বলছিলেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র দীনের কাজে সাহায্য করে, আল্লাহ্ তাআলাও তাকে সাহায্য করেন। কোনো সময় মনে করবে না যে, ইসলামি কাজে সময় ব্যয় করছ বিধায় তোমার পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি যদি আল্লাহ্‌র কাজে সময় দাও, তাহলে আল্লাহ্ তোমার সময়ে বরকত দেবেন। অনেকে এক ঘণ্টা পড়ে যে পড়া মুখস্থ করবে, আল্লাহ্ চাইলে তুমি সেই পড়া অর্ধেক সময়ে মুখস্থ করতে পারবে, ইনশা-আল্লাহ। তুমি যদি আল্লাহ্‌র সাহায্য পাও তো কেউ তোমাকে পিছে ফেলতে পারবে না। কিন্তু তোমার এই কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।' এই কথাটিও মাথায় গেঁথে ফেললাম। তারপর

---

১ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদিকে দাড়ি সেইভ করা এবং গোঁফ বড় অবস্থায় দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। তারপরে কিছু কথার পরে বলেছিলেন, আমার রব হুকুম করেছেন যে, দাড়ি লম্বা করতে এবং গোঁফ ছোট করতে। এই ঘটনা থেকেই হয়তো বলেছিলেন। যদিও এর মাধ্যমে উক্ত সিদ্ধান্তে আসা যায় কি না, সেটা আলেমদের হাতে ছেড়ে দিলাম। তবে, এই কথাটিই আমার দাড়ি রাখায় পেছনে ড্রাইভিং ফোর্স হিসেবে কাজ করেছে।

Scanned with CamScanner

বললেন, 'তাকদিরের ফয়সালার উপর দৃঢ় বিশ্বাস ইমানের মৌলিক বিষয়। কারও যদি তাকদিরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তাহলে সে তো এটাই বিশ্বাস করবে যে, দুনিয়ার যা কিছু আমার পাওয়ার কথা সেটা তো আমরা পাবোই। আর যা তাকদিরে ছিল না, সেটা হাজার চেষ্টা করেও পাবো না। তাহলে কেন এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্য সারাদিন আমরা পরিশ্রম করবো? তোমাদের একটি গল্প বলি। মুরগী বা কবুতরকে খাওয়ানো দেখেছ কেউ?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, দেখেছি।' ফরিদ ভাই বললেন, 'যে মুরগী বা কবুতরগুলো দুষ্টু, সেগুলোকে খাওয়ানোর সময় মুরগীর মালিক খাবার ছড়িয়ে দেন। মুরগী বা কবুতরগুলো খুটে খুটে এখান সেখান থেকে খায়। আর যখন কোন মুরগী বা কবুতর মালিকের অনুগত হয়, তখন মালিক খাবারগুলো হাতে করে খাওয়ায়। এতে তারা খাবারগুলো একসাথেই পায়। কষ্ট করে এখান সেখান থেকে খুটে খুটে খেতে হয় না। মৃত্যু যেমন মানুষের দিকে ধেয়ে আসে, রিজিকও তেমন। আল্লাহ্র হুকুম মানলে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিককে সহজ করে দেবেন। আর যদি মানুষ অবাধ্য হয়, আল্লাহ্ তাআলা তার রিজিককে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন। তারপর সে সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যেই থাকে।' ঘটনাটি শুনে ভাবলাম, এই লোক এত ভালো ভালো উদাহরণ কোথায় পায়? আমরা সত্যিই অবাক!

শুনতে শুনতে রাত ১২ টা বেজে গিয়েছে। আমরা বিনা বিরতিতে তার কথা শুনতে থাকলাম। তিনি আর কথা বলতে চাইলেন না। আমরা তাকে ছাড়তে চাইলাম না। আরও শুনতে চাইলাম। তিনি শেষে তার জীবন থেকে কিছু বলতে গিয়ে বললেন, "আমি যখন সুন্নতের উপর উঠতে চেয়েছি, তারপর থেকে যখনই শরীরে জুব্বা এবং মাথায় টুপি দিয়ে কলেজে যেতে চেয়েছি, তখনই শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলত, 'আরে তুমি এটা কী করছ? এত মেয়েদের মধ্যে তুমি জুব্বা-টুপি পরে কলেজে যাবে? এতে ক্লাসের মেয়েরা তোমাকে দেখে হাসবে। তোমাকে অবজ্ঞা করবে।' এই অবস্থায় আমি অনেকদিন পোযাকের দিক থেকে রাসুলের অনুসরণ করতে পারিনি। শেযে আমিও চিন্তা করলাম, আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা তো হারাম। আমি কী তাহলে সেটাই করছি? একদিন শক্ত নিয়ত করলাম। যে যাই মনে করুক, আমি জুব্বা পরে ক্লাসে যাবই এবং একদিন সত্যিই চলে গেলাম। সবাই আড়চোখে তাকিয়ে থাকল। আমি দেখেও না দেখার ভান করলাম। কিছুদিন সবাই কটু কথা বলেছিল, কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছি। পরে সবাই আমাকে স্বাগতম জানিয়েছে। তো কিছুদিন পরে এক নিকাব পরা মেয়েকে দেখে চিন্তা করলাম—আমিও দীনদার, মেয়েটিও দীনদার! তাহলে

একসাথে লেখাপড়া করতেই পারি। কিছুদিন এভাবেই মনকে বুঝাচ্ছিলাম। শয়তান যে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছে, আমি সেটা বুঝতে ভুল করলাম না। তাই ওসব চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিয়ে কলেজে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম। এতে রেজাল্টও খারাপ হয়ে গেল। পরে অবশ্য সেটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। তোমাদের জীবনেও একইভাবে শয়তান ধোঁকা দিতে থাকবে। তোমরা সতর্ক থেকো। আজ আর না। আসসালামু আলাইকুম।'

আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম, তাকেই প্রতিবেলা বয়ান দিতে দেওয়া যায় কি না? কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। পরামর্শে যেটা ফয়সালা হয়, সেটাই তো হবে। যা-ই হোক আমরা প্রথম দিন শেষে সবাই ঘুমাতে গেলাম। এভাবেই প্রতিদিন পবিত্রতা, অজু-সালাতের নিয়ম কানুন ও বিভিন্ন নসিহত শুনতে শুনতে তিনদিন শেষ হয়ে গেল।

আমরা ফিরে এলাম। এসেই প্রথম দিন থেকে পাঞ্জাবি পরা শুরু করলাম। চার ওয়াক্ত শুধু ফরজ সালাত পড়ার নিয়ত করলাম। প্রতিদিন কুরআনের পাঁচটি আয়াত অর্থসহ পড়ার নিয়তও করলাম। সুমন নামের এক বন্ধু বলল, 'শোন, হুজুর হইছু, ভণ্ডামি করবি না। পাঞ্জাবি টুপি এগুলা পইরা মিউজিক ভিডিও, মুভি এগুলো দেখা চলবু না। হয় এগুলো দেখবু, নায় এই বেশ ছাড়!' খুব অপমানিত বোধ করলাম। রাগ হয়ে বললাম, 'যা, আর জীবনে দেখবো না। শুধু সামনে একটা মুভি বের হবে। ওটাই শেষ।' সুমন বলল, 'উহু! না, ওটাও দেখতে পারবি না।' আমি বললাম, 'আচ্ছা ঠিকাছে।' কথাটি মন থেকে বলেছিলাম না। বর্তমানে মানুষকে সালাতে ডাকলে যেমন না যাবার নিয়তে 'ইনশা-আল্লাহ' বলে, সেভাবে বলেছিলাম আরকি! তারপর থেকে নিয়মিত চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে লাগলাম। নিয়মিত ইশার সালাতের পরে তালিমে বসতাম। তাবলিগের বন্ধুদের সাথেই চলতে লাগলাম। বন্ধুরা পোষাকের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের জন্য নসিহত করত। পাঞ্জাবি-টুপি পরে থাকলে নাকি মনে চাইলেও অনেক কাজ থেকে বিরত থাকা যায়। সত্যিই তাই। আপনি পাঞ্জাবি-টুপি পরে সিনেমা হলে যেতে পারবেন না। আপনার বিবেকে বাধবে। যেটা দীনের বুঝ না থাকলে শার্ট-প্যান্ট পরা যে কারও পক্ষেই সম্ভব। এভাবে দীনি ভাইদের সাথে চলতে চলতে যে একবারেই মাল্টিমিডিয়ার জাহিলিয়াত ছেড়ে দিতে পারবো, সেটা ভাবতেই পারিনি আমি। কয়েকদিন পরে, ফজরের সালাত আদায় করাও শুরু করলাম। সাথে সাথে সালাতের পরে সুন্নত সালাত পড়া আরম্ভ করলাম। কিছুদিন পরে সালাতের আগে সুন্নত সালাত আদায় শুরু করলাম। এগুলো একবারেই আমার মধ্যে আসেনি।

Scanned with CamScanner

আস্তে আস্তে চেষ্টা করতে করতে নিজের অন্তরকে এগুলোর উপর অভ্যস্ত করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। কথায় আছে—সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ!

তারপর একদিন দীনি ভাইদের আনুরোধ রাখতে আমিও চিন্তা করলাম, এখন থেকে সবসময় পাঞ্জাবি-টুপি পরে থাকবো। কিন্তু আমাকেও শয়তান চক্ষুলজ্জা নামক একটি ফালতু ধোঁকায় ফেলল। এভাবে স্যারের ব্যাচে পড়তে গেলে স্যারেরা কী অবজ্ঞা করবে, মেয়েরা কী ভাববে—এসব চিন্তা মাথায় আসতে থাকল। তখন ফরিদ ভাইয়ের কথাগুলো মনে করে করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দুনিয়ায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি দরকার, অন্য কারও না। পরের দিন সাহস করে পাঞ্জাবি-টুপি পরে চলে গেলাম স্যারের ব্যাচে। মাথা নীচু করে ঢুকে সবার শেষ বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। স্যার একদিন বললেন, 'কী ব্যাপার? মেয়েদের ড্রেস পরেছ কেন?' স্যারের কথায় হেসে দিয়ে ভাবলাম, পাঞ্জাবি-টুপি মেয়েদের ড্রেস আবার কবে থেকে হলো? স্যার মনে হয় টিটকিরি মেরেছিলেন। এভাবে কয়েকদিন অস্বস্তিতে ভুগলাম। আল্লাহ্র রহমতে কিছুদিন এভাবে যাওয়ার পরে সবকিছুকে স্বাভাবিক মনে হতে লাগল।

সবকিছু ভালই চলছিল। একদিন আমার রুমমেট জানাল যে, আমাকে একটি মেয়ে পছন্দ করে। কাল নাকি স্যারের ব্যাচ শেষে প্রোপোজ করবে। যেখানে চিন্তা করেছিলাম, মেয়েরা এই ক্ষ্যাত (তাদের দৃষ্টিতে) মার্কা ছেলেকে দেখে কী বলবে, সেখানে সেই মেয়েরাই প্রোপোজ করবে? শয়তান চিন্তায় প্রভাব বিস্তার করে বোঝাতে চাইল যে, যদি মেয়েটি পর্দাশীল হয়, তাহলে তো ভালোই। এভাবে নারীর ফিতনায় ফেলতে শয়তানের সময় লাগল না। আমিও পরেরদিন এই চিন্তায় গেলাম যে, আমাকে একজন প্রপোজ করবে। ওহ! খুব ভালো একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা হবে। স্যারের ব্যাচে সেদিন কী যে পড়াল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু ক্লাস শেষে পরিস্থিতি কেমন হবে সেটাই ভাবছিলাম। ক্লাস যখন প্রায় শেষের দিকে, তখন ফরিদ ভাইয়ের জীবনের ঘটনাগুলো মনে পড়ল। অন্তরকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, এটা শয়তানের ধোঁকা। এই কাজ করলে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে অনেক দূরে ঠেলে দেবেন। আর আমি সেটা চাই না। তাই ক্লাস শেষ হতে না হতেই আমি সবার আগে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলাম। প্রত্যেকটি মানুষের নফসই তাকে বিপদে ফেলতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে রক্ষা করেন, সে ব্যতীত।

কয়েকদিন পরে বাসায় গেলাম। তখন মুখে কিছু কিছু দাড়ি হয়েছে। পাঞ্জাবি-টুপি পরা অবস্থায় বাসায় ঢুকলাম। তখন, আব্বু কিছু বলেনি। কিন্তু খাবার টেবিলে

Scanned with CamScanner

ভাইয়ার সামনে আম্মু বলল,

-'এ কী অবস্থা? এগুলো (দাড়ি) কেটে ফেল বাবা।'

আমি বললাম, 'না, কাটবো না। তাহলে আব্বুকেও কাটতে বলো।'

-'আরে তোর আব্বু তো বড় মানুষ। ওই বয়সে তুইও রাখিস!'

-'আমি যদি ততদিন বেঁচে না থাকি? তাহলে কি দাড়ি ছাড়াই কবরে যাবো?'

-'দাড়ি না রাখার কারণে তুই জাহান্নামে যাবি নাকি? দাড়ি রাখা তো সুন্নত!'

-'না! দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এটাই সঠিক মত। আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রেখেছেন সেই সূত্রে সুন্নতও। কিন্তু ইসলামি আইন অনুযায়ী, ওয়াজিব। দাড়ি এক মুষ্ঠির নীচে রাখলে ওয়াজিব ভংগের কারণে সর্বদা গুনাহ হতে থাকে।'

-'কী ছাগলের মতো দাড়ি রেখেছিস? সুন্দর করে কেটে ছোট ছোট করে রাখ! তাহলেই তো হয়।'

-'না, হয় না। বললাম তো, এক মুষ্ঠির নীচে কেটে রাখা জায়েজ নয়। আর তুমি ছাগলের দাড়ি বললা কেন? আমার দাড়িকে ছাগলের দাড়ি বলার মানে তুমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করলে!'

ভাইয়া রেগে গিয়ে বলল, 'এই, তুই আম্মুর সাথে এরকম ব্যবহার করছিস কেন? চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেবো। রাজশাহীতে থাকিস, কোনসময় শিবির বলে ধরে নিয়ে যাবে তখন বুঝবি? তখন কেউ ছাড়াতে যাবে না। আব্বু ওকে এগুলো ছাড়তে বলো।'

আব্বু কোনো কথা বললেন না। আমি বললাম,

'আম্মু, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন অপমান করেছে, তখন তো কিছু বলো নাই? এখন আমাকে কেন বলছ? আর দাড়ি রাখার কারণে যদি পুলিশ ধরে, তো ধরুক। আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। আর আম্মু, তোমাদের ছেলে তো চুরি-ডাকাতি করছে না। শুধু আল্লাহ্‌র হুকুম আর রাসুলের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণের কারণে তোমরা এমন করছ?'

আম্মু বলল, 'আমার কী সুন্দর ছেলেটা কী হয়ে গেল! এখন আমি তোর বিয়ের জন্য মেয়ে কোথায় পাব?'

Scanned with CamScanner

আমি বললাম, 'কেন, হুজুরদের বউ নেই নাকি? আমি তো দেখি তারাই দ্রুত বিয়ে করে।'

-'দাড়ি দেখলে তোকে কোনো সুন্দর মেয়ে বিয়ে করবে না!'

-'সেরকম মেয়ে আমার দরকার নেই। এটা দীনদার মেয়ে বিয়ে করার জন্য একটা ফিল্টার। আমাকে যতই চাপাচাপি করো, আমি দাড়ি কাটবো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতে পারবো না। আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে পিতা-মাতার আনুগত্য হারাম। সরি।'

কেউ কোনোমতেই আমাকে বোঝাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। তারপরেও বার বার দাড়ি নিয়ে নিয়ে কটু মন্তব্য শুনেছি বিভিন্নজনের কাছ থেকে। নিজের অবস্থান থেকে এক চুলও সরিনি তখন। আজ কিছু মানুষ রাসুলের হাদিসের অনুসরণের কথা বলে, কিন্তু দাড়ির মাসআলায় এসে কিছু আলেমদের মতকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। দলিল কি কিছু আলেমদের মতামত? নাকি কুরআন এবং সুন্নাহ? অবশ্যই কুরআন এবং সুন্নাহ। তাহলে এইক্ষেত্রে তাদের রাসুলের অনুসরণ কোথায় গেল? রাসুলের অনুসরণ কি তাহলে শুধু সালাতে, না সকল স্থানে? বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে গেলাম।

কিছুদিন পরে খুলনা গেলাম। তখন আবার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কটু কথা শুনলাম। ভাবি, চাচি, মামিদের দিকে না তাকানোতে অনেকেই বলতে লাগলেন যে, আরে, এরা তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, এদের দিকে তাকালে কী সমস্যা? এত নীচু মানসিকতা কেন তোমার? আমি বললাম, 'আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেছেন, এটাই সমস্যা। এখানে খারাপ মানসিকতার কী হলো?' কোনো ব্যক্তি যদি তার চোখকে হারাম জিনিস থেকে রক্ষা করে, তো এর জন্য এমন ইমান আল্লাহ্ তাআলা তাকে দান করবেন যা সে অন্তরে অনুভব করবে। মানুষ সমাজ, পরিবার এগুলো দেখে কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমের ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আরেকজন বলল, 'আমিও একসময়ে নামাজ-কালাম পড়তাম। একসময়ে সবারই একটি অনুভূতি তৈরি হয়। পরে ঠিক হয়ে যাবে। কয়েকদিন চলুক এভাবে। এভাবে কিছুদিন চলে একসময় ঠিক হয়ে যাবে।'

আমিও মনে মনে চ্যালেঞ্জ করলাম যে, দেখা যাক! এটা কী শুধুই অনুভূতি, না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য পথ চলা। অন্যজন বলল, 'এগুলো তো আরবদের পোশাক। আমি তো আরবে থেকেছি। ওদের দেশে প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে এরকম ঢোলা

Scanned with CamScanner

জামা পরে আর মাথায় টুপি পরে। আর এই টাখনুর উপরে প্যান্ট কেন উঠাইছ? যুদ্ধের ময়দানে ভালোভাবে দৌড়ানোর জন্য ওরা এরকম কাপড় পড়ত। নীচে কাপড় ঝুলে থাকলে তো দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যাবে। আমাদের দেশে তো এখন এসব পরিস্থিতি নেই। তাই এগুলো পরার যৌক্তিকতা কী?'

আমি তাকে দলিলসহ বোঝালাম যে—এগুলো শুধুই আরবসংস্কৃতি নয়। ইসলামের হুকুমগুলো শুধু আরবদের জন্য নয়। এগুলো সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য। আর টাখনুর উপরে কাপড় পরার কথা *সহিহ বুখারিতে* এসেছে। এবং যে অংশে কাপড় ঝুলে থাকবে, সেই অংশ জাহান্নামে যাবে—এই মর্মে হাদিসও রয়েছে। পোশাকের ব্যাপারে ছাড় আছে। প্রত্যেক দেশের সংকৃতি অনুযায়ী পোষাক পরিধান করার অনুমতি রয়েছে, যদি সেটা শরিয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসুলের অনুসরণে যদি আমি লম্বা কাপড় এবং টুপি-পাগড়ি ইত্যাদি পরে থাকি, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণের কারণে অতিরিক্ত সওয়াব পাবো। আমাকে বোঝাতে না পেরে আম্মুকে বলে গেল যে, তোমার ছেলের পড়াশোনা আর হবে না। খালি ধর্ম কর্মের মধ্যে থাকলে পড়াশোনা আর হয় না! বার বার ফোন দিয়ে একই কথা শোনাত। অনেকে তো এটাও বলত যে, তোকে দিয়ে তোর ভাইয়ের বউয়ের কাপড় পরিষ্কার ছাড়া আর কিছু হবে না! পরিবারের কেউই পক্ষে থাকল না, আব্বু ছাড়া। আব্বুও মাঝে মাঝে বলতেন যে, 'এত কিছু করার কী দরকার? শুধু ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেই তো হয়। আর কাউকে ঠকাবে না। ভালো হয়ে সবার সাথে চলবে। এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার নেই!' আমি কী করে বোঝাই যে, এটুকুতেই যদি হয়ে যেত, তাহলে সাহাবিগণ এত কস্ট কেন করলেন? রাসুলকে তো আল্লাহ্‌ তাআলা হুবহু অনুসরণ করতে বলেছেন। আর আমরা কী করছি?

চারিদিকের মানুষগুলোকে অসহ্য লাগছিল। প্রতিনিয়ত কুরআন এবং ইসলামিক কথা শুনতে শুনতে কিছু আয়াতের সাথে পরিচিত ছিলাম। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কস্টের পরেই শান্তি।' তিনি আরও বলেন, 'ধৈর্য সুন্দর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' মাঝে মধ্যে হতাশ হয়ে যেতাম। তখন এই আয়াতগুলোই আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাত। ধৈর্য ধরলাম। আল্লাহ্‌র ফয়সালার অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করতাম যে, একদিন তিনিই সবকিছু ঠিক করে দেবেন।

আব্বু-আম্মুর ইচ্ছা আমাকে মেডিকেলে পড়ানোর। কিন্তু আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় চান্স তো দূরের কথা, ওয়েটিং লিস্টেও থাকা হবে না। কলেজের

Scanned with CamScanner

রেজাল্টগুলো থেকেও এর থেকে ভালো কিছু অনুমান করা যায় না। আসলে দীনের বুঝ আসার পরে দীনি জ্ঞান অর্জন করার প্রতি ঝোঁক প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। তাই যতসময় না নিজের বই পড়তাম, তার থেকে বেশি ইসলামিক বই পড়তাম। ইউটিউবে বিভিন্ন লেকচার শুনতাম। বিশেষ করে ইংরেজি লেকচার বেশি শুনতাম। একদিন শায়খ হাসান আলির লেকচারে কিছু মানুষের আকিদাহ নিয়ে বাড়াবাড়ির কিছু কথা শুনলাম। তিনি উপদেশ দিলেন, 'একজন সাধারণ মানুষের জন্য *আকিদাতুত তাহাবি* গ্রন্থ পড়ে, সেই কথাগুলোর উপর বিশ্বাস আনলেই যথেষ্ট। শুধু শুধু আকিদার শাখাগত বিষয়ে বিতর্ককে উসকে দেওয়া ঠিক নয়। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়।' তখন গ্রন্থটি কিনে পড়লাম। বলতে হয় যে, গ্রন্থটি ছোট হলেও একদম আকিদার মূল বিষয়গুলো এতে আছে। এর আগেই ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) এর অনুবাদকৃত আল- ফিকহুল আকবার পড়েছিলাম। গ্রন্থটি ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর লেখা। এজন্যই মূলত পড়েছি। কারণ, আমি ফিকাহ হিসেবে হানাফি মাজহাব অনুসরণ করতাম এবং এখনো করি।

এরকম পড়াশোনা করতে করতে জানতে পারলাম যে, সালাফদের প্রায় সকল ইমামদের আকিদাই অভিন্ন ছিল। আর সেটাই 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'-এর আকিদাহ। তাই এই আকিদা নিজের জন্য গ্রহণ করলাম। তার পরে আরও বিভিন্ন বই এবং লেকচার শুনতে শুনতে দীন সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়লাম। কেউ বলে মাজহাব মানা শিরক, কেউ বলে বিদআত। কেউ বলে হানাফিরা পথভ্রষ্ট আবার কেউ বলে আহলে হাদিসরা পথভ্রষ্ট। কেউ বলে তাবলিগিরা বিদআতে লিপ্ত, তো কেউ বলে সালাফিরা ওহাবি (এই টার্মটা গালি হিসেবেই জানতাম)। আলেমদের সাথে সম্পর্ক ছিল। কোনো সমস্যায় পড়লে তাদের কাছে যেতাম। কিন্তু হানাফি আলেমদের কাছে গেলে আহলে হাদিসদের অবস্থান ভুল প্রমাণিত করত। আবার আহলে হাদিস আলেমদের বক্তব্য শুনে মনে হতে লাগল হানাফিদের অবস্থান ভুল। তারপরে পড়লাম আরও বিপদে। কেউ কেউ বলত, হানাফিদের সালাত সহিহ হয় না! এখন কী করি? তাহলে এতদিনের সালাত কি ভুল? নাহ! মনকে বোঝাতে পারলাম না। উম্মাহর এমন একজন আলেম যার মাজহাব মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ আলেমগণ মেনে নিয়েছে, সে কীভাবে সালাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ব্যাপারে ভুলের উপর থাকে? আবার আলেমদের কাছে গেলাম। এখন শুনলাম যে, হানাফিদের সালাত সহিহ কিন্তু আহলে হাদিসরা নাকি রহিত হাদিসের উপর আমল করে। মাঝে মাঝে ভাবতাম, আগেই তো ভালো ছিলাম। এখন ইসলাম মেনেই দেখছি

Scanned with CamScanner

শুধু দলাদলি আর দলাদলি। এভাবেও আমিও কিছুটা দলকেন্দ্রিক (হানাফি) হয়ে পড়েছিলাম আহলে হাদিস ভাইদের কিছু ছোট ছোট বইতে ইলমি খিয়ানত দেখে।

এসব অবস্থার মধ্য দিয়েই মেডিকেল কোচিং শুরু করলাম। মোটামুটি সাধ্যমত চেস্টা করেছি। এতটুকু দৃঢ় বিশ্বাস আমার ছিল যে, আমার তাকদিরে যেটা আছে সেটা আমি পাবোই। আমার চেস্টাটুকু আমি করে যাই। অন্যদিকে আমি যদি মেডিকেলে চান্স না পাই, তাহলে পরিবারের সবাই আমার দীনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। তখন আমার চলার পথ আরও কঠিন হয়ে যাবে। সবাই আমার ইসলামের পথে আসাকেই মেডিকেলে চান্স না পাবার পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করবে। এজন্য লেখাপড়া মন দিয়ে করেছিলাম। আর একটি এমন রাত্রিও দোয়া করতে বাদ যায়নি, যেসব রাত্রিতে বিশেষভাবে দোয়া কবুল হয়। মেডিকেলে চান্স পাবার জন্য দোয়া করতে গিয়ে কখনো দুনিয়ার জন্য চাইনি। আল্লাহ্র কাছে বলেছিলাম, 'ইয়া রব্ব, আপনি আসমান এবং জমিনের মালিক। চাইলে আপনি যে কাউকেই যেকোনো কিছু দিতে পারেন। আমার অবস্থা সম্পর্কে আপনি পরিপূর্ণ অবগত। আপনি এটাও জানেন যে, আমি যদি মেডিকেলে চান্স না পাই তাহলে আমার আপনার হুকুম আর রাসুলের দেখানো পথে চলতে সমস্যায় পড়তে হবে। আমি ডাক্তার হয়ে প্রচুর টাকা উপার্জন করবো—এমন মানসিকতাও আমার নেই। আপনি সেটা আমার থেকেও উত্তমভাবে জানেন। আমাকে শুধু এজন্যই মেডিকেলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিন, যাতে আমার পরিবারের লোকজন আমার ইসলাম মানার ব্যাপারে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আমার দীনের উপর চলা যেন সহজ হয়। ও আল্লাহ্, আপনি তো চান, আপনার বান্দা আপনার পথে থাকুক। আমি তো আপনার দিকে অগ্রসর হয়েছি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি ওয়াদা করলাম, দীনের খেদমত করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি মেডিকেলে পড়াশোনা করবো। আমার উপার্জন আমি যথাসাধ্য দীনের পথে ব্যয় করবো। আল্লাহ্ আপনি ছাড়া কবুলকারী কেউ নেই। আমার দোয়া কবুল করুন। আমাকে ভিক্ষা দিন।' এভাবেই দোয়া করতে করতে চোখে পানি চলে আসত। দুই ফোঁটা অশ্রু আসার আগ পর্যন্ত দোয়া শেষ করতাম না। জানতাম যে, এভাবেই দোয়া কবুল হয়।

যা-ই হোক, তারপরে প্রথমে ঢাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিলাম। চান্স হলো না। তারপরে জাহাঙ্গীরনগর এবং আর্মি মেডিকেলে এক্সাম দিলাম। এখানেও চান্স পেলাম না। বাবা-মা হতাশ হয়ে পড়লেন আমাকে নিয়ে। জীবনে অনেকেকেই আমি দেখেছি কোথাও পরীক্ষা দেবার আগে ভালোই সালাত আদায়

করে, দাড়ি রেখে দেয়। কিন্তু চান্স না পাবার কারণে হোক বা চান্স না পাবার পরে অন্য কোনো কারণে হোক, সালাত আদায় ছেড়ে দেয়, দাড়ি কেটে ফেলে! ব্যাপারটি খুবই হতাশাজনক। কিন্তু তাবলিগে সময় দিতে দিতে ইখলাস এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল ছিল, আলহামদু লিল্লাহ্‌। আমি তো ভার্সিটিতে চান্সের জন্য বা দুনিয়াবি কোনো কারণে সালাত আদায় করিনি বা দাড়ি রাখিনি। তাহলে কেন আমি আমার আশা পূরণ না হবার কারণে সালাত ছেড়ে দেব? কেন আমি দাড়ি কেটে ফেলবো? এজন্য যেকোনো কাজ করার আগেই আমাদের নিয়ত ঠিক করা উচিত। যতক্ষণ কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য না হবে, ততক্ষণ সেটি কবুল হবে না। আল্লাহ্‌র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“

‘মুমিনের অবস্থা বড়ই বিস্ময়কর। তার উপর কোনো বিপদ আসলে সে ধৈর্য ধরে, ফলে সওয়াব পায়। আবার যখন কোনো কল্যাণ আসে, তখন শুকরিয়া আদায় করার কারণে সওয়াব পেতে থাকে।’

তাই আমি তখন হতাশ হইনি। আল্লাহ্‌র উপর অভিমানও করিনি। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ধৈর্য ধরলাম। অনেকে বলতে থাকল, ‘এত নামাজ পড়ে কী হলো? কোথাও তো চান্স পেলে না!’ ভাবখানা এমন যেন, চান্স পাওয়ার জন্য আমি সালাত আদায় করতাম। এদের কথায় কান দিতাম না। এক কান দিয়ে ঢুকাতাম আর অন্য কান দিয়ে বের করে দিতাম। এভাবে যত যায়গায় পরীক্ষা দিলাম কোথাও চান্স পেলাম না, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইউনিট ছাড়া! এরপরে মেডিকেল এক্সাম দিয়ে বাসায় গেলাম। রেজাল্টের দিন জোহরের সময় মসজিদে ছিলাম। আমি জানতাম না যে, সেদিন রেজাল্ট দেবে। মসজিদে নফল সালাত আদায় করছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাসায় এলাম। দরজায় নক করতেই আব্বু দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই এতক্ষণ কোথায় ছিলে? মসজিদে গেলে বাসার কথা ভুলে যাও নাকি? মসজিদে ঘুমাও?’

-‘কেন? কী হয়েছে?’

-‘মেডিকেলের রেজাল্ট দিয়েছে। অ্যাডমিট কার্ড কোথায় রেখেছ? খুঁজে পাচ্ছি না!’

-‘ট্রাঙ্কের মধ্যে ফাইলে আছে।’

তারা দ্রুত চাবি দিয়ে ট্রাংক খুলে অ্যাডমিট কার্ড থেকে রোল আর রেজিস্ট্রেশন নম্বর বের করে মোবাইল হাতে দিয়ে বলল, ‘দেখ, রেজাল্টের অবস্থা কী?’

Scanned with CamScanner

আমি মোবাইল নিয়ে ওয়েবসাইটে সার্চ দিলাম। ইন্টারনেট কানেকশন স্লো থাকার কারণে যেখানে কোন মেডিকেলে চান্স হয়েছে এবং মেরিট লিস্ট কত, সেটার উপর পর্যন্ত পেজ লোড হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। আমি আব্বু আম্মুর দিকে তাকালাম। তারা জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে?'

আমি বললাম, 'রেজাল্ট আসছে না।' আমি অবশ্য তাদের অস্থিরতা উপভোগ করছিলাম। রেজাল্টই তো দেবে, এতে এত অস্থিরতার কী হলো? আসলে আমার ইচ্ছা ছিল না মেডিকেলে পড়ার। আব্বু-আম্মুর ইচ্ছাতেই মূলত পরীক্ষা দিয়েছি। তাই আমার থেকে তাদের কৌতূহল বেশি। যা-ই হোক, কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ পেজটি লোড হয়ে গেল। দেখলাম, যশোর মেডিকেলে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। আব্বু-আম্মুকে বললাম, যশোর মেডিকেলে চান্স পেয়েছি। এই মুহূর্তটাই মনে হয়, আমার চোখ দেখা তাদের জীবনের সেরা মুহূর্ত। তাদের আনন্দ এজন্য যে, সবাই বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে—তাদের দুই সন্তানই ডাক্তার। কিন্তু আমার আনন্দটা ছিল অন্যরকম। আব্বু-আম্মু অন্য ঘরে গিয়ে সবাইকে জানাতে লাগল। আমি চুপ করে খাটের উপর বসে ছিলাম। চোখ ভিজে এসেছিল। এজন্য না যে, দুনিয়ায় সফলতা অর্জন করেছি; বরং এজন্য যে, আজ থেকে আমায় আর কেউ বলতে পারবে না যে, দীনের পথে গিয়ে আমার পড়াশোনা নষ্ট হয়েছে। আজ থেকে আমার দীনের পথে আর কেউ বাধা দেবে না। কথাগুলো ভাবতেই যেন ভালো লাগছিল। আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এই গতকাল যারা অবজ্ঞা করত, বলত যে- আমাকে দিয়ে কিছু হবে না, সেই তারাই সেদিন বলতে লাগল—আমি নাকি খুব ভালো ছেলে, নিয়মিত পড়াশোনা করতাম, অল্প পড়লে কী হয়েছে, ব্রেইন ভালো। রাজ্যের হাসি তেড়ে আসত মনে, কিন্তু না হেসে চুপ থাকতাম!

তার পরে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ৪০ দিন সময় দিতে গেলাম কাকরাইলে। সেখান থেকে একটি ছাত্রজামাতের সাথে জুড়লাম। জামাতে সর্বদাই একজন আলেম ছিলেন। তবে জিম্মাদার হিসেবে সাধারণ এই কাজে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি ছিলেন। পরিচিত হলাম বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে। তাবলিগের উসুল, গঠনতন্ত্র, কার্যক্রম কাছ থেকেই দেখলাম। যা বুঝলাম, এটা কোনো দল নয়। ইলিয়াস রহ. বলেছেন, "আমি যদি এই মেহেনতের কোনো নাম দিতাম তাহলে এর নাম 'ইমানের মেহনত' দিতাম।" ভালো লাগার মধ্যে আছে, তাবলিগের ভাইদের আখলাক, ইখলাস, আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল, আল্লাহর উপর ইয়াকিন, উম্মাহর জন্য ফিকির ইত্যাদি। এই গুণগুলো আমিও নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করলাম।

Scanned with CamScanner

কিন্তু কিছু জিনিস খারাপও লাগল। যেমন, এই অধিকাংশ ভাইদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের (অন্তত ফরজটুকু) স্পৃহা খুবই কম, তাবলিগের আলেমগণকে অন্যান্য আলেমদের উপরে মনে করা (সে যতই তার থেকে ইলমে পারদর্শী হোক)। যারা তিন চিল্লা দিয়েছে তারা নিজেদের আলেমদের থেকে ভালো মনে করে। অবাস্তব সব ফজিলতের বয়ান—যার কোনো দলিল নেই, কিছু ভিত্তিহীন গল্প, এই রাস্তাকেই একমাত্র মুক্তির পথ মনে করা ইত্যাদি। সবাই হয়তো এমন না। কিন্তু আমার আশে পাশে এমন অনেক মানুষকেই আমি দেখেছি। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র জন্য খাস আয়াতের ফজিলতকে, তাবালিগে সফরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। অনেকে তো কুরআন অর্থসহ পড়তেই নিষেধ করে, গাফেল হয়ে যাবার ভয়ে! তখন ভাবতাম, যেটাকে আল্লাহ্ মুত্তাকিদের জন্য হেদায়েত বললেন, সেটা পড়লে গাফেল কেন হবো? তো জামাতে থাকাকালীন এক মসজিদের ইমামকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, 'কেন? কুরআন কি কারও পৈতৃক সম্পত্তি নাকি? আপনি পড়বেন নিয়মিত। যেখানে বুঝবেন না ব্যাখ্যা পড়বেন। তাও না বুঝলে আলেমদের কাছে যাবেন।' নসিহতটি ভালো লাগল। তবে কাকরাইলের মুরব্বিদের থেকে আপত্তিকর কিছু তেমন পাইনি। লোকদের এমন চিন্তাভাবনা আলেমবিহীন জামাত পরিচালনার ফলাফল। অনেকে তো এমন সব কথা বয়ানে বলে, যার কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল তো দূরের কথা, দুর্বল দলিলও নেই। যা-ই হোক ভালো খারাপ দুই ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়েই জামাত থেকে ফিরলাম। পিঠে 'এক চিল্লার সাথি' নামক একটি সিলমোহর পড়ল। কম বলি আর বেশি বলি—বাংলাদেশের প্রতিটি দলের মধ্যেই আসাবিয়্যাহ (দল-প্রীতি) কাজ করে। বর্তমানের তাবালিগ জামাতের সাথিরাও সেটা থেকে মুক্ত নয়। সাথিভাই হলে একরকম আচরণ, আর না হলে অন্যরকম। এই মানসিকতা পরিবর্তন জরুরি। কথাগুলো কোনো বিদ্বেষ নিয়ে বলা নয়, এটি একটি নিরপেক্ষ উপলব্ধি।

এরকম অবস্থা দেখে ভেবেছিলাম এই কাজ ছেড়ে দেব। অনেকদিন কাজ থেকে দূরেও ছিলাম। পরবর্তী সময়ে দেখলাম, আমার আমল আরও কমে গেল। দীনি কাজে সময় ব্যয় করাও কমে গেল। আল্লাহর দিকে দাওয়াতও কাউকে দেওয়া হচ্ছিল না। তাই আবার ফিরে আসতে হয়েছিল। ঢাকা ব্যতীত কলেজ-ভার্সিটিগুলোতে যেসব মানুষগুলো দীনের উপরে চলে, তার অধিকাংশই তাবালিগের ফসল। মানুষের কাছে বার বার গিয়ে দাওয়াত দেওয়ার একমাত্র জামাত আমার দেখা এটিই। যেই মেহেনতের মাধ্যমে দীন পেয়েছি, সেটাকে ছেড়ে যেতে পারলাম না। তাই এই

Scanned with CamScanner

জামাতের সাথে থেকেই ভুলগুলো সংশোধন করার চিন্তা করলাম। আসলে দূর থেকে সমালোচনা করে তেমন কোনো লাভ হয় না। সমস্যাগুলো সংস্কারের প্রকৃত পদক্ষেপ নিলেই একমাত্র এর সমাধান সম্ভব। এটি এমন একটি কাজ যা পৃথিবীব্যাপী চলছে। এই কাজের সংস্কার হলে উম্মতের প্রচুর কল্যাণ হবে।

এসকল অভিজ্ঞতা নিয়ে ভর্তি হলাম মেডিকেলে। পড়াশোনা করতে লাগলাম। আল্লাহ্ তাআলা পড়াশোনায় বরকত ঢেলে দিলেন। অনেকে প্রচুর পড়াশোনা করত, কিন্তু রেজাল্ট ভালো হতো না। কিন্তু আমি একবার পড়েই অধিকাংশ জিনিস মনে রাখতে পারতাম, আলহামদু লিল্লাহ্। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দীনের কাজে সহায়তা করে, আল্লাহ্ তাকে সহায়তা করেন। কিন্তু একটি ব্যাপারে সমাধানে তখনো আমি আসতে পারিনি। আর সেটি হলো—কোন দল সঠিক। সবাই নিজেকে ৭৩ দলের একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল মনে করে। আর সবাইকে অবশিষ্ট ৭২ দলে ফেলে দেয়। ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। অন্ধকারের মধ্যে আলো হয়ে আসলেন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)। এমন ইনসাফপূর্ণ অবস্থান আমি কারও চরিত্রে দেখিনি। একের পর এক লেকচার দেখতেই লাগলাম স্যারের। এক্ষেত্রে নিজের জন্য স্যারের মতো মানহাজ গ্রহণ করলাম। এদেশের মানুষ সাধারণ ফিকহি মতপার্থক্য নিয়ে যে কত বড় ফিতনা তৈরি করে, তা বলার বাইরে। আমার আগ্রহ জাগল যে, আসলে কী কারণে এমন ইখতিলাফ? ইউটিউবে খুঁজতে থাকলাম। কিন্তু তেমন একাডেমিক আলোচনা পেলাম না। অবশেষে মালয়েশিয়ার শায়খ নুরুদ্দিন লেমুর সাধারণ মানুষদের জন্য 'উসুলুল ফিকহ' নামক একটি সিরিজ পেলাম। সিরিজটি দেখার সাথে সাথে ডায়েরিতে লিখে রাখলাম। তারপরে মাওলানা আব্দুল মালেক (হাফি.) এর *উম্মাহর ঐক্য, পথ ও পন্থা* নামক বইটি পরে আবার উসুলগুলো দেখলাম। আহলে হাদিসদের উসুল শিখলাম মুসা ক্যারিন্টিওর কাছে। আর সালাফিদের উসুলগুলো বিভিন্ন সালাফি ওয়েবসাইটে গিয়ে বুঝলাম। তারপরে মতপার্থক্যের কারণ আমার সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট মনে হলো। অন্তরে যে প্রশান্তি অনুভব করেছি, সেটা বলার মতো না।

এসব কিছুর পরে যে সিদ্ধান্তে এসেছি সেটা হলো, 'আকিদার দিক থেকে যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর অন্তর্ভুক্ত, তারা সবাই আমার ভাই। তাদের কারও প্রতিই আমি কোনোরকম বিদ্বেষ রাখবো না। আমাদের মধ্যে ফিকহি মতপার্থক্য থাকতেই পারে। এরকম মতপার্থক্য সাহাবিদের মধ্যেও ছিল। কারণ, সেসব বিষয়ে

Scanned with CamScanner

মতপার্থক্য করার সুযোগ আছে বলেই, সেখানে মতপার্থক্য হয়েছে। একজনের সামনে এসব ক্ষেত্রে দুইটি পথ খোলা থাকে। হয় সে মুজতাহিদ (কুরআন-হাদিস থেকে যে গবেষণা করে মাসআলা বের করতে পারে) হবে, না-হয় সে তাকলিদ (কোনো ফিকাহ বা আলেমের বলা পন্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ) করবে। এখন একটি মাজহাবের করবে নাকি নিজের ইচ্ছামতো সকল মাজহাবের করবে, এটা তার ব্যাপার। কারণ, আল্লাহ্‌র কাছে তাকেই জবাব দিতে হবে। একটি মতের উপর অপর মতের প্রাধান্য দিতে গেলেও একটি ন্যূনতম গ্রহনযোগ্য লেভেলের জ্ঞান দরকার। সেটা এদেশের সাধারণ জনগণের নেই। যথেষ্ট যোগ্যতা না থাকার কারণে দেখা যাবে, মানুষ মাসআলার ক্ষেত্রে দলিলের প্রাধান্য না দিয়ে নফসের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। এজন্যে উলামারা একটি মাজহাবের অনুরসরণ করতে বলেন। তবে এক্ষেত্রে নিজ এলাকার বিশ্বস্ত ভালো একজন আলেমের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করাই উত্তম। তবে যদি কোনো মাজহাবের কোনো মত স্পষ্টভাবে কুরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে যায়, এবং সেই মতের পক্ষে কোনো দলিল না থাকে, সেক্ষেত্রে হাদিসের অনুসরণই কাম্য। তবে সালাতের মুস্তাহাব আমলগুলোর যে মতপার্থক্য, সেটা এই এই ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে না। দীনের কোনো মেহনত বা দলকে আমি অস্বীকার বা তিরস্কার করবো না। আমাদের মধ্যে কর্মের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন দল থাকতেই পারে। কিন্তু সেটাকে আমরা নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টির কারণ বানাবো না। প্রত্যেক ফিকহি মাজহাবই হক, আহলে হাদিস বা সালাফি মানহাজও সঠিক। কাউকেই বাতিল বলার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রত্যেক দলেই কিছু চরমপন্থী লোক আছে, যারা অজ্ঞতার কারণে সাধারণ মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে বিভেদকে উস্কে দেয়। এদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের ঐক্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আমাদের মাঝে বিভেদ থাকলে কাফিরদের সুবিধা, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে আল্লাহ্‌র দীনকে মেনে নিই, তাহলে আল্লাহ্ আমাদের বিজয় দান করবেন।' অন্তর থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল। ইসলামের সৌন্দর্য কাছ থেকে অনুভব করলাম।

আমি জানি—একথাগুলো বলাতে অনেকেই হয়তো আমার ব্যাপারে বক্র ধারণা পোষণ করবে। অনেকে অনেক ট্যাগও লাগাবে। তবুও বললাম। কারণ, যেটা সত্য, সেটা বলতে আমি কখনো দ্বিধাবোধ করি না। যারা দলীয় চশমা পরে কথাগুলো পড়ে আমাকে বিচার করবে, তাদের জন্য আমি দোয়া করি। আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকেই দীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন। আল্লাহ্ তাআলা যেন সেই

Scanned with CamScanner

ভাইদের আসাবিয়্যাহর ঘৃণ্য চশমা খুলে দীন শিক্ষা করার তৌফিক দান করেন। তাফাক্কুহ ফিদ্দিন এবং রুসুখ ফিল ইলম দান করেন। আমিন।

তারপর বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন বই পুস্তক পড়তে থাকলাম। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিখতে লাগলাম। শিখতে শিখতে একদিন নোমান আলি খানের দেখা পেলাম।[১] এতদিনে কুরআন অর্থসহ পড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কিছু লেকচার দেখে কুরআনের ভাষা শেখার আগ্রহ জাগল। মদিনা অ্যারাবিক বুকের সকল বই, লেকচার, হ্যান্ডনোট সংগ্রহ করলাম। শুরু হলো নতুন পথে যাত্রা। একদিন চিন্তা হলো, এভাবে কেমন খাপছাড়া জ্ঞান অর্জন করছি আমি? নিয়মাতান্ত্রিক উপায়ে এগুলো হওয়া দরকার। ভর্তি হলাম ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটিতে। এখনো আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তালিবুল ইলম হিসেবে সিরাতে মুসতাকিমের উপর চলার চেষ্টায় করছি। আল্লাহ্ তাআলা মঞ্জিলে পৌঁছার তৌফিক দিক। আমিন।

এভাবেই চলতে চলতে পরিবারের লোকজন যখন দেখল যে, পরিবারে আমিই একমাত্র ছেলে, যে নাকি আত্নীয়তার সম্পর্ক ভঙ্গোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে ভয় করি, পিতা-মাতার হকসমূহ আদায় করি, অসুস্থ মানুষকে সহায়তা করি, বড়দের সম্মান করি, কোনো অশ্লীল কাজে জড়াই না, কারও গিবত করি না, ঠিক তখনই তারা আমাকে দিয়ে আরেকজনকে উদাহরণ দিতে লাগল। আমাকে দেখিয়ে বলা শুরু করল যে, 'এর মতো হও।' আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে মানুষগুলোর আমি অবাধ্য হয়েছিলাম, আজ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকেই আমার উপর সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন। আলহামদু লিল্লাহ্। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং তিনিই উত্তম কুশলী।

খুলনায় বন্ধুদের সাথে মনোমালিন্য, আব্বুর ট্রান্সফার, আমার রাজশাহী পড়তে যাওয়া, একটি জামাতের মাধ্যমে আমার কাছে দাওয়াত পৌঁছানো- এগুলো সবই আমাকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনা। চিন্তা করা যায়? খুব সুন্দর তাই না?

এভাবেই দীনের পথে চলার রাস্তা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু শয়তান তো বসে নেই। সে সর্বদাই আমাদের পথভ্রষ্ট করতে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। তাই আমলের ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট

১ যদিও তিনি কিছু বিষয়ে বিতর্কিত। কিন্তু কুরআনের ভাষার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয়েছে তার লেকচার শুনেই। প্রত্যেকেরই কিছু ভুল থাকে। আল্লাহ সেগুলোকে ক্ষমা করুন। আমিন।

Scanned with CamScanner

হতে নেই। সিরাতুল মুসতাকিমের পথে কেউ সামনে থাকবে, কেউবা পিছনে। আমরা সামনে না যেতে পারি, পিছনে থাকার চেষ্টা তো করতেই পারি। আমরাও তো মানুষ। ভুল তো আমাদেরই হবে। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ভুল করে ফেললে আমরা যেন দ্রুত রবের দিকে ফিরে যেতে ভুল না করি। শয়তানের মতো যেন অহংকারী না হই। অবাধ্যতার উপর যেন অটল না থাকি। আল্লাহ তাওফিক দিক। আমিন।

তাই এখনো নিজের জীবনের গল্পগুলো প্রতিনিয়ত আঁকি। আঁকতে গিয়ে ভুল হয়। ভুলগুলো মুছতে থাকি। থেমে না থেকে আবারও আঁকি। আল্লাহ্ তাআলা তো বলেছেনই,

> "বলুন, হে আমার ইবাদতকারী বান্দাগণ, যারা (আল্লাহ্‌র হুকুম অবাধ্য করে) নিজের নফসের উপর জুলুম করেছ, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।[১]"

১ সূরা যুমার : আয়াত ৫৩

আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব!

আরিফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক, আর্গুমেন্টস অব আরজু

গল্পটা আমার মায়ের মুখ থেকে শুনেছি। আমার মায়ের বিয়ের জন্য যখন প্রস্তাব আসা শুরু করেছিল, তখন এরকম একটা প্রস্তাব আসে—যা আমার নানাবাড়ির সবার পছন্দও হয়। মায়ের কাছে ওই বিয়ের সম্মতি জানতে চাওয়া হলে আমার মা তা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার কারণ ছিল একটাই, আমার 'হতে পারত' বাবার মুখে দাঁড়ি ছিল। আর দাঁড়িওয়ালা মানুষ আমার মায়ের অপছন্দ ছিল।

খুব ছোটবেলায় যখন ঘুম থেকে উঠতাম তখন ঘুম ভাঙার সাথে সাথে কানে ভেসে আসত কুরআন তেলাওয়াতের সুর। আমার বাবা, আমার মা কিংবা আমার ফুফু ভোরবেলায় কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এখনো ছুটির সময় বাসায় গেলে ভোরবেলা কুরআন তেলাওয়াত শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙে। তেলাওয়াতকারী হিসেবে নতুন যোগ হয়েছে আমার ছোট বোনেরা।

কথাগুলো বলার কারণ হলো, আমি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি—যে পরিবারে এখনো ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করছে (আলহামদুলিল্লাহ)। আশেপাশের অনেক পরিবার দেখে শুকরিয়া আদায় করি এই ভেবে যে, আল্লাহ চাইলে তো আমার পরিবারও সেসব পরিবারের মতো হতে পারত—যেসব পরিবারে ইসলামের চর্চা হয় না, পরিবারের বাচ্চারা ছোটবেলা থেকে অনৈসলামিক পরিবেশে বড় হয়। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি, আমি এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি যেখানে ভার্সিটিতে উঠার পরও মা-বাবা রাতে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন—দিনে ঠিকমতো নামাজ পড়েছি কি না।

Scanned with CamScanner

কলেজ-জীবন পর্যন্ত নামাজ পড়ার জন্য আমাকে নিয়মিত এলার্ম দিতেন আমার মা-বাবা। অনেক সময় ইচ্ছায় আবার অনেক সময় অনিচ্ছায়ও নামাজে যেতাম। ছেলেমেয়েকে নামাজ পড়ানোর জন্য স্নেহের পরশে বা কঠোর পদক্ষেপে যা যা করার দরকার তার কমতি করেননি আমাদের মা-বাবা। এমনকি শত মাইল দূরে আসার পর এখনও ফোন দিয়ে প্রথম যে প্রশ্নটা করেন সেটাও নামাজ পড়া নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগের ৩ মাসে 'আল্লাহ চান্স পাইয়ে দাও' এই প্রার্থনা করতে থাকলাম। চান্স পাওয়ার লোভে হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে হোক তখন অনুধাবন করতে লাগলাম, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। মানে লবিং (Lobbying) করতে হবে। আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলাম।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, দেশসেরা বিদ্যাপীঠের ছাত্র আমি। এবার আমারে কে ঠেকায়? বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের রঙিন পরিবেশে পা দেওয়ার আগে অনেকেই অনেক সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। রঙিন পরিবেশে এসে সাদা উপদেশগুলো ধূলিস্মাত হয়ে গেল। রঙিন জগতে পদার্পণ করার সাথে চারিদিক থেকে রঙিন দুনিয়ার মানুষ 'আহলান-সাহলান' জানাল। রঙিন দুনিয়ার সাথে খাপ খেতে আমিও মেতে উঠলাম মাতাল হাওয়ার সুরে সুরে। হ্যাংগাউট, রাত-বিরাতে ঘোরাঘুরি, আজ এক ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টি তো কাল আরেকজনের বার্থডে পার্টিতে যাওয়া—এভাবেই কাটতে লাগল বিশ্ববিদ্যালয় জীবন। ১ ওয়াক্ত নামাজ পড়লে ৪ ওয়াক্ত পড়তাম না, এমনকি জুমআর নামাজও অনেক সময় মিস হতো।

দ্বিতীয় সেমিস্টার শেষে যখন ছুটিতে বাসায় গেলাম—তখন আম্মু অসুস্থ। টানা কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড জ্বর-কাশি। ডাক্তার দেখালাম, জ্বরের ওষুধ খেয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। অনেকগুলো টেস্ট করার পর ডাক্তার রিপোর্ট দিলেন। রিপোর্ট হাতে দিয়ে ছোট্ট তিনটি শব্দ বললেন ডাক্তার। 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া' এই প্রবাদ বাক্যটা শুনেছি, ডাক্তার সাহেবের কথা শুনে প্রথমবারের মতো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ অনুভব করি। শব্দগুলো হলো 'Suspicious of Cancer'। আসলেই ক্যান্সার হয়েছে কি না এটা বোঝার জন্য আরও কিছু টেস্ট করার জন্য ডাক্তার আমাকে ঢাকায় পাঠান। প্রায় সপ্তাহখানেক সময় মাথায় ওই কথাগুলো ঘুরতে থাকল 'Suspicious of Cancer'।

Scanned with CamScanner

আমার মাকে ছাড়া আমার পৃথিবী কল্পনা করতে লাগলাম, সেই পৃথিবীর পুরোটা জুড়ে বিরাজ করত শূন্যতা। ভার্সিটিতে ওঠার পর বছর খানেক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখার যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, ওই এক সপ্তাহে আবার নতুন করে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করার তাগিদ অনুভব করলাম। ওই একসপ্তাহে যে কান্নাকাটি করেছি, মনে হয়েছে বাকি জীবন কাঁদার জন্য আমার চোখে আর অশ্রু থাকবে না! সপ্তাহখানেক পর ফাইনাল রিপোর্ট হাতে পেলাম। ডাক্তার সাহেব রিপোর্ট দেখে বললেন, আমার মায়ের ক্যান্সার হয়নি, যক্ষ্মা হয়েছে। নিয়মিত ওষুধ খেলে যক্ষ্মা ভালো হবে, ইনশাআল্লাহ। ৬ মাস নিয়মিত ওষুধ খেলেন, আল্লাহর রহমতে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ।

মায়ের অসুখের সম্ভাবনার সেই ৭ দিন আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে। অনুভব করতে লাগলাম, এক বছরে সৃষ্টিকর্তার সাথে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে আস্তে আস্তে সেই দূরত্ব কমে আসছে। আমি আবারও ভার্সিটিতে ভর্তি হবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে থাকলাম। সেই এক সপ্তাহের প্রতিক্রিয়া আমার মধ্যে এখনো কাজ করছে। সেকেন্ড ইয়ারে এসে দাঁড়ি রেখে দেওয়ার সংকল্প করলাম। দীর্ঘদিন পর দাঁড়িমুখে বাসায় গেলাম। আমার মাকে কখনোও কাজা নামাজ পড়তে দেখিনি, সেই মা আমাকে দাঁড়ি রাখার জন্য প্রথমে ভেটো দিলেন। এই বয়সে কেন দাঁড়ি রাখলাম, আরও বয়স হলে তো রাখতে পারতাম, যে দাঁড়ি রাখার জন্য তিনি নিজের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন, সেই দাঁড়ি যে তার ছেলে রাখবে সেটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। আত্মীয়-স্বজন সবাই আমার দাঁড়ি রাখার বিরুদ্ধে কথা শোনাতে লাগল।

আশেপাশের সবাই বলা শুরু করল, *"তোর বাপ-দাদা কেউই দাঁড়ি রাখেনি, তবুও তারা নামাজ পড়েন, কিন্তু তুই দাঁড়ি রাখলি কেন? তোর কি দাঁড়ি রাখার বয়স হয়েছে?"*

পরিবার থেকেও চাপ শুরু হলো দাঁড়ি কেটে ফেলার জন্য। তখন বুঝলাম, যখন ভালোমতো ইসলাম মেনে চলার চেষ্টা করা হয় তখন প্রথম বাধাটা আসে পরিবার থেকে। মাকে বোঝালাম—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আসসালাম-এর সুন্নতের কথা, দাঁড়ির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলে তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আসসালাম-এর সুন্নতকে বিদ্বেষ করা হয়।

Scanned with CamScanner

আলহামদুলিল্লাহ, কিছুটা সময় লাগলেও মা বুঝতে পারলেন, আমার দাঁড়ি রাখার বয়স হয়েছে। আমার দাঁড়ি রাখা নিয়ে এখন কেউ প্রশ্ন তুললে আমার মা বিরোধিতার জবাব দেন। দাঁড়ি রাখার জন্য সর্বাত্মক সাপোর্ট করছেন আমার সেই মা—যিনি দাঁড়ি থাকার কারণে নিজের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

সেদিন মজা করে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, *'আচ্ছা মা, দাঁড়ি থাকার কারণে তুমি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে, তোমার ছেলের দাঁড়ি থাকার কারণে কেউ যদি বিয়ে করতে না চায়?"*

মায়ের উত্তরে মন ভরে গেল। *'যে মেয়ে দাঁড়ি পছন্দ করে না সেই মেয়েকে বিয়ে করার দরকার কী?'*

Scanned with CamScanner

চলতে চলতে আলোর দেখা

মুগনিউর রহমান তাবরীজ, লেখক, অ্যা লেটার টু দ্যা এথিয়েস্ট

বাঁধাই করা কাগজের নাম খাতা আর শিসে ভরা কালির নাম যে কলম—তা জানার আগেই আমি তাদের সাথে পরিচিত হই। আমার প্রথম সিগনেচার খুব এলোমেলো বক্র রেখা। সদ্য নিয়ে আসা আব্বুর পাসপোর্টে এঁকে দিয়েছিলাম প্রথম সিগনেচার। সেই থেকে যখন যেখানে যেভাবে ইচ্ছে, তখন সেখানে সেভাবে এঁকে যাচ্ছিলাম।

সমস্যা হলো তখন, বৃত্তের সাথে যখন পরিচিত হই । কতগুলো শর্ত মেনে বৃত্ত আঁকতে হয়। যেখান থেকে শুরু করি ঠিক সেখানেই এসে শেষ করতে হবে। একটি মাত্র কেন্দ্র থাকবে। কেন্দ্রের চারপাশের সুষম গোল রেখাটাই বৃত্ত। কেন্দ্র ছাড়া বৃত্ত সম্ভব নয়। আবার রেখা এলোমেলো হলে বৃত্ত হবেই না। তাই ইচ্ছে মতো বক্র রেখা আঁকতে পারলেও ইচ্ছেমতো বৃত্ত আঁকা সম্ভব হয়নি।

না, আমি জ্যামিতিক জ্ঞান দিতে চাচ্ছি না । আসলে, আমাদের জীবনকে খুব সহজেই বক্ররেখা আর বৃত্তের সাথে তুলনা করা যায়। বরাবরের মতোই ইসলাম ছিল কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। আপাত দৃষ্টির কাঁটা থেকে দূরে থাকতে গিয়ে নিজহাতে পান করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত বিষ। নিজেকে স্বাধীন মনে হতো, কে জানত সেই স্বাধীনতার প্রতিটি মুহূর্তে দংশিত হয়ে আসছি পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ রাসেল ভায়পারের। যেসব পথের দিকে ইসলাম তাকাতেও নিষেধ করেছে, সেসব পথে পদচারণ করে চলছি বীরদর্পে। 'ফুঁ দিয়ে উড়াইবো তুলা, বাহুবলে তুলিব কচুগাছ মনোভাবে' কে আমার কাছে কী? ভাবতে ভাবতে ভুলে গেছি, আমি আসলে কার কাছে কী! এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আসলে দিন চিনতাম কিন্তু দীন চিনতাম না। যার ফলে সৃভাবতই দিন এবং রাতের মধ্যে

Scanned with CamScanner

পার্থক্য বুঝলেও, পার্থক্য বুঝতাম না দীন আর বেদীন এর মধ্যে। এক কথায় এলোমেলো, উদ্দেশ্যহীন, ঘোর অন্ধকার জীবনধারার কথা উল্লেখ করে কলেবর বৃদ্ধি করার কোনো মানে হয় না। জীবনের সেই অংশটুকু এমন যে, আমার পক্ষে কখনো আত্মজীবনী লেখা সম্ভব নয়। যদি লিখি তাহলে অনেক সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকতে হবে। আর যদি সব সত্য বলি—তবে সম্মান কিছুটা টিকে থাকলেও মান বলে কিছু থাকবে না। শুধু এতটুকুই বলেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি যে, সেই ধারায় কথিত স্বাধীনতার বিষমাখা উন্মত্ততায় জীবনের গতিপথ ছিল উদ্দেশ্যহীন একটি এলোমেলো বক্ররেখার মতোই দিকহারা। কখনো কলম আমাকে ঘুরাচ্ছে, আবার কখনো আমি কলমকে। কিন্তু রেখা কখন কোন দিকে মোড় নিচ্ছে বা নিচ্ছি, কেন নিচ্ছে বা নিচ্ছি? এর শেষ কোথায়? সব শেষে পরিণতি কী? এই ধরনের প্রশ্ন কখনো খুব জোরালো ভাবে মাথায় আসেনি। কখনো কখনো আসলেও পাত্তা দিইনি। সেসব বিষয়কেই পাত্তা দিয়েছি যেসব আমার বক্র রেখাকে আরো বক্রই করেনি বরং পরিণত করেছে পাজলে।

সপ্তাহের একটি দিন খুব বিরক্তিকর ছিল। শুক্রবার। অসহ্য একটা ব্যাপার। নিয়ম মেনে গোসল করা, মসজিদে যাওয়া, এক কোণে বসে বসে ঝিমানো, সবাই উঠে দাঁড়ালে নিজেও দাঁড়ানো, কোনোভাবে দু-রাকাত শেষ হলেই বাঁচি। সপ্তাহে অন্তত এই দিনটিতে মসজিদে না গেলে ঘরে একটি ননস্টপ টেপরেকর্ডার বাজতে থাকত। হ্যাঁ, তখন টেপ রেকর্ডই মনে হতো আম্মুর কথাগুলো। মনে হতো—এই ক্যাসেটের ফিতা আর শেষ হবে না। খুব প্রসিদ্ধ একটা কথা আছে। তিন জুমায় মসজিদে না গেলে নাকি মুসলমান থাকে না। কথাটা আসলে বড়দাগে মিথ্যা। কিন্তু গ্রামের মুরুব্বিরা মসজিদে নিয়ে আসার জন্য এরকম কিছু কথা বলে ভয় দেখাতেন। আম্মু চাইতেন না—আমি জুমাআর নামাজ বাদ দেওয়ার দরুন অমুসলিম হয়ে যাই।

এসব ধর্মীয় কাজে আসলে কোনো লাভ আছে কি নেই—সেই উত্তর তখনো আমি খুঁজে পাইনি। সংশয়ের বীজ খুব ভালোভাবেই গেঁথেছে মাথায়। খুব বিজ্ঞানচর্চা করতাম। নিজের অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব। তখন 'জিরো টু ইনফিনিটিতে' লেখালেখি করি। একজনের একটি পোস্টে দেখলাম যে, তিনি প্রমাণ করে দিলেন—এই মহাবিশ্ব শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন লাগেনি। একবার দুবার নয় কয়েকবার পড়েছি সেই লেখা। আরও জানতে, খুব দ্রুত কয়েকটি বই সংগ্রহ করলাম। সেই বইগুলোর একটিতে পেয়ে গেলাম আমাদের শরীরের ডিজাইনে ভুল আছে। অন্যতম একটি ভুল হচ্ছে এপেনডিক্স। কোনো স্রষ্টা যদি

Scanned with CamScanner

আমাদের সৃষ্টি করেন তাহলে কেন তাঁর সৃষ্টিতে ডিজাইনগত সমস্যা থাকবে? বিবর্তনবাদ নিয়ে তো চুল টানাটানি চলত প্রায়ই। বিবর্তনবাদ ও বলছে—স্রষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। অনেকগুলো প্রশ্ন জন্ম দিচ্ছে প্রশ্নের, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও। উত্তরগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে নীরবে নিভৃতে?

ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ছিলাম না তখন (এখনো নয়। চেস্টা করে যাচ্ছি)। আবার স্রষ্টায় যে পুরোপুরি অবিশ্বাস করে বসেছি, তাও নয়। ধার্মিক অথবা অধার্মিক সব মানুষের কাছে স্রষ্টা বিষয়ক প্রশ্নের বিশেষ একটা গুরুত্ব আছে। সেই হিসেবে এই প্রশ্নগুলো আমাকে ঘুমাতে দিত না। এভাবেই কেটে যায় বেশ কয়েকটা দিন। পুরনো প্রশ্নের উত্তর না পেলেও উদয় হলো নতুন নতুন প্রশ্নের। মেনে নিলাম স্রষ্টা আছে কিন্তু এত ধর্ম কেন? সবাই তার নিজের ধর্মকে ঠিক বলে। আমি শুনি আমার বাপ দাদারা মুসলিম তার জন্য আমিও মুসলিম। ঠিক খ্রিস্টান পরিবারে জন্মালে আমি হতাম খ্রিস্টান। তখন তো আমার কাছে খ্রিস্টান ধর্মই ঠিক মনে হতো। প্রশ্নগুলো মনে রেখেই চুপচাপ দিনাতিপাত করছি। কারণ, আমাদের সমাজে ধর্মত্যাগ করা যতটুকু পাপ, তার চেয়ে ঢের বেশি পাপ ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা।

চিন্তার জগতে ঝড় শুরু হলো। ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। জান্নাত-জাহান্নাম। কিন্তু, মৃত্যুর পর জীবন আছে কি না আমি তো নিশ্চিত হতে পারিনি। যদি না থাকে তাহলে তো বেঁচেই গেলাম। কিন্তু সত্যিই যদি মৃত্যুর পর কোনো জীবন থাকে? জান্নাত জাহান্নাম যদি সত্য হয়? তখন কী করবো? আমাকে ধর্ম সম্পর্কে ক্লিয়ার হতেই হবে। এসবের উত্তর বের করতেই হবে। উঠেপড়ে লাগলাম। এভাবে হবে না। প্রশ্নগুলো ভাগ করে নিই। প্রথমত আমি কে? আমি তো আমিই। আমি কি পৃথিবীতে সরাসরি এসেছি? না। তাহলে? আব্বু-আম্মুর মাধ্যমে। তারা? তারাও। এভাবে পেছনে যেতে যেতে সর্ব প্রথম কারা? সবাই বলে তাঁরা আদম হাওয়া। কিন্তু, তাঁরা?

বিবর্তনবাদ বলছে, মানুষ এসেছে এপ থেকে। আচ্ছা.. আচ্ছা. . তাহলে আদম হাওয়া এপ থেকে আসা প্রথম মানুষ? কিন্তু. . . কিন্তু কী? কিন্তু. . . কোনো পশুপাখি, জন্তু জানোয়ার—এদের জন্য তো ধর্ম নেই। মানুষ একটা জন্তুর রূপান্তর মাত্র। তাহলে হঠাৎ কেন শুধুমাত্র মানুষের জন্যই ধর্ম থাকবে? বিবর্তনবাদ অনুযায়ী কত্ত জন্তু জানোয়ার এর রূপান্তর হয়েছে তাদের থেকে মানুষ এত আলাদা কেন? মাত্র দশ হাজার বছরের ব্যবধানে মানুষ পৃথিবীর সকল প্রাণী থেকে এত উন্নত হয়ে

Scanned with CamScanner

গেল? শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক থাকলে তারা মানুষের মতো না হলেও অন্তত কিছুটা হলেও অন্যসব প্রাণীর থেকে সভ্য থাকার কথা। কিন্তু শিম্পাঞ্জিও অন্য জন্তুর মতোই, কোনো পার্থক্য নেই। আবার এত সময় পার হয়ে গেল আর কোনো প্রাণীর রূপান্তর হচ্ছে না কেন?

নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করলাম বিবর্তনবাদে। একদিকে বিবর্তনবাদীদের যুক্তি, অন্যদিকে বিরোধীদের যুক্তি। দোটানায় কেটেছিল বেশ কিছু দিন। অবশেষে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ক্লিয়ার হলাম। নিজে নিজে প্রাণ সৃষ্টি হয়ে একটার পর একটা হতে হতে এসেছে পৃথিবীর কোটি কোটি প্রাণী, এটা বিজ্ঞান সমর্থন করে না। উপরন্তু, ডারউইন তার বইয়ে বিবর্তনবাদ প্রমাণের যেসব ফলসিফিকেশন টেস্ট দিয়েছেন সেসব টেস্ট অনুযায়ী বিবর্তনবাদ ভুয়া প্রমাণিত হয়। ততদিনে এটা ক্লিয়ার যে—মানুষ এপ থেকে আসেনি। মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণীও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের। কোনো প্রাণীই অটোমেটিক্যালি একটা প্রাথমিক পর্যায় থেকে আসেনি। বিবর্তনবাদ আসলেই একটা ফালতু থিউরি।. . . এই একই সময়ে পেলাম এপেনডিক্স আসলে অপ্রয়োজনীয় কিংবা ডিজাইনগত ভুল নয় বরং অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। এতই প্রয়োজনীয় যে, বিজ্ঞানীরা এখন এপেনডিক্সকে বলে সাইলেন্ট হিরো।

দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলাম। কিন্তু, মহাবিশ্বের সৃষ্টি? বিজ্ঞানীরা সবাই একমত যে—চিরকাল ধরে এই মহাবিশ্ব এভাবে নেই। একটা সময় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু, কীভাবে? বিগব্যাং এর মাধ্যমে। ওকে. . কিন্তু বিগব্যাং এর আগে কী ছিল? আবার সেইভ করা সেই পোস্টটি মনযোগ দিয়ে পড়লাম কিন্তু সেখানে এই উত্তর নেই। এবার বিগ প্রবলেম ইজ বিগব্যাং। এখানেও দুদলের উপস্থিতি আছে। কেউ স্রষ্টার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। আমি দুদিকের লজিকগুলো দেখছি। এবার কিন্তু হতাশ নই। নিশ্চয় বিবর্তনবাদের মতো সমাধান বের হবে। পড়ছি, পড়ছি এবং পড়ছি। শীতের রাত। লেপের নিচে শুয়ে ইন্টারনেটে ঘাঁটা ঘাঁটি করছি। এবার আশ্চার্য হওয়ার পালা। কেন? আরে, যারা দাবি করছে কোনো স্রষ্টা নেই, তারাই উত্তর দিতে পারছে না যে, কীভাবে বিগব্যাং এর শুরু হলো? টাইম-স্পেস-মেটার তাদের নিজেদের কাছেই একটা বড় পাজল। এটা বলছে সেটা বলছে কিন্তু, এটা সেটাই আমি বিশ্বাসী নই। প্রমাণ লাগবে, প্রমাণ নেই!!!

মানে কী? প্রাণিজগৎ এমনি এমনি আসেনি। মহাবিশ্বও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। তাহলে স্রষ্টা নেই—এর পক্ষে যে দুটি দাবি ছিল কোনোটির প্রমাণ নেই। উত্তর

Scanned with CamScanner

যেকোনো দুটির একটি। হয়তো স্রষ্টা আছে, নয়তো নেই। নেই—এর পক্ষে যেহেতু কোনো প্রমাণ নেই, তাহলে স্রষ্টা আছে।

গ্রামের বাড়ি। দরজা খুলে উঠানে বের হলাম। এই প্রচণ্ড শীতেও আমার গরম লাগছে। আজ আমি স্রষ্টার সমাধান পেলাম। কিন্তু ধর্ম? কারও সাথে কিছু শেয়ার করিনি। মনে মনে আছে সব। কিন্তু, কোনো কিছুই ভালো লাগছে না আমার।

একদিন একবন্ধুর মোবাইলের ফোল্ডারে ফোল্ডারে ঘুরছি। এটা সেটা প্লে করছি আর স্টপ করছি। হঠাৎ একটা ভিডিও প্লে হলো। কোট-টাই পরা একজন লোক খ্রিস্টান মিশনারীকে নাস্তানাবুদ করে প্রমাণ করে দিলেন যে যীশু নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেননি। একসাথে ডাবল চমক পেলাম। প্রথম চমক মিশনারীর লা জওয়াব, দ্বিতীয় চমক তাঁর রেফারেন্স বলার স্টাইল। এও সম্ভব? বন্ধু আমাকে বলল চিনিস না তাঁকে? আরে এই লোক আরকি ডা. জাকির নায়েক! সেইদিন তার থেকে ছোট ছোট খণ্ডের কয়েকটি লেকচার নিলাম।

একটি লেকচার ছিল "কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক নাকি সম্পূরক"। এই লেকচারে কুরআনের বৈজ্ঞানিক আয়াত যত শুনছি ততই অবাক হচ্ছি। সম্পূর্ণ লেকচার সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। সেই রাতে ঘুম হয়নি বললেই চলে। পরের দিন আব্বুর পকেট থেকে নিজহাতে টাকা নিয়ে একটা বাংলা অনুবাদসহ কুরআন কিনে আনলাম। আবার লেকচার প্লে করলাম, রেফারেন্স লিখলাম। চেক শুরু. . . কুরআনে বিগব্যাং, গ্রহ নক্ষত্রের গতি, ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত আয়াত! আমি সংশয় থেকে মুক্ত হইনি; কিন্তু হৃদয়ের গভীরে কেমন একটা উতাল-পাতাল অবস্থা শুরু হলো। সেটা কেমন ছিল? খুব কষ্ট হচ্ছিল নাকি কোনো অজানা উচ্ছ্বাস? আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল কেন? আমি শুয়ে পড়লাম। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছি। ঠিক ওই মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো কিছুর সাথে সম্পর্ক নেই আমার। মনে পড়ল আমি তো অজু করিনি। কুরআন পড়তে তো অজু করা লাগে। অজু করে আসলাম। প্রথমে সুরা ফাতিহার অর্থ পড়লাম। আরও পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। তখন আরবি পড়া ভুলে গেছি। শুধু বাংলা অর্থ পড়ে যাচ্ছি। কাজগুলো কি আমি করছি? নাকি কেউ আমাকে করাচ্ছে? বুঝে উঠতে পারছি না। বুঝতে চেষ্টাও করছি না। সুরা বাকারা পড়ছি তখন। জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা, নবিদের ঘটনা, শয়তানের অবাধ্যতা, কখন কোন সিকুয়েন্স থেকে কোন সিকুয়েন্সে যাচ্ছে, কেন সিকুয়েন্স চেঞ্জ হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু কুরআন বন্ধও করতে পারছি না, উঠতেও পারছি না। পড়ছি সুরা

Scanned with CamScanner

বাকারার ২৮ নম্বর আয়াত—

কেমন করে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।

আয়াতটি পড়ে চুপ করে বসে আছি। একটি লাইন। আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, অতীতের কথা বলছে যা আমি জানি না, বর্তমানের কথা বলছে, বলছে ভবিষ্যতের কথা, ভবিষ্যতেরও ভবিষ্যতের কথা। অন্যরকম অনুভব পাচ্ছি। সাইমুম সিরিজ, বনহুর, হিমু, মিসির আলী কোনো কিছুতেই এমন অনুভব করিনি। কিছুই তেমন বুঝে উঠতে পারছি না কিন্তু পড়ে যাচ্ছি। এবার পড়ছি সুরা বাকারার ৮১-৮২ নম্বর আয়াত—

যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। পক্ষান্তরে যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।

আমি ভীষণ আবেগী হয়ে উঠলাম। হুহু করে কেঁদে উঠলাম। কান্না কোনোভাবেই থামছে না। কোনোভাবেই না। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছি কেউ যেন শব্দ না শোনে। কুরআন যে আল্লাহর বাণী তখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হইনি। কিন্তু কেন কাঁদছি আমি, জানি না. . . নিজেকে কোনোভাবেই সামলাতে পারছি না। হৃৎপিণ্ডে যেন রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেছে। আমার এখনো অনেক প্রশ্ন বাকি আছে, কিন্তু তার আগেই কেন কুরআনের প্রতি এমন অনুভব হলো?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বড়ই অলস সময়। দুপুরের ভুরি ভোজনের পর অলস শরীরটা চায় এই সময়টাকে কাজে লাগাতে। শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম বিছানায়। কিন্তু মস্তিষ্ক অলসতা ছেড়ে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে প্রশ্নগুলোর উত্তর। একটি লেকচার প্লে করে চোখ বন্ধ করে আছি। হঠাৎ কানে বেজে উঠল—

Scanned with CamScanner

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।[১]''

আবার কুরআন খুলে চেক করলাম। আমার কাছে কেন যেন মনে হলে এই কথাগুলো আমাকে বলা হচ্ছে। সেদিনই আসর সালাত আদায় করলাম। সবাই মসজিদ থেকে বের হয়ে গেছে। আমি একা। প্রাণখুলে দোয়া করলাম। জীবনে প্রথমবারের মতো মনে হলো—আমার কথাগুলো আসলেই কেউ শুনছেন। দোয়ার ফোকাস অংশ ছিল, "আল্লাহ, আমি নিশ্চিত আপনি আছেন। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারছি না—কোন ধর্মকে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। আমি এই ধর্ম ছাড়া অন্যকোনো ধর্ম সম্পর্কে জানি না। এই ধর্মের নিয়মে নামাজ পড়তে হয়—তাই পড়লাম। যেই ধর্ম সঠিক সেই ধর্ম সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন। আমি সেই ধর্মই গ্রহণ করবো। যদি তার আগেই আমি মরে যাই তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

সেদিন থেকে আমার মনের অবস্থা পুরোপুরি পাল্টে গেল। মসজিদ যেন এক অদ্ভুতভাবে আমাকে টানছে তখন। সেদিন থেকে নিয়মিত সালাত আদায় শুরু করি। একবন্ধুর মাধ্যমে ঢাকা থেকে বাংলা অনুবাদসহ একটি হাদিসের কিতাব আনালাম। হাদিসের কিতাবের ভিন্নতা সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। সেই কিতাবটির নাম *সহিহ বুখারী শরীফ*।

প্রথম দিনই পঞ্চাশটি হাদিস পড়ে ফেলি। কুরআনের মতো অনেক কিছুই বুঝতে পারছি না। তবুও পড়ে যাচ্ছি। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ঘোর অমানিশা তখনো কাটেনি। কিন্তু ভেতর থেকে অন্যরকম অনুভূতি কাজ করছিল প্রতিটি মুহূর্তে।

অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে এডমিশন নিলাম। রমজান মাস। ইতিমধ্যেই পুরো কুরআনের অনুবাদ পড়া শেষ। এক ভাইয়ের সন্ধান পাই যার কাছে মুহতারাম জাকির নায়েক-এর অনেক লেকচার আছে। কালবিলম্ব না করে সবগুলো লেকচার সংগ্রহ করলাম। "প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহে স্রষ্টার ধারণা" লেকচারটি দেখলাম। পরের দিনই গীতা কিনে আনলাম। অন্যান্য গ্রন্থগুলো তখনো পাইনি। দিন-রাত পড়ে কয়েকদিনের মধ্যে গীতা পড়ে শেষ করলাম। এক লাইব্রেরিয়ান এর মাধ্যেমে অর্ডার

১ সূরা আনকাবুত ২৯:৬৯

করে বেদ চতুষ্টয়সহ হিন্দুধর্মের বেশকিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করলাম। সেগুলো পড়া চলছে পুরোদমে। এক সময় ক্লিয়ার হলাম হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা গ্রন্থ অনুযায়ী অনুমোদিত নয়। ইতিমধ্যে গ্রন্থের বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়ল আমার চোখে। স্রষ্টার পাঠানো কিতাবে অসঙ্গতি থাকবে—এটা আমি মেনে নিতে পারলাম না। তখন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আত্মসিদ্ধান্তে চলে আসি।

খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে আগ্রহের কমতি ছিল না। কিন্তু বাইবেল সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমার তৎকালীন বাসস্থান থেকে খ্রিস্টান পাড়া প্রায় ১০-১২ কি.মি. দূরে। সন্ধান পেয়েই জানার জন্য চলে গেলাম। মুহতারাম জাকির নায়েকের লেকচার থেকে যা জানলাম—সেই জ্ঞান নিয়ে ডিরেক্ট ফাদার এর উদ্দেশ্য গির্জায়। কিন্তু ফাদার কোনোভাবেই আমার সাথে কথা বলতে রাজি হচ্ছেন না। এমনকি তিনি কখনো সামনে আসেননি। গেটের সিকিউরিটি গার্ড খুব বিরক্ত হতো এবং সরাসরি বলে দিত 'ফাদার নেই'। অনেক নাটকীয়তা করে একদিন এক খ্রিস্টান ভাই থেকে তথ্য নিলাম—কখন কোথায় গেলে ফাদারকে পেতে পারি। তথ্যানুযায়ী ফাদারকে খুঁজে পেলাম। ফাদারের বিরক্তিভাব চোখে মুখে ফুটে উঠলেও আমার সাথে হাসি মুখেই কথা বলেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন পাশ কেটে কেটে অন্য দিকে চলে যান তিনি। সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম—আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'দেখুন, এসব টপিক নিয়ে কথা বলা সরাসরি পোপ-এর পক্ষ থেকে নিষেধ আছে'। একথা বলেই তিনি মটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে দিলেন।

এখন ধর্মগ্রন্থ পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু বাইবেল কোনোভাবেই সংগ্রহ করতে পারছি না। ধর্মগ্রন্থের এপ্স পাওয়া যায়—তা জানা ছিল না। হঠাৎই প্লেস্টোরে বাইবেলের কিং জেমস ভার্সনের এপ্স পেলাম। সাথে সাথে ডাউনলোড করে নিলাম। বার বার ওই আয়াতের কথা মনে পড়ছে, আল্লাহর পথে সাধনাকারীকে তিনিই সাহায্য করবেন। লিখে রাখা রেফারেন্সগুলো মিলালাম। সাধারণ ইংরেজির সাথে অনেক পার্থক্য হওয়ায় ডিকশনারি খুঁজে খুঁজে অর্থ মেলাতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হলো। বাইবেলের বাংলা পিডিএফ খোঁজা শুরু করলাম। পেয়েও গেলাম। কিন্তু, মূল ইংরেজির সাথে অনুবাদে এত বেশি পার্থক্য যে—ইংরেজি পড়ে বাংলার চেয়ে ভালো বোঝা যায়। অনেক ভার্সনে করা হয়েছে কারচুপি। ইংরেজি বাইবেল বলছে এক, অনুবাদ করা হয়েছে আরেক। ততদিনে খ্রিস্টধর্মের অনেক কিছু জেনেছি। খ্রিস্টধর্মের মূল বিশ্বাস টিকে আছে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু জাকির নায়েক বাইবেল থেকেই প্রমাণ করে দিলেন যে—যীশু ক্রুশবিদ্ধ

হননি। তিনি প্রায় পঞ্চাশটি রেফারেন্স দিয়েছেন বাইবেল থেকে। সবগুলো রেফারেন্স চেক করলাম। উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে বিজ্ঞান কুরআন এবং বাইবেল নিয়ে বিতর্ক দেখালাম। ড.মরিস বুকাইলির '*আল কুরান বাইবেল এবং বিজ্ঞান*' বইটিও পড়লাম। অনেক কিছুই বুঝিনি। কিন্তু মূল বিষয় ধরতে পেরেছি। সব মিলিয়ে খ্রিস্টধর্ম যে, কোনোভাবেই মুক্তির পথ হতে পারে না—এই ব্যাপারে আমার কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ রইল না।

এতদিনে সত্যিকার অর্থে ইসলাম আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এবার আমার কাজ ইসলামে নিজের স্থান করে নেওয়া। আমি নিজেকে বলতে পারছি, এখন আমি সংশয়ী নই কিংবা জন্মগত মুসলিমও নই। নিজ সিদ্ধান্তে ইসলামকে দীন হিসেবে মেনে নেওয়া মুসলিম। ইসলামের মূল বিষয়গুলো জানতে শুরু করি। বিস্তারিত জানতে গিয়ে বুঝতে পারলাম—প্রচলিত ইসলাম আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা কুরআনিক ইসলামের পার্থক্য বেশ বড় ধরনের। এমনকি ভৌগলিক পরিবর্তনের সাথে পার্থক্যেরও পরিবর্তন হতে থাকে। পরিচিত হই বিভিন্ন মত-পার্থক্যের বিশ্বাসী ভাইদের সাথে। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি। সবার থেকে শিখতে শুরু করি। ইসলাম জানতে আমার আগ্রহ দেখে বই সাজেস্ট এবং গিফট করেন অনেকেই। ততদিনে বাইবেল সংগ্রহ হয়ে গেছে। পাশাপাশি চলছে তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণা। এর কাছে ছুটে যাওয়া ওর কাছে ছুটে যাওয়া, ইন্টারনেট এর বিশ্বস্ত সাইট থেকে জানা। পুরোটা সময় কাটছে ধর্ম নিয়ে। সেই থেকে হাতে খড়ি। ইসলামকে জানার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের অসারতা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কর্তন দেখতে দেখতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা ভবিষ্যৎ বাণীগুলো নিয়ে লুকোচুরি দেখে আর অবাক হইনি। এখন কোনো কিছুতেই তেমন একটা অবাক হই না।

সামান্য কথার সাথে বৃত্তের কথা ভুলে গেলে কীভাবে হবে? হ্যাঁ, বৃত্ত। কল্পনায় একটি বৃত্ত এঁকে ফেলুন। এই পৃথিবীতে আসার আগে আমি ছিলাম না—এমন কিন্তু নয়। আল্লাহ্ আমার রুহ সৃষ্টি করে রেখেছিলেন বহু আগে থকেই। সেই রুহ আমি। পৃথিবীতে একটা দেহ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ সেই দেহে রুহ স্থাপন করলেন। একটি দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আমার পার্থিব জীবন শুরু। ঠিক একটি সময় এই দেহ থেকে রুহ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবেন আল্লাহ্। এখানেই পার্থিব জীবন শেষ। তাহলে রুহের জগত থেকে পৃথিবীতে এসে কিছুকাল অবস্থান করে পার্থিব জীবন চক্রশেষে আবার ফিরে যাবো রুহের জগতে। ঠিক বৃত্তের মতো, যে বিন্দু থেকে শুরু করলাম

Scanned with CamScanner

সেই বিন্দুতে এসে শেষ। সুতরাং আমার পার্থিব জীবন সত্যিকার অর্থে একটি বৃত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ। ধ্রুব সত্য হলো—বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু আল-কুরআন। কেন্দ্র থেকে যে অক্ষরেখা দিয়ে সফলভাবে সম্পূর্ণ বৃত্তটি আঁকতে পারবো সেই অক্ষরেখাটি প্রিয়তম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেন্দ্র ছাড়া বৃত্ত আঁকার চিন্তা করা তো সম্ভব নয়। আবার অক্ষরেখা থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই বৃত্তের বৃত্তীয় মান হারানো। কেন্দ্র কিংবা অক্ষরেখা থেকে যতই আমি বিচ্যুত হব ততই আমার বৃত্ত অসম হতে থাকবে। অসম বৃত্ত কখনোই আমাকে পৌঁছাতে পারবে না কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

ইসলামকে জানতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, আমরা মুসলিমরা শুধু অক্ষরেখা থেকে নই অনেক বিচ্যুত হয়ে পড়েছি কেন্দ্র থেকেও। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন দল মত, ফেরকা, তরিকা। ভালোবাসার বড়ই অভাব এক মতের অনুসারীর প্রতি ভিন্নমতের অনুসারীদের। সরে পড়েছি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম-এর দেখিয়ে দেওয়া সরল রেখা থেকে। অথচ, ভিন্নমতগুলো এক পাশে রেখে এক ভাই অপর ভাইয়ের হাতে হাত রেখে কেন্দ্র এবং অক্ষরেখা ধরে গঠন করতে পারি সুষম বৃত্ত। যে বৃত্ত আমাকে নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য জান্নাতে। একটি কথা সুস্পষ্ট, বৃত্তের পরিধিতে আমার কোনো হাত নেই, কিন্তু কেন্দ্র এবং অক্ষরেখায় আল্লাহ্ আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজ অনুগ্রহে কেন্দ্র এবং অক্ষরেখা চিনিয়ে দিয়েছেন। প্রিয়তম রাসূল সাঃ দেখিয়ে দিয়েছেন কোন রেখাটি সরল। এখন আমি কেন্দ্র ঠিক রেখে সঠিক অক্ষরেখায় সুষম বৃত্তগঠন করবো না কেন্দ্র কিংবা অক্ষরেখা ছেড়ে বৃত্ত ধ্বংস করে ফেলবো সেটা আল্লাহ্ আমার এখতিয়ারে দিয়েছেন। প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি কেন্দ্র এবং অক্ষরেখা ঠিক রেখে সুষম বৃত্তটিকে যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সরল রেখার উপর অটল রাখতে পারি। হে আল্লাহ্, ইহ দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল লাজিনা আন-আমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ'দ-ললিন। আমিন।

Scanned with CamScanner

খুঁজে ফিরি নীড়

সালমান সাঈদ, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

খুব অল্প বয়সেই আমার মধ্যে সন্দেহের বীজ ঢুকে পড়ে। কেন জানি ধর্মীয় বই আর রূপকথার গল্পের বই আমার একইরকম লাগত। 'ঠাকুরমার ঝুলি' বলে বাংলা সাহিত্যে একটা অংশ আছে, যেখানে রঙচঙ মেশানো নানান অলৌকিক, অপার্থিব গল্প পাওয়া যেত। ধর্মের কিচ্ছা-কাহিনিগুলো আমার সেরকমই মনে হতো একসময়। মনে হতো—সব মানুষের মনগড়া গল্প। মানুষ গল্প বলতে ভালোবাসে, গল্প শুনতে ভালোবাসে। সেই ভালোলাগা থেকে সে নানান ধরনের, নানান কিসিমের গল্প তৈরি করে। একসময় সেই গল্পগুলো থেকে তৈরি হয় 'স্রষ্টা' 'নবী' 'আসমানি কিতাব' 'ফেরেস্তা' 'জান্নাত-জাহান্নাম' টাইপের বিভিন্ন টার্মগুলো। আর, ধর্ম প্রবক্তা যেমন : মুহাম্মাদ, মুসা, ঈসা, ইবরাহিম—এরা পৃথিবীতে আদৌ এসেছিলো কি না, এই ব্যাপারটাও ছিল আমার কাছে বেশ সন্দেহজনক।

সায়েন্স ফিকশানের প্রতি অসম্ভবরকম আগ্রহ ছিল আমার। জাফর ইকবালের সাইন্স ফিকশানগুলোই বেশি পড়া হতো। যেহেতু ছোটবেলা থেকেই আমি খুব অলস আর ভাবুক টাইপের ছিলাম, তাই সাইন্স ফিকশানের ব্যাপারগুলো আমার মাথায় সবসময় কিলবিল কিলবিল করত। তাহলে কি কোনো মহাজাগতিক প্রাণী আমাদের তৈরি করেছে? এমন কি হতে পারে, তারা এক সমষ্টিগত প্রাণী যারা বহু হয়েও এক? আর আমরা পরীক্ষামূলক গিনিপিগ; আমাদের থেকে আরও উন্নত কিছু তৈরি হতে যাচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতে?

অথবা মনে হতো, এই পৃথিবীতে আমিই সব। কেননা, সবকিছু আমাকে ঘিরেই

Scanned with CamScanner

আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীর। আমি যেখানে নেই সেখানে আসলে কিছুই ঘটছে না। কিচ্ছু না। বাকি সবকিছু প্রোগ্রামড, কেবল ইচ্ছাশক্তি আছে আমার। আর একটু বয়স বাড়তেই বুঝলাম, নাহ, মুহাম্মাদ নামের কেউ আসলেই এসেছিল পৃথিবীতে। তাঁর আসার ইতিহাস, থাকার ইতিহাস, তাঁর অস্তিত্বের ইতিহাস—সব কেমন যেন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বয়সের সাথে লব্ধ এই জ্ঞান আমাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলল। আমার চিন্তার জগতে, আমার ভাবনালোকে যেন এক ত্বরিত বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। তাহলে আমার এতদিনের ভাবনা কি ভুল ছিল? আমার মস্তিস্কে বাই ডিফল্ট সেট হয়ে যাওয়া মুহাম্মদের অনস্তিত্ব, সেটা কি ভুল? তাহলে ঠিক কোনটা? কেমন এক অদ্ভুত চিন্তা যেন আমার পিছু নেওয়া শুরু করল। তারপর থেকে আমি এক দ্বন্দ্বে ডুব দিলাম। অস্তিস্ত্ব-অনস্তিত্বের দ্বন্দ্বে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি না, এই প্রশ্ন আমাকে অনেক কাঁদিয়েছে। লিটারেলি বলছি, কাঁদিয়েছে। কলেজজীবনে ফ্রেঞ্চ দার্শনিক জ্যাক্স লাকার একটা দর্শন ধার করে একবার একটা গদ্য কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটা যখনই পড়ি, আমি বুঝতে পারি—ওই সময়টা কত বিভীষিকাময় ছিল আমার জন্য। আমি অনুভব করি, কতটা মানসিক মর্মপীড়া আর দোটানার মধ্য দিয়েই না আমি গিয়েছিলাম।

আমার জীবনটাকে উত্থান-পতনের এক নিরস উপাখ্যান আখ্যা দিলে ভুল হবে না। বিশেষ করে ক্যারিয়ার গোছানোর সময়টা। আপ-ডাউন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। আপের ঠিক পরেরটা ডাউন। ডাউনের ঠিক পরেরটাই আপ। ২০০৯ সাল। তেমনই এক 'ডাউনের' মুহূর্ত চলছিল আমার জীবনে। ভয়াবহ রকমের ডিপ্রেশানে ভুগছি তখন। এমন এক সময়ে হঠাৎ করে নামাজ পড়বার ভূত চাপল মাথায়। যেহেতু প্রচণ্ডরকমের সন্দেহবাদী ছিলাম, তাই মনের মধ্যে এরকম অদ্ভুত ইচ্ছা জাগতে দেখে নিজেই নিজের প্রতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লাম। তবুও, মনের খুব গহীন কোণে, কে যেন আমাকে এক অদ্ভুতভাবে বলে যাচ্ছে, 'দেখোই না কী হয়'। সেদিন কয় ওয়াক্ত, কয় রাকাত নামাজ পড়েছিলাম—এখন আর মনে নেই। তবে ওই রকম সুন্দর নামাজ মনে হয় আমি আমার জীবনে আর কখনও পড়িনি। আমি বলেছিলাম :

"মালিকি ইয়াওমিদ্দিন, ইয়া কানা'বুদু ওয়া ই'ইয়াকা নাসতাইন। ইহদিনাস সিরাতল মুস্তাকিম।"

কিছু কিছু অর্থ বুঝতে পারতাম।

Scanned with CamScanner

'বিচার দিনের মালিক, আমরা শুধু তোমার আরাধনা করি আর তোমার কাছেই যাবতীয় সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথ দেখাও, আমাদের সরল পথ দেখাও'।

তবু সংশয় কাটল না। এরপর অভিনব এক 'আপ'-এর মুহূর্ত এলো। বুয়েটে চান্স পাওয়ার কল্পনাও করিনি কখনো; কিন্তু কীভাবে কীভাবে যেন চান্স হয়ে গেল। এরপর সিদ্ধান্ত নিলাম, ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবোই। নিজে যাচাই করে দেখবো সত্য-মিথ্যা। তখনও কিন্তু আমার স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল—'ধর্মগুলো মানুষের বানানো'। আর আমার কাছে প্রায় যাবতীয় ইসলামিক কর্মকাণ্ডই হাস্যকর মনে হতো। আমি কোনো ভদ্র বা সুশীল নাস্তিক ছিলাম না, মিলিট্যান্ট এথেইস্টদের মতো ব্লাসফেমি ছিল আমার ভেতরে। দুঃখের বিষয়, বুয়েটে ক্লাস শুরুর আগে প্রায় ছয় মাস অবসর পেলাম গবেষণা করার ইসলাম নিয়ে; কিন্তু কিছুই করলাম না।

বুয়েটে আসার পর শুরু হলো জীবনের আরেক নতুন অধ্যায়। হল-জীবন আমার কোনোদিন ভালো লাগেনি। আমি ভালোবাসি নিয়মমাফিক জীবন। দেশের সেবা করবার ব্রত নিয়ে আমি ছাত্রলীগের রাজনীতিও করেছি কিছুকাল। তারপর হয়ে গেলাম ফুল টাইম ন্যাশনাল লেভেলের ব্রিজ প্লেয়ার। একেবারে যাকে বলে ইয়াংস্টার। সময় বয়ে গেল। ধর্ম, দর্শন আর কবিতা ধুয়ে মুছে গেল ৫২ কার্ডের বিস্তর কম্বিনেশন আর সম্ভাব্যতার অংক কষতে কষতে।

আরেকটি 'ডাউন' সাইড অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল জীবনে। সেটি এলো ২০১২ সালের শেষের দিকে। তিন বছর পরে আমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমার স্মরণে এলো। কোনো এক নিশ্চুপ নির্ঘুম রাতের কথা। ঘড়িতে সময় তখন দু'টো। পৃথিবী তখন এক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মানসিক যন্ত্রণা আর হতাশার আঘাতে ক্লিষ্ট আমি সে রাতে আহসানউল্লাহ হলের ক্যান্টিনের বারান্দায় একটি ভাঙা টেবিলে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম, এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত; জীবনকে গুছিয়ে ফেলতে হবে। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। বলে রাখি, ওই সময়টায় তাবলিগ জামাতের ভাইদের গোছালো জীবন আমাকে খুব করে টানত।

পড়া শুরু করলাম। উহু, মওদুদির তুলনামূলক সংস্কৃতির বই নয়, গাজালির দর্শনের সমারোহ না, এমনকি ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের সিলিসিলাময় সায়্যিদ কুতুবও আমার পাঠের বিষয় নয়। আমি টেক্সট বই পড়া মানুষ, নোট বইতে আমার চলবে কেন?

Scanned with CamScanner

আমি কুরআন পড়তাম। বুঝতাম না। বাংলা পড়তাম। ভালো লাগত না। তারপর, কবে ঠিক মনে নেই, ইংরেজি পড়া যেদিন শুরু করলাম সেদিন মজা পেতে লাগলাম। ফার্স্ট হ্যান্ড মজা। কোনো শাইখ নেই, তাফসির নেই। শুধু শব্দার্থ আর সহিহ ইন্টারন্যাশনালের টুকটাক ব্যাখ্যা। আর পড়তাম উইকিপিডিয়া। বদর-উহুদ-খন্দক। অনেক জীবনী, অনেক তথ্য। নামাজ পড়তাম অল্প অল্প। সম্ভবত জীবনকে সাজিয়ে ফেলবার মানসিক ব্যায়াম মনে করে। তারপর, একদিন একটা আয়াত পেলাম যেখানে ঈশ্বর, ডুবন্ত অবস্থায় ঈমান আনা ফিরআউনকে উদ্দেশ্য করে বলছেন...

অতএব আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।[১]

এই আয়াতটি আমি আগেও পড়েছি। তখন ততটা দাগ কাটেনি মনে। অথবা এখন যখন পড়ি তখন মনে হয় এ আর এমন কী আয়াত। এর চাইতে ভয়াবহ জিনিস আছে আল্লাহ্‌র কিতাবে; কিন্তু তখন কেন জানি খুব দাগ কেটেছিল। মনের একেবারে গহীন কোণে আঘাত করেছিল। সে আঘাতে টুকরো টুকরো হয়েছে আমার ভেতরের অহমিকা। হৃদয়কে অণু পরমাণুতে ভেঙে ফেলে জোড়া দিয়েছিল নতুন করে।

আমি পাগল হয়ে গেলাম। এই আয়াতের ব্যাখ্যা কী দেওয়া যেতে পারে সেটা অনেক পরের কথা। প্রথম কথা হলো, এই অনুবাদ কি আসলেই সঠিক আরবির অনুবাদ? ফেরাউনের মমি আবিষ্কারের পর হুজুরেরা এর অনুবাদ পরিবর্তন করেনি তো ? আরবি যতটুকু পারতাম শব্দ মেলাতে চেষ্টা করে দেখতাম...

নাহ, বুঝি না।

অথবা এও তো সম্ভব যে, কুরআনে নতুন আয়াত সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের ইতিহাস নিয়ে লেগে গেলাম। সংকলনের গলদ ধরবার চেষ্টা করলাম। যেটা পেয়েছিলাম তা হলো, এই আয়াত আর উসমানি কুরআনের আয়াত একই। উসমানি মুসহাফ হলো সেই মুসহাফ যা উসমান (রা.) মৃত্যুর সময় পড়ছিলেন।

১ সূরা ইউনুস ১০: ৯২

Scanned with CamScanner

মানে হলো, সেই সপ্তম খ্রিস্টাব্দের বিষয় যখন ফেরাউনের মমি থেবসের গুপ্ত কবরখানায় কবর চোরদের ধোঁকা দিতে দিতে ব্যস্ত।

এইখানে থেমে যাওয়া উচিত; কিন্তু আমি পুরো সত্যটা বলতে পছন্দ করি। আমার মাথায় শেষ যে যুক্তি এলো, তা হলো, মিশরীয়রা যে মমি করত তা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানত না। তারপর একটা লাম্পসাম হিসাব নিকাশ করে লিখে দিয়েছে সে, যাতে মানুষ একসময় কাউকে-না-কাউকে খুঁজে পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে ভাববে—মুহাম্মাদের বাণী ঠিক। আমি এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন নিয়ে লাগলাম। কোথায় সমস্যা? এই লোক কী করে মমির খবর পেল? কোথায় মক্কা থেকে এই লোক কখন বেরিয়েছিল 'ইকরা বিসমি রব্বি' পড়বার আগে? দেখেছিলাম, তার জীবনের একটি অংশের খুব বেশি ইতিহাস নেই। সেটা হলো ২৫ বছর থেকে ৪০ বছর বয়স। কাজেই এই সময় গুহায় যাবার নাম করে বাইবেল, ইতিহাস ইত্যাদি পড়া অস্বাভাবিক কিছু না।

তারপর থামলাম। হৃদয়কে প্রশ্ন করলাম, 'এটা কি সত্যি হতে পারে যে, একই সঙ্গে একজন লোকের সব কথা সত্যি হয়ে যাবে, আর একটাও মিথ্যা হবে না। অথবা আমি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বড্ড একপেশে জেদের আশ্রয় নিচ্ছি না? কোনো স্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করবার জন্য ঐতিহাসিক দলিল ছাড়া মনগড়া কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি না তো? আমি ইতিহাসের সৎ ছাত্র, তাই আমার হৃদয় হুমায়ুন আজাদ হতে পারেনি।

ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলে মিনিমাম দলিলের প্রয়োজন হয়। এটা ইতিহাসের একটা এটিকেট। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের উপর উইলিয়াম মুরের মতো লোকেদের কমেন্ট পড়েছি কয়েকটা ইভেন্টে। মুরেরা ছাগলের মতো শুধু কল্পনাপ্রবণ হয়ে কোনো বিষয় বলে দেন না। শুধু একটা পসিবিলিটি বাকি থাকে। তা হলো, মুসলিমদের লম্বা শাসনের ইতিহাস। এই দীর্ঘ ইতিহাসে চতুর মুসলিম শাসকেরা মুহাম্মাদের মিশর ভ্রমণের ইতিহাস বেমালুম চেপে গেছে। যদিও ফেরাউনের মমি তৈরি হয়েছিল তারও ১৬০০ বছর আগে, আর আমি আদৌ নিশ্চিত নই—ওই সময় মিশর গেলেই মমির খবর পাওয়া যেত কি না। তারপরও বলছি, মুসলিম শাসকেরা কেন এই মিশর ভ্রমণের ইতিহাস গোপন করবে? মা আয়িশার চরিত্রে কালি লাগানোর চেষ্টার ইতিহাস তো তারা গোপন করেনি। মা আয়িশা নিজে বর্ণনা করেছেন সদর্পে যে, তিনি সকালবেলা এক বেগানা পুরুষের সাথে মদিনায় ফিরেছেন; আর সারা রাত তিনি পথেই ছিলেন। মুসলিম শাসকেরা সেই ইতিহাস

Scanned with CamScanner

গোপন করেনি—যখন বলা হলো, মুহাম্মাদ নিজের পালিত ছেলের বউ আর চাচাতো বোনের রূপের প্রেমে পড়ে চার স্ত্রীর জায়গায় পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করতে চায়। অথবা যখন সূরা নাজমের আয়াত পরিবর্তনের ইতিহাস; যা নিয়ে The Satanic Verses নামে রুশদি একটা নভেল লিখে বিখ্যাত হয়ে গেছে। আর কবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন নীল নদেরও পশ্চিম তীরে, সেই ইতিহাস আব্বাসীয়রা একেবারে মাটিচাপা দিয়ে দেবে?

আমি ততদিনে ইসলামের আরও অনেক বিষয়ে অভিভূত হয়ে নিজের প্রতি একটি সুবিচার করেছিলাম। যুক্তি মানুষকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবেই—যেখানে প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে অসংখ্য কারণ দাঁড় করানো যায়; কিন্তু যুক্তি দিয়ে যুক্তি প্রয়োগের শিক্ষা একমাত্র এই পৃথিবীর মালিক দিতে পারেন। কুরআনের এমন অসংখ্য আয়াত, ভবিষ্যদ্বাণী আছে যেগুলি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে, এটি মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয় কিছুতেই। আমি এখানে ছোট্ট একটি উদাহরণ আনলাম মাত্র। ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণা কোনো ইউটোপিয়ান বিষয় নয়। ইসলামের প্রায়োগিক দিকগুলো শুধু সুন্দর নয়, বেস্ট। কুরআনের ভাষাগত সৌন্দর্য আমি এখনও যে বুঝি—তা না, আর তখন তো বোঝার প্রশ্ন-ই ছিল না।

এই কথাটা আমি খুব বিশ্বাস করি :

মাই ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লাল্লা। ওয়া মাইইয়ুদলিলহু ফালা হাদিইয়ালা।

"Whomsoever Allaah guides, none can leave astray. And whomsoever Allaah leaves astray, none can guide."

আমি শুধু একটি কিতাবের উপর ইমান এনেছিলাম। আর ইমান এনেছিলাম তার মালিকের প্রতি। আত্মসমর্পণ করেছিলাম যুক্তিতে হেরে গিয়ে। শুধু জেনেছিলাম—এই কিতাব এই বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার প্রেরিত, যিনি লালন করেন সমগ্র সৃষ্টিকে। আর আমাকে মানতেই হবে এর কথা। অনন্যোপায় নেই। এই কিতাব আমাকে শিখিয়েছিল, তার রব কেমন তা। এই কিতাব জানিয়েছিল, কীভাবে অনস্তিত্বের জগত থেকে আমি সালমান অস্তিত্বে এলাম। আমার হাদিসের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, কিতাব আমাকে শিখিয়েছিল যে, তা যে মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাও সত্য।

আমি শূন্য থেকে ইসলামকে শিখেছি। আমার যাত্রা এখানেই শেষ নয়, তবে গল্পটার

Scanned with CamScanner

শেষ। আমি আমার নিজের কাছে এবং আমার রবের কাছে সৎ থাকবার চেষ্টা করেছি চিরকাল। ভয় পেয়েছি। ঠিক যাচ্ছি তো! সাহায্য চেয়েছি। আমার কাছে থাকা তথ্য দিয়ে সবকিছু যাচাই করে যেটা ভালো মনে হয়েছে সেদিকে গেছি

ইসলামের যে বিষয়টি আমাকে বিমোহিত করে তা হলো ইসলামকে নতুন করে আবিষ্কার করা যায় প্রতিমুহূর্তে। ইসলামের বিধানগুলোর প্রায়োগিক যৌক্তিকতাকে দিন-কে-দিন নতুন নতুন করে উপলব্ধি করা যায়। এটি আমাকে আজও ইসলামকে নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে।

শেষকথা :

ইসলাম পৃথিবীতে আজব দর্শন হিসেবে গণ্য হয়েছিল। এখনও হচ্ছে। গ্যালিলিও, মার্ক্স কিংবা নেই ঈশ্বরবাদের জনকদের তৈরি করা এই সভ্যতার মধ্যগগনে এসে, আমার মতোন ছেলেরা ইসলাম গ্রহণ করে, এটিই আমার কাছে বড় তাজ্জব ব্যাপার মনে হয়। আমি বড় হয়েছি যেসব বই পড়ে, অথবা কাল আমার ছেলেমেয়েরা যা পড়ে বড় হবে তার পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে নাস্তিকতার বীজ। এগুলো আর কে কতটা বোঝে, জানি না; আমি বুঝি। এইজন্যই আমার চারদিকে নাস্তিকতার ভিড়, সংশয়ের তীব্রতা, যুক্তি আর পালটা যুক্তির মারামারি।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এই ফিতনা থেকে রক্ষা করুন। যৌক্তিকভাবে যুক্তি প্রয়োগের তৌফিক দিন। আমাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদেরকে রক্ষা করুন জাহান্নামের আগুন থেকে। কেননা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য, আর কেয়ামত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন কিছু আছে—যা শুধু চিন্তাশীলদের জন্য সংরক্ষিত।

Scanned with CamScanner

স্রষ্টার সন্ধানে

Scanned with CamScanner

সেই মিছিলের দেখা

অরিজিৎ রায় (আতিক আব্দুল্লাহ)

যে কথাগুলো বলার ছিল :

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> *'প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (স্রষ্টার প্রতি স্বভাবজাত বিশ্বাস)-এর উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা জরথুস্ত্রি বানায়।[১]'*

অর্থাৎ, সবার মতো আমিও মুসলিম হিসেবেই জন্মেছিলাম। পরে বাবা-মা আমাকে মুশরিক বানিয়েছিল। বড় হওয়ার পর সঠিক পথ চেনার চেষ্টা করেছিলাম।

আল্লাহপাক আমাকে সঠিক পথ চিনিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এখন, ইসলাম বোঝার ও গ্রহণ করার পর, প্রায়ই আগের জীবন নিয়ে ভাবি। কুড়ি-একুশ বছরের শিরক, কুফুরির সেই ভয়াবহ জীবন এবং তারপর আল্লাহর অনুগ্রহে ইসলামের পথে ফিরে আসার পরবর্তী চার বছর নিয়ে যত ভাবি—আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় দেহ-মন সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। মুখ থেকে এমনিতেই বের হয়ে আসে—আলহামদুলিল্লাহ! ইয়া আল্লাহ,আমার মা-বাবাকে তুমি হেদায়াত দান করো। তুমিই তো হেদায়াতের মালিক। যে বন্ধুটির কাছে প্রথম ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলাম, তাকে আজ হারাম কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখি। ওর এই অবস্থা

---

১ *সহিহ মুসলিম*, গ্রন্থ ৩৩-কাদর, হাদিস নং-৬৪২৩

Scanned with CamScanner

দেখে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ইয়া আল্লাহ, তুমি তাকেও হেদায়াত দান করো। আমিন।

প্রাথমিক অবস্থা :

পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে আমার জন্ম। সাধারণ গরিব হিন্দু পরিবার। গরিব হলেও বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় অনেক আদরের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছি। আমাদের সংসারে অর্থাভাব ছিল, কিন্তু আদরের কোনো অভাব ছিল না কখনো। আমাদের গ্রামটি খুব ছোট। বলা চলে, মুসলিম অধ্যুষিত একটি গ্রাম। চারপাশে মুসলিম পরিবার, আর মাঝখানে আমরা কয়েকটা হিন্দু পরিবার। ছোটবেলার দিনগুলো তাই মুসলিম পাড়াতেই কেটেছে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে একটি কথা খুব প্রচলিত। সেটা হলো—এই জনপদে নাকি হিন্দু-মুসলমানের মাঝে সখ্যতা হয় না কখনো। অথচ আমি যে গ্রামে বেড়ে উঠেছি, সেই গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এত ভালো সম্পর্ক যে, কেউ কখনো বলতেই পারবে না—এখানে দুটো ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক একসাথে থাকে। আমাদের মধ্যকার হৃদ্যতা, সৌজন্য এবং সখ্যতা ছিল এতটাই মধুমাখা। হিন্দু-মুসলমানের কোনো বিভাজনই কোনোদিন আমি অনুভব করিনি এখানে। যেহেতু খুব ছোটবেলা থেকে মুসলিমদের সংস্পর্শ পেয়েছি, তাই তাদের প্রতি একটা ভালো ধারণা ছোটবেলা থেকেই ছিল।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না। ধর্মের চেয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানই আমার প্রিয় ছিল সবসময়। পূজোগুলো ছিল আমাদের আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু। স্বরস্বতী-পূজা, দূর্গাপূজাসহ বিভিন্ন পূজাগুলোর জন্য সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকতাম। আমার পরিবারেও যে খুব ঘটা করে ধর্মচর্চা হতো, তাও না। আমার মা যুক্তি বোঝে, কিন্তু বাবা কিছুটা গোঁড়া। বয়স একটু বাড়ার পর থেকে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে খুব ভাবতাম। এর সাথে সমান্তরালভাবে আরও কয়েকটি বিষয় নিয়েও খুব চিন্তা করেছি। তারমধ্যে কয়েকটা এরকম—

১) মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় যেতে হবে?

এই প্রশ্নটা প্রায়ই আমার মনে ঘুরঘুর করত। হিন্দু কিংবা মুসলিমরা এর উত্তর হিসেবে যা শোনাত—তা আমার একদমই পছন্দ হতো না। কৌতূহল থেকে একে-ওকে জিজ্ঞেস করতাম। কোথাও সন্তোষজনক কোনো উত্তর পেতাম না। স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে জেনেছিলাম, বিজ্ঞানও নাকি এর উত্তর জানে না। খুব বেশি মুভি

Scanned with CamScanner

দেখতাম তখন। হলিউডের কয়েকটা সিনেমা দেখার পর মনে হয়েছিল—মানুষ বোধহয় অন্য কোনো উন্নত প্রাণির আবিষ্কৃত পুতুল। সেই উন্নত প্রাণিরা পৃথিবীর বাইরে কোথাও থাকে। সেখান থেকেই কোনো-না-কোনো মাধ্যমে পৃথিবীকে ওরা নিয়ন্ত্রণ করে। যাইহোক, মোটকথা, এই বিষয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি তখন। আসলে সিদ্ধান্তে আসতে পারার মতো যথেষ্ট কোনো প্রমাণ পাইনি। তবে এটাও ঠিক যে, এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি কোনো ধর্মীয় পণ্ডিত, কোনো পুরোহিত অথবা কোনো আলেমের শরণাপন্ন হইনি। আমার চারপাশের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতাম। তারা নিজেদের মতো করে উত্তর দিত। একেকজন একেকরকম। একসময় হার মেনে নিলাম। এই বলে তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম যে, মৃত্যুর পর এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চিত জানতে পারবো। তবে একটা অদ্ভুত ভয় কাজ করত সবসময়। মনে হতো—যে বা যারা আমাকে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে, নিশ্চয় কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই পাঠিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্য যদি মৃত্যুর আগে জানতে না পারি, কী জবাব দেব তাকে বা তাদেরকে?

২) হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের মধ্যে নারী-পুরুষ ভাগ আছে। আর সেই সমস্ত নারী-ঈশ্বরদের নিয়ে বহু ভীতিকর গল্প প্রচলিত আছে। আমিও সেসব শুনেছিলাম দিদা, জেঠিমাদের কাছে। তাতে ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, রাতে আমি ভূতের চেয়ে ভগবানকেই বেশি ভয় পেতে শুরু করলাম। তখন আমার মনে হলো, ভগবানকে কেন ভয় পাচ্ছি? ভগবানকে তো ভক্তি করতে হয়। মন তখন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ভগবানকে উদ্দেশ্যে করে বললাম— 'যতদিন না তুমি আমার মন থেকে ভয় সরিয়ে দিয়ে ভক্তি ফিরিয়ে আনছ, ততদিন আমি তোমাকে প্রণাম করব না।'

যতদূর মনে পড়ে, সেদিনের পর থেকে আর কখনোই কোনো ভগবানকে আমি প্রণাম করিনি।

৩) যদিও আমাদের গ্রামে দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে হিংসা ছিল না, তবে সুযোগ পেলেই এলাকার মুসলিম ছেলেরা আমাদের পিছনে লাগত। হিন্দু দেবদেবীদের কেচ্ছা, মক্কায় ভগবান শিবকে আটকে রাখা ইত্যাদি ঘটনাই ছিল বিদ্রুপের বিষয়বস্তু। আমার খুব খারাপ লাগত। ধর্মকর্ম করি না তো কী হয়েছে? তাই বলে আমার পৈতৃক ধর্মকে আমার সামনে অপমান করা হবে আর আমি তা সহ্য করবো? এলাকায় আমরা যে ক'জন উঠতি হিন্দু তরুণ ছিলাম, আমরা মুসলিম ছেলেগুলোর বিদ্রুপের যুতসই কোনো উত্তর দিতে পারতাম না। আমরাও ওদের বিদ্রুপ করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খুব কম জানার কারণে আমরা তাদের সাথে

Scanned with CamScanner

পেরে উঠতাম না। তবে আমি খুবই আগ্রহ নিয়ে মুসলিম ছেলেগুলোর সাথে তর্ক এবং আলোচনা করতাম। কারণ, আমার মনে বাস করত ওদের হারানোর এক অদম্য বাসনা। এভাবে জীবনের বিশ বছর অতিবাহিত হলো। আমি নামকাওয়াস্তে হিন্দু রয়েই গেলাম। পূজো আসত। পূজো যেত। কিন্তু আমার আর ধার্মিক হয়ে ওঠা হয় না। তবে আমি ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে কখনোই নিজেকে পৃথক করিনি। পূজোগুলোকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিভিন্ন পার্টি হতো। ড্রাম আনা হতো, মাইক ভাড়া করা হতো। এলাকার হিন্দু যুবক-যুবতি, বয়স্ক, মধ্য-বয়স্ক সব শ্রেণির মানুষে কানায় কানায় পূর্ণ থাকত পূজোমণ্ডপ। খুব মজা করতাম সবাই মিলে। রঙ মাখামাখি, নাচানাচি, গান গেয়ে পার হতো পূজোর রাতগুলো।

আমি তখনও ভগবানকে প্রণাম করতাম না। তবে ধন্যবাদ দিতাম এসব নানান আয়োজনের উপলক্ষ হবার জন্য। আমি মনে মনে বিশ্বাস করতাম, একদিন ভগবান ঠিক ঠিক আমার মনে ভয়ের বদলে ভক্তির উদ্রেক করবেন। সেদিন থেকে আমি আবার ভগবানকে প্রণাম করবো। মন ভরে।

সম্ভবত কলেজ জীবনের শেষের দিকের কথা। পাশের গ্রামের এক মুসলিম বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম একটি কাজে। আমাকে দেখে আমার বন্ধুটি সহোৎসাহে বলল,—'চল, তোকে আজ দারুণ একটা জিনিস দেখাবো।'

সে আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমি কৌতূহলী মন নিয়ে বন্ধুটির সাথে পাশের একটি বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি—সেখানে ঘরভর্তি মানুষ। সবাই মুসলিম। টিভিতে একটি লেকচার চলছে। লেকচার দিচ্ছিলেন শুকনো গড়নের এক লোক। মুখে দাঁড়ি। গায়ে সম্ভবত কোট এবং গলায় টাই ঝুলানো। লোকটা যা বলছে তা আমি কিছু অংশ বুঝতে পারছিলাম, আবার কিছু অংশ বুঝতে পারছিলাম না। যে অংশ বুঝতে পারছিলাম না সেই অংশটুকু সম্ভবত আরবি ছিল। এজন্যই বুঝিনি হয়তো-বা। তবে এটুকু বুঝেছিলাম যে, এই লোক মুসলিম এবং টিভিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসলিমদের পক্ষে সাফাই গাইছে। বন্ধুটি আমাকে বলল,—'লেকচার দেওয়া মানুষটিকে চিনিস? তার নাম জাকির নায়েক'।

আমি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম সেদিন। বিরক্তও হচ্ছিলাম। কোন লেকচারটা শুনেছি সেটা আর ঠিক মনে নেই। তবে সেদিন আমি কোনোরকম আকৃষ্ট হইনি; বরং একরাশ বিরক্তি নিয়ে বাসায় ফিরেছি।

Scanned with CamScanner

এরপর প্রায় তিন বছর আর কোনোরকম ধর্মকর্মের সংস্পর্শে আসা হয়নি আমার। যেহেতু নিজের ধর্ম আমাকে খুব একটা টানত না, তাই ধীরে ধীরে ভোগবাদী জীবনযাপনের দিকে ঢলে পড়ি তখন। আস্তে আস্তে জীবনযাত্রা আমূল বদলে যাচ্ছে। নতুন মোবাইল কিনেছি। ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খোলা হয়ে গেছে। নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে। অনলাইন জগতের সাথে ধীরে ধীরে সখ্য বাড়তে লাগল। মোদ্দাকথা, গ্রামের হাবাগোবা সেই আমি শহরের জল-হাওয়ায় যেন উড়তে শুরু করেছি। অনলাইন জগতেও হিন্দু-মুসলিম প্যাঁচাল আমাকে পেয়ে বসল। মুসলমানের সন্তানেরা আমাদের ধর্ম নিয়ে যা মন চায় লেখে। খারাপ লাগত। টুকটাক জবাবও লিখতাম। মনে মনে চাইতাম—ভগবান যেন এদের কোনোদিন ক্ষমা না করে। আমি খেয়াল করলাম, বড্ড সহজ সরল এবং মুসলিম অধ্যুষিত এক গ্রামে বড় হওয়া সেই আমার মধ্যেও এখন প্রবলভাবে ধর্মীয় অনুভূতি কাজ করছে। মুসলিমদের সাথে হেসে-খেলে বড় হওয়া আমি'র মাঝেও কেমন করে যেন মুসলিমদের প্রতি জিঘাংসা জেগে উঠল। এভাবেই চলছিল।

একদিন পাশের বাজারে গিয়েছি মোবাইলে টাকা রিচার্জ করতে। দোকানটায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ পড়ল একটা বইয়ের উপর। অন্য একটা জিনিসের উপর বইটি রাখা ছিল। বইটার নাম ছিল—'*মোরা বড়ো হতে চাই*'। খুব সম্ভবত বাচ্চাদের বই। আগ্রহ নিয়ে একটা দুটো পাতা উল্টে পাল্টে দেখলাম। খুব ইন্টারেস্টিং মনে হলো। দোকানি কাকুটা ছিল মুসলিম। আমি বইটা পড়তে চাইলে সানন্দে দিয়ে দিলেন মুসলিম কাকুটি। বাড়ি ফিরে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম বইটি। একটু মুসলিমঘেঁষা হলেও বেশ ভালো লাগল পড়ে। এই বইটি আমার মনে দারুণ এক আকর্ষণ তৈরি করল। সেই আকর্ষণ থেকেই পরবর্তী সময়ে আমার ইসলামি বই-পুস্তক পড়া শুরু।

'*মোরা বড় হতে চাই*' বইটি পড়ে ফেলার পরদিন আবার গেলাম সেই দোকানে। গিয়ে মুসলিম কাকুটিকে বললাম এই ধরনের বই যদি আরও থাকে তাহলে আমাকে দিতে। আমি পড়তে চাই। তিনি খুব খুশি হয়ে আমাকে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বই দিলেন। ঠিক মনে নেই সেদিন কী কী বই দিয়েছিলেন। তবে বইগুলো সব পুরোপুরি ইসলামিক। একটু অস্বস্তি হলেও বইগুলো নিলাম। কেননা, আমার মনে তখন অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। ভগবান, ইশ্বর, পরকাল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি নিয়ে। ইসলামিক বইগুলো পেয়ে ভাবলাম,—'যাক, এবার তাহলে মুসলিমদের সম্পর্কে কিছু হলেও জানতে পারবো। মুসলমানের সন্তানদের সাথেও ভালো করে তর্ক করা যাবে। ওদের ভালোভাবে প্যাঁচে ফেলা যাবে।'

Scanned with CamScanner

তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক ধর্মের ভিতরেই অনেক ভুল আছে। ইসলামের ভুল খোঁজার জন্য খুব উৎসাহের সাথেই বইগুলো পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অল্প পড়ার পরেই আমার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন যেন পাল্টে যেতে শুরু করল। মনে হচ্ছিল, এতদিনের না পাওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো একে একে বইগুলো আমাকে দিতে শুরু করেছে। তখন একটা অন্যরকম অনুভূতি কাজ করতে লাগল আমার ভিতরে। এতদিনের এত এত প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ একসাথে পেতে থাকলে যা হয় আরকি। কয়েকমাস আমি পাগলের মতো এই বইগুলো পড়েছি। কয়েকবার করে। ছোট ছোট বইগুলো পড়া শেষ হয়ে গেলে মুসলিম কাকুটির কাছে আবার গেলাম। আরও কিছু বই চাইলাম কাকুর কাছে। সেবার কাকু আমাকে আমপারার একটি তাফসির এবং নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি জীবনীগ্রন্থ দিয়েছিলেন। আমপারার তাফসিরেই আমার প্রথম কুরআন পড়া। আমার আজও মনে আছে, প্রথম কুরআন পড়ার সেই অপার্থিব অনুভূতি! সেই স্বর্গীয় সুধা!

প্রথম কুরআন পড়ার পর আমার ভিতরে যে অনুভূতিগুলো হয়েছিল তা এরকম—

১) এত জীবন্ত এবং হৃদয়স্পর্শী বই আমি কখনো পড়িনি। পড়তে পড়তে মনে হতো—এই কথাগুলো যেন আমাকে উদ্দেশ্য করে এক্ষুণি কেউ বলছে।

২) জাহান্নামের আয়াতগুলো আমার ভিতরে প্রচণ্ডরকম ঝড় সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আমি পড়তাম আর নিজেকে জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পেতাম। উফফফ! কী ভয়ঙ্কর! মাঝে মাঝে ভয়ে কাঁপতাম।

৩) 'আন নাবা' নামের একটি সুরা আমার মনে খুব দাগ কাটে। 'আন নাবা' মানে হলো 'মহাসংবাদ'। সত্যি সত্যিই এই সুরার মধ্যে আমি সত্যিকারের মহাসংবাদের সন্ধান পেয়েছিলাম।

কুরআন পড়ার পরে আমার মনে হলো, আমার চোখের সামনে সব দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম—দু'টি রাস্তা। একটি সোজা, অন্যটি বক্র। সোজা রাস্তাটির নাম সিরাতুল মুসতাকিম। এই রাস্তাটি একটা গন্তব্যে গিয়ে থেমেছে। গন্তব্যের নাম 'জান্নাত'। অন্য রাস্তাটিও একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই গন্তব্যের নাম 'জাহান্নাম'। আহা! কী দুর্ভোগই না সেখানে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ভাবতেই যেন আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

আমার সামনে তখন সত্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আমি ফিরে পেলাম আমার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে। আমি ফিরে পেলাম আমার সহজাত ধর্মকে। এই

Scanned with CamScanner

সহজাত ধর্মের কথাই তো নবিজি বলেছিলেন। আমি মুসলিম হয়ে জন্মেছি। আমার পরিবেশ আমাকে মুশরিক বানিয়েছে। আমার মনে স্বর্গীয় এক হাওয়া যেন দোলা দিয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম আমার এতদিনের ধর্ম, আমার এতদিনের বিশ্বাস সব ভুল! সব মিথ্যা! আমি মিথ্যে, বানোয়াট, মানুষের সৃষ্ট ঈশ্বরের পূজো করতাম। এরা কখনোই আমার ঈশ্বর হতে পারে না। আমার ইশ্বর তো তিনি, যাকে আমি আমার প্রতি মনোযোগী, আমার প্রতি দয়ালু, আমার ব্যাপারে আন্তরিক হিসেবে পেয়েছি। যিনি আমাকে জানিয়েছেন সুসংবাদ। পথ ভুল করলে যিনি আমাকে শাসনের সুরে পথ বাতলে দিয়েছেন বার বার। আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। পুনরায় পাগলের মতো আরও ইসলামি বই সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম, কোনো একটা জিনিস যেন আমাকে চুম্বকের মতো তার দিকে টেনে চলেছে। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম একটি ডাক। সত্যের ডাক। কেউ যেন আমায় নিজের ঘরে, নিজের সহজাত বিশ্বাসের দিকে ডেকে চলেছে 'আয় আয়' বলে।

এভাবে কেটে গেল আরও কয়েক মাস। যথারীতি ইসলামের মধ্যে কোনো ভুল কিংবা কোনো অসংগতিই আমি খুঁজে পেলাম না। এরই মধ্যে জাকির নায়েকের লেকচার শুনতে শুরু করেছি নিয়মিত। কয়েকদিনের মধ্যে তার প্রায় সবগুলো লেকচারই শুনে ফেললাম। এভাবে মোটামুটি একবছর পার হলো। আমি তখন পুরোপুরি ক্লিয়ার। আমার সকল প্রশ্ন, সকল সন্দেহ, সকল জিজ্ঞাসার উত্তর ইসলাম আমাকে খুব সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছে। আমার মন তখন সত্য গ্রহণ করার জন্য ছটফট করতে লাগল। আহা! সেই মহাসত্য! সেই সত্যকে বরণ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল আমার অন্তর। আমার মনের জগতে তখন উথাল-পাতাল অবস্থা। কখন আমি সেই সত্যকে বরণ করে নেবো সেই অস্থিরতা আমাকে পাগল করে তুলল।

কয়েকদিন পর আল্লাহ তৌফিক দিলেন। পরিচিত এক আলেমের কাছে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করার দিন ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু কোনো কারণবশত সেই আলেম সেদিন আসতে পারেননি। সম্ভবত খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই। খুব মনখারাপ হলো সেদিন। ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। যদি শাহাদাহ পাঠ করার সুযোগ না পাই? তাহলে কী হবে? আমি কি অমুসলিম হয়ে মরবো? ভাবতেই আমার গা শিউরে উঠতে লাগল। যাহোক, তার জন্য অপেক্ষা করা আর হলো না। সেদিন উপস্থিত দুই মুসলিম দাদার হাতে হাত রেখেই শাহাদাহ পাঠ করে নিলাম। সে এক অপার্থিব স্বপ্নপূরণ। আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

Scanned with CamScanner

ইসলাম গ্রহণের পর মনে প্রচুর আবেগ তৈরি হলো। আমি যে সামাজিকভাবে এখনো হিন্দু সেটা মনেই ছিল না। একদিন করলাম কী, এলাকার কয়েকজন মুসলিম ছেলেমেয়েকে নিয়ে সন্ধ্যের পর বসলাম। উদ্দেশ্য—ইসলামি আলোচনা। আমি কয়েক মিনিট কুরআনের দারস দিলাম। বক্তব্য শেষ হলে ওদের কাছে মতামত চাইলাম। তাদের মধ্যকার একজন খুব গম্ভীর গলায় বলল—'সব ঠিক আছে। শুধু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিসনি'।

সেই কথা মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়। সেসময় মুসলিম পাড়ায় অনেককে ইসলাম বোঝানোর চেষ্টা করেছি। অথচ তাদের কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা তখনো বলিনি আমি! এমন অনেক পাগলামি করতাম। নিজেকে সবসময় একজন দায়ি-ইলাল্লাহ ভাবতে ভালো লাগত। বেশিরভাগ মুসলিম অবাক হয়ে আমাকে দেখত। কেউ কেউ একজন হিন্দুর মুখে ইসলামের কথা শুনে বিরক্তও হতো বটে। কিন্তু ঘটনাগুলো আমাকে খুব মজা দিত।

যে কথাগুলো না বললেই নয় :

ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছি মোটামুটি চার বছর হচ্ছে। এখনো প্রকাশ্যে আসিনি। বাড়িতেও কেউ জানে না।

একসময় মনে হতো, আমাদের কেন এত কষ্ট সহ্য করতে হয়? মুসলিম ঘরে জন্মানো কেউ যখন প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তো তাকে আমাদের মতো এতো স্ট্রাগল করতে হয় না। বহুদিন আগে অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। আসলে মুসলিম পরিবারে জন্মে প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসা মানুষগুলোর লড়াই আর অন্য ধর্ম থেকে ইসলামে আসা মানুষগুলোর লড়াইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নওমুসলিমদের লড়াই তাদের নিজের নিজের পূর্বধর্ম এবং সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে। কিন্তু মুসলিম পরিবারে জন্মানো ইসলামপন্থীদের নিজের সমাজেরই একাংশ এবং সমগ্র মুসলিম সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ইসলামী মূল্যবোধের ভয়ংকর স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। আমরা সত্য গ্রহণের পর বেড়ে ওঠা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের ভুলত্রুটির উপর আঙুল তুলি। আর জন্মগত মুসলিমদের সত্য গ্রহণের পর সমাজের সাথে হাঁটতে হাঁটতেই সমাজের বিরুদ্ধে আঙুল তুলতে হয়। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দুটো লড়াই। দুটো লড়াইয়ের মধ্যে তাই কোনোরকম তুলনাই চলে না।

যেমন ধরুন, অসুন্দর মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই একটু হীনমন্যতায় ভোগে। মাঝে মাঝে কেউ হয়তো আল্লাহর সৃষ্টির উপরেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে—কেন তাকে

Scanned with CamScanner

আল্লাহ সুন্দর চেহারা দিয়ে বানালেন না? আসলে এই প্রশ্ন তোলার কোনো সুযোগই নেই। কেননা, আমরা গায়েব জানি না। এমনও তো হতে পারে, সেই মেয়েটি যদি সুন্দর হতো, একদিন তার এই সৌন্দর্যের কারণেই তাকে কোনো পুরুষের হাতে লাঞ্ছিত হতে হতো। যেমনটা প্রত্যেকদিন সংবাদপত্রে আমরা পড়ি!

অতএব, আমাদের আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে হবে। অভিযোগ জানানোর কিছুই নেই। না চাইতেই আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তা পাওয়ার যোগ্যতাই আমাদের নেই। আমাদের তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আলহামদুলিল্লাহ।

কিছুদিন আগে আরেক নওমুসলিম ইরফান দাদার সাথে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন—'নওমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণের পর যে অনুভূতি পায়, জন্মগতভাবে মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা কোনো মুসলিমের পক্ষে বোধহয় সেই অনুভূতি পাওয়া সম্ভব নয়। এত কষ্টের মধ্যে এই অনুভূতিই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার।'

সত্যিই তাই। সম্পূর্ণ কুফরি পরিবেশে বড় হতে হতে হঠাৎ আল্লাহকে চিনে ফেলার এই অনুভূতি, অচেনা মানুষ নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবেসে ফেলার এই অনুভূতি, শত বাধা, বিপত্তি সত্ত্বেও নিজের সমাজ, ধর্ম, জাতি সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসলাম পালনের এই অনুভূতি—এককথায় অপার্থিব। মুসলিম পরিবারে বেড়ে ওঠা কারও পক্ষে এই অনুভূতি পাওয়া সম্ভব কি না, আল্লাহপাক জানেন। তবে নওমুসলিমদের কাছে এই অনুভব বিশেষ একটা উপহারই বটে, আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ সুবাহান ওয়া তাআলা আমাকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। সিরাতুল মুসতাকিমের পথে চলার তাওফিক দিয়েছেন। এজন্য বিশ্বজাহানের একমাত্র অধিপতি, একমাত্র চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্তার দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ। জানি সত্যের এই পথ কণ্টকাকীর্ণ, বড্ড পিচ্ছিল আর বন্ধুর। তবুও, এই পথ আমার রবের পথ। এটাই আমার ঠিকানা। আমার আজন্ম স্বপ্নময় গন্তব্য। রাব্বুল আলামিন আমাকে এই পথে কবুল করে নিন।

'বলুন সত্য এসেছে আর মিথ্যা ধ্বংস হয়েছে। মিথ্যা তো ধ্বংস হবারই ছিল' [১]

---

১ আল ইসরা, ১৭

শুদ্ধ আলোর প্রথম প্রহর

সুতীর্থ মুখার্জী

প্রত্যাবর্তন মানে হলো নিজের ঘরে ফেরা। নিজের হারানো সেই ঘর। দিনশেষে প্রত্যেক পাখি নীড়ে ফেরে। ফিরতে হয়। উস্তাদ জুনায়েদ জামশেদ একবার তারিক জামিল সাহেবকে উদ্ধৃত করে বলছিলেন— 'আমাদের শরীর মাটি দিয়ে তৈরি। সেইজন্য শরীরের যাবতীয় চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এসমস্ত কিছুই আমরা মাটির মধ্য থেকেই পেয়ে যাই। আবার রুহ অর্থাৎ, আত্মা যেহেতু আকাশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই এর খোরাকও আকাশ থেকে আসে। শরীরের খাদ্য দিয়ে আত্মার খিদে মেটানো যায় না'।

অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তন অর্থ হলো আত্মার খাদ্য খুঁজে পাওয়া। যে খাদ্যে আত্মার শান্তি মেলে। যে খাদ্য আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।

একটু পেছনে যাই। যদি আজ থেকে বছর চারেক আগের সময়ে দাঁড়িয়ে থাকি, তাহলে উপরের কথাগুলো আমার হাত থেকে কখনোই বেরোত না। টাইম মেশিনে যদি আমাকে তিন চার বছর আগে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে—এক উদ্ধত যুবক নিজের সমস্ত আবেগ এবং জেদ দিয়ে দুনিয়াকে দেখছে। যে নিজেই তার সৃষ্টিকর্তা। গাঁজা, মদ, সিগারেট এমন কোনো নেশা নেই যার স্বাদ আমার জিভ আস্বাদন করেনি। এমবিএ করেছি বাইরে থেকে। সেই হোস্টেলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া বন্ধুদের জুটিয়ে রাতভর ধরে চলত মদ, গাঁজা বা গানের আসর। আসলে তথাকথিত 'হিন্দু' পরিবারে জন্মেও নিজের ধর্মে আগ্রহ আমার কোনোদিনই ছিল না। ধর্ম বলতে কেবল উৎসবকেই বুঝতাম। দুর্গাপূজা, কালীপূজা বা সরস্বতীপূজা—এগুলোর প্রতি ভক্তি যত না ছিল, তারচেয়ে বেশি ছিল ওই পূজো নামক উৎসবে শামিল হয়ে স্বাধীনতাকে উপভোগ করা। এ স্বাধীনতা অবাধ মেশার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা আমার কামনা, বাসনা, কাম, যৌবন

Scanned with CamScanner

উজাড় করে দিয়ে উপভোগ করার স্বাধীনতা।

ইসলাম সম্পর্কে কোনোকালেই আমার কোনো কৌতূহল ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াকালীন সময়ে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জেনেছিলাম। তাই বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম যে 'সেরা এবং সত্য' ধর্মেই জন্মেছি। সুতরাং চিন্তার কোনো কারণ নেই। তার উপর পারিবারিকসূত্রে পাওয়া ব্রাহ্মণ্যত্ব। ব্যস, দুনিয়ায় আমার পুণ্যলাভ এবং পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি আর আটকায় কে!

এমন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের উপর ভর করেই ভারতের অন্যতম সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএসের সংস্পর্শে আসি। সেই সূত্রে বিজেপি অর্থাৎ, ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারও হই ২০১৩-১৪ সাল নাগাদ। কিছু ক্যাম্পেইন, মিছিল, ইভেন্টেও অংশগ্রহণ করেছি। বাড়ির লোকজনের কোনো আপত্তি ছিল না এসব ব্যাপারে। যেহেতু তাদের মাধ্যমেই এই ব্রাহ্মণ্যত্বের বিকাশ এবং স্বাভাবিক মুসলিম-বিদ্বেষ পেয়েছিলাম। ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিন্তু আশপাশের মুসলিমদের জীবন শৈলী দেখে এবং বেশিরভাগটাই অনুমান করে আমার মুসলিমবিদ্বেষ চরমমাত্রা পায় বিজেপি করাকালীন সময়ে। যদিও পার্টির আদর্শচ্যুতি এবং দলীয় কোন্দলের জন্য বিরক্তিতে রাজনৈতিক জীবনেও খুব দ্রুত ইতি পড়ে, কিন্তু আজন্ম লালিত সেই ইসলামবিদ্বেষ আমার মনের মধ্যে ভালোভাবেই গেড়ে বসেছিল।

প্রায় ২০১০ সাল থেকে এক মুসলিম বন্ধু আমাকে ইসলাম সম্পর্কে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করে। বন্ধুটির বাড়ি আমাদের কাছেই। একসাথে রামকৃষ্ণ মিশনে পড়েছি দু-জনে। তার দাওয়াত শুনতে আমার ভালো লাগত। কিন্তু বেশিক্ষণ শুনলে পার্থিব জগৎ থেকে হারিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করে আমি তার সাথে আলোচনায় ইতি টানতে চাইতাম। তার সুবাদেই আমি সর্বপ্রথম আল্লাহ, রসুল, কুরআন, নামাজ, রোজা এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হই। সে মাঝেমাঝে সুযোগ পেলে আমাকে দাওয়াত দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করত। তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলার জন্য বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্ন করে বসতাম আমি। কিন্তু সে ঠান্ডা মাথায় সব কিছুর জবাব দিত। তার এই আত্মবিশ্বাস দেখে আমার খুবই অবাক লাগত।

এরপর ২০১৫ সাল। এমবিএ করে এসে মাত্র কোলকাতায় স্যাটেলড হয়েছি। আমার সেই বন্ধুটিও তখন কোলকাতায় চাকরি করছে। কাকতালীয়ভাবে আমরা দু-জনে পাশাপাশিই অবস্থান করছিলাম। কাছে থাকার সুবাদে সে আমাকে দাওয়াত

Scanned with CamScanner

দেওয়ার সুযোগটা আবারও পেয়ে বসল। কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সে রুটিন করে আমাকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করে তখন। প্রথম প্রথম তার এ সব কথাবার্তা শুনে বিরক্ত লাগত আমার। আরে ব্যাটা থাক না তুই তোর ধর্ম নিয়ে! আমার পেছনে লেগেছিস কেন? কিন্তু কাছের বন্ধু। ছোটবেলার স্কুলসাথি। মুখ ফুটে কিছু যে বলবো, সেই দুঃসাহস কীভাবে করি? ব্যক্তি আমি খারাপ হতে পারি, বন্ধুত্বের বেলায় আমি ষোলআনায় হিসেবি।

কিন্তু তার কথাগুলো আস্তে আস্তে আমার ভিতর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। একটা সময়ে খেয়াল করলাম, অন্যান্য আলোচনার চেয়ে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনাই আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে শুরু করেছে। তার মুখ থেকে যা শুনতাম, তা আমাকে ভাবাতো। সে স্বর্গকে বলত জান্নাত। নরককে বলত জাহান্নাম। স্বর্গের সুখরাশির নানাবিধ বর্ণনা আমাকে মুগ্ধ করে তুলতো। আর যখন নরকের কষ্ট, যন্ত্রণা, শাস্তির আলোচনা আসত, ভয়ে তো আমি কুঁকড়ে যেতাম প্রায়। কিন্তু, যতই আমি ইসলামের দাওয়াত পাই না কেন, আমার ভিতরের সেই ইসলামবিদ্বেষ কিন্তু এক রত্তি পরিমাণও কমেনি। সুযোগ পেলেই আমি ইসলাম আর মুসলমানদের এক হাত নিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তাম।

এই প্রসঙ্গ অনুসারে বলে রাখি, অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকেই দেখেছি, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে নিজের মুসলিম বন্ধুদের নিয়ে কটূক্তি করতে, কুৎসিত আলোচনা করতে। সেই কটূক্তি বা আলোচনার বিরোধিতা তো কখনো করিইনি, বরং সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছি। এমনকি আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে মুসলিমদের কত হাজারবার যে গালি দিয়েছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই।। সে ফেসবুকে প্রকাশ্যে কারও পোস্ট শেয়ার করে হোক অথবা নিজের হাতে টাইপ করে। অবশ্য সে সময়গুলিতে কয়েকজন মুসলিম ছাড়া কেউ আমার মুসলিমবিদ্বেষী কথাবার্তার বিরোধিতা করত না। বরং তাৎপর্যপূর্ণভাবে তথাকথিত স্যেকুলার এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানুষরা নীরবে আমাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। অনেকেই প্রকাশ্যে সমর্থন না করলেও আড়ালে পিঠ চাপড়ে দিতেন, বাহবা দিয়ে প্রশংসা করতেন। সে সমস্ত গুণীজনদের কথা যদি প্রকাশ্যে বলতে যাই, এখুনি অনেক তাবড় সুপারস্টার বিপ্লবীর মুখোস খসে পড়বে। সে আলোচনা অন্যদিনের জন্য না-হয় তোলাই থাক।

কোনো হিন্দুকে আমার এই অবিরত ইসলাম বিদ্বেষের বিরোধিতা করতে দেখিনি কোনোদিন। এখন রোজ সকালে ফেসবুক মেমোরি চেক করলে নিজেরই কেমন যেন

Scanned with CamScanner

অদ্ভুত হাসি পায়। কত ননসেন্স পোস্ট যে শেয়ার করেছি! যেমন, বিজেপি'র তরফ থেকে করা কবীর সুমন সংক্রান্ত একটি পোস্টার শেয়ার করেছিলাম একবার। তাতে বলা ছিল—'রিভার্টেড মুসলমান মানেই ভয়ংকর শয়তান! আর মনে রাখবেন, দুনিয়ার প্রতিটা মুসলমানই রিভার্টেড'।

কি ভয়ানক ঘৃণার বীজ বুকে পুষে বড় হয়েছি সেকথা একমাত্র আমিই জানি। যাইহোক, কবীর সুমন বিষয়ক কুৎসিত মুসলিমবিদ্বেষী পোস্টারটি দেখার পরে আমার সেই দীর্ঘদিনের মুসলিম বন্ধুটি আমায় ফোন করে। ফোন করে পোস্টের ব্যাখ্যা চায়। রাত তখন আটটা বাজে। আমি তখন ব্যাঙ্গালোরে। সেইদিন আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত ধর্ম সংক্রান্ত বহু আলোচনা হয়। আমার মনে আছে, বন্ধুটি সেদিন কুরআনের চেয়েও গীতা আর বেদ নিয়ে বেশি আলাপ আলোচনা করেছিল। সেদিন থেকে আমার সংকীর্ণ হৃদয় একটু একটু করে খুলতে থাকে। যত রাত বাড়ে, পেঁয়াজের খোসার মতোন হৃদয়ের স্তরগুলো ঝরতে থাকে। সেই সময় অচানক কুরআনের একটা আয়াত আমার মস্তিষ্কে আঘাত দেয়। আয়াতটি ছিল—

'বলো সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। অবশ্যই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল'।[১]

এবার আসি ২০১৫ সালের ওই সময়টায়। নিজের অজান্তেই আমি ধীরে ধীরে হিংসা, ঘৃণার পথ থেকে সরতে শুরু করি। খুব ধীর গতিতে হলেও, এই প্রক্রিয়া কিন্তু বন্ধ হয়নি। গীতার কিছু শ্লোক আমার ভেতরের আবর্জনাকে একটু একটু করে পোড়াতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিবর্তিত চিন্তাধারার প্রভাব আমার ভার্চুয়াল লেখালিখির উপর পড়তে থাকে।

না, তখন থেকে পরিবর্তিত মানসিকতা নিয়ে লেখালেখি করলেও আমি আর কোনোদিন হিন্দুধর্ম কিংবা অন্যকোনোও ধর্মকে গালি, অপমান, কটূক্তি কিছুই করিনি। করবই বা কেন! কোনোও ধর্মই তো আমার পরিবর্তিত মতাদর্শের পরিপন্থী নয়। আমি বরং সমাজের কিছু চিরাচরিত নিয়ম তথা অন্যায় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমি বিশেষ কোনোও রাজনৈতিক মতবাদের

১ বনু ইসরাঈল (১৭) : ৮১

Scanned with CamScanner

সাথে জড়িত নই। সত্য-মিথ্যা, অন্যায়-অবিচারের মধ্যে ফারাক করতে শিখেছি। এমনিতে বরাবরই আমার ভেতরে ভয়ডর খুব একটা ছিল না। সাম্প্রতিক সময়ে তো একেবারেই নেই। তাই অনেকে অনেক কিছু বললেও চট করে উত্তেজিত হয়ে পড়ি না।

আমার এমন পরিবর্তনের সাথে সাথে অবশ্য আমার প্রতি অনেকেরই ধারণার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে আমার খুব ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু,পাড়ার দাদা, পারিবারিক ভাই। মাসে অন্তত দু-বার বাবার শরীরের খোঁজ নেওয়া দাদা, আমার বাবা-মা এমনকি আমার এখনও না হওয়া স্ত্রী-সন্তানদেরও খিস্তি দিতে শুরু করেছে। তার সাথে সেইসব দিনে পিঠ চাপড়ানো স্যেকুলার দাদারাও আক্রমণের ধার শানাচ্ছেন উত্তরোত্তর। হুমকি তো আছেই তার সাথে আমার রুচি পরিবর্তনের জন্য নানান উপদেশ।

মৃত্যুভয় আমার নেই। মৃত্যুকে উপহার মনে করি। পিছুটানও নেই। শুধু আমার প্রতি আমার এক সময়ের ঘনিষ্ঠদের পরিবর্তন দেখে উপলব্ধি হয়েছে—

আগে আমি একটা নির্দিষ্ট আইডিওলজি বা ধর্মকে সারাদিনরাত গালি, অপমান, কটূক্তি করে তাবড় তাবড় মানুষের বাহবা পেয়েছি, আর বিরোধিতা করেছে সেই নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষরা। আর এখন কোনোও ধর্ম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিরূপ মন্তব্য না করেও শুধুমাত্র সত্য আর ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতেই, একসময়ের পিঠ চাপড়ে দেওয়া মানুষরা আমার বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন না করে আমার সাথে সাথে আমার পরিবারকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে শুরু করেছে। অন্যদিকে আমি একটি বিশেষ ধর্মের কিছু মানুষকে আমার পাশে পেয়েছি, যাদের বিরুদ্ধে একসময় কুৎসিত আক্রমণ শাণিয়ে এসেছি। বিষয়টি পর্যবেক্ষণের পরে, এই পার্থক্যের কন্ট্রাস্ট দিন দিন আরও তীব্র হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মেই। ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে আমার ভাবধারার পরিবর্তন।

আর কদিন বাঁচব, জানি না। জীবনকে দার্শনিকভাবে দেখাও ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন হলো। যে যাওয়ার তাকে আটকানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই বন্ধু, শত্রু, দাদা, ভাই সবার উদ্দেশ্যে গীতার একটা শ্লোক দিয়ে শেষ করি, যেখানে বার বার আমাদের ঘৃণা বিদ্বেষ এবং পার্থিব চাহিদা ও আকর্ষণ থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার সাথে কুরানের একটি আয়াত কি অদ্ভুতভাবে মিলে যায়।

Scanned with CamScanner

পরপর দুটিই রইল—

'O Scion of Bharata (Arjun), O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and hate' (৭:২৭)

'O You have believed, be steadfast and witness in Justice for ALLAH. Don't let the hatred of others that makes you swerve from Justice. Be Just. That keeps you God's consciousness' (৫:৮)

এছাড়াও হিন্দুধর্মগ্রন্থ তথা বেদ, গীতার মধ্যে বিভিন্ন শ্লোকে যে একেশ্বরবাদের অপূর্ব বর্ণনা আছে, তা চিন্তাশীল মানুষের জন্য খোরাকই বটে।

আমি ২০১৫ সালের অগস্ট মাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি দুজনকে সাক্ষী রেখে। তারপর থেকে শুরু হয় আমার আসল লড়াই। কাউকে জানতে না দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে নামাজ পড়ার চেষ্টা। নামাজে পা গেঁড়ে বসতে খুব কষ্ট হতো তখন। আস্তে আস্তে শিখেছি। এরপর শুক্রবার করে বাড়ি থেকে প্রায় ৮ কিমি দূরে একটি জায়গায় গিয়ে জুমআর নামাজ পড়তাম। এর সাথে ছিল বুকের ভেতর আরও অনেক জিজ্ঞাসা। সেসব মেটাতে ইউটিউবে প্রচুর ইসলামিক ভিডিও দেখতে শুরু করি। তৌহিদ, তাওয়াক্কুল, একাত্মবাদের শান্তি, ইসলামের আরও গভীরতা বোঝার চেষ্টা। মনে হতো, সারাদিন যেন ইসলাম নিয়ে আলোচনা করি বিভিন্ন মানুষের সাথে। কিন্তু বন্ধু জগতের একটা বৃহৎ অংশ হিন্দু হওয়ায় তাদের হাল্কাচ্ছলে দাওয়া দিয়েই শান্তিতে থাকতে হতো। এরপর ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন দীনি ভাইদের সাথে আলাপ হয় এবং আমি সমৃদ্ধ হই তাদের বন্ধুতায়। আমি সমস্তরকম নেশা ছেড়ে দিই এরপর। আস্তে আস্তে ইসলামের ভেতর আশ্রয় নিতে থাকে আমার অশান্ত মন। রুহ তার খাদ্য খুঁজে পায় আল্লাহর সামনে সিজদা দিয়ে।

বর্তমানে আমার পরিস্থিতি বেশ জটিল। বাড়ি, পরিবার, আত্মীয় সবাই জেনে গেছে আমার ধর্ম পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপার। কিছুটা ফেসবুকে লেখালিখির সূত্রে, কিছুটা আমি ব্যাখ্যা করেছি। তারা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেনি। আমার উপর রাগ, অভিমান, জ্যোতিষীচর্চা, সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো—সমস্ত কিছুই চলেছে। কিন্তু আমি আমার নিজের স্ট্যান্ড না ছাড়ার কারনে অশান্তি ক্রমবর্ধমান। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দেব। মাঝেমাঝে খুব হতাশ হয়ে পড়ি। সত্যি বলতে

Scanned with CamScanner

কি, অধৈর্য হয়ে যাই। মনে হয় আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করি—জন্মগত মুসলিমদের মধ্যে এত পরীক্ষা নেই কেন? কেন রিভার্টেড অর্থাৎ, নও মুসলিমদের উপরেই আল্লাহর এত পরীক্ষা! একজন বাই বর্ন মুসলিম আর রিভার্টেডের মধ্যে তাহলে পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কি পার্থক্য থাকবে? তারপরেই নিজে অনুভব করি, এই যে এত অশান্তি, এই ঝামেলা, স্ট্রাগলের পরেও অনেক কষ্ট করে দুটো রাকাত নামাজ পড়তে পারি আল্লাহর কাছে, সিজদা দিতে পারি আমার মহান রবকে, হাত তুলে চাইতে পারি আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে, এই ইবাদতের যে স্বাদ, এই স্বাদ বাই বর্ন মুসলিমরা বোধহয় কোনোদিন পাবে না। এত স্ট্রাগল করেও একটা রোজা রাখার যে আনন্দ, এটাই আল্লাহর তরফ থেকে আমার প্রতি হাদিয়া। উপহার। তাই সমস্ত রিভার্টেড ভাই বোনদের বলি, ধৈর্য হারিও না। শত বাধা পেরিয়েও আল্লাহর কাছে যাও। তার কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করো। তিনি সর্বোত্তম শ্রোতা। আর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী পড়ো। দেখবে, অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফলকাম। সবার কাছে দোয়ার আর্জি জানিয়ে আমার লেখা শেষ করলাম। জাজাকাল্লাহ খায়ের।

Scanned with CamScanner

যেমন ছিলাম, যেমন আছি

এস ট্রানস (আমিনা)

আমার যখন প্রথম কোনো মুসলিমের সাথে পরিচয় হয়—তখন ছাত্রী ছিলাম। পড়শোনা করছিলাম 'বিনোদন' নিয়ে। অবকাশযাপন সংক্রান্ত বিষয়াবলির উপর একটা উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছি। সেবছর প্রথমবারের মতো কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা আগে থেকে কোর্সে ভর্তি হতে শুরু করলাম। তাই আমি আগেই আমার নাম তালিকাভুক্ত করে ওকলাহামো চলে গেলাম একটা পারিবারিক ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে । কাজটা শেষ করতে আমার অনেক সময় লেগে গেল। আমি জানতাম যে, এটা একটা সময়সাধ্য কাজ। কিন্তু যেমনটি ভেবেছিলাম, তার চেয়ে আরও বেশি সময় লেগে গেল আমার । তাই আমি যখন স্কুলে যোগ দিলাম, তখন অলরেডি সেমিস্টারের দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। (তখন আর কোনো কোর্স ড্রপ করা সম্ভব ছিল না। কেননা, ইতোমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল)

যে ক্লাসগুলো করতে পারিনি, সেগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য আমি মোটেও উদ্বিগ্ন ছিলাম না। কারণ, আমার ডিপার্টমেন্টে আমিই ছিলাম সেরা। ছাত্রী হয়েও পেশাদারদের সাথে প্রতিযোগিতায় আমি পুরস্কার জিতে আসতাম।

কলেজ করছি, দারুণ রেজাল্ট করছি। ব্যবসাও করছি এবং আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবও ছিল। তারপরও আদতে আমি ছিলাম অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের। এমনকি আমার ট্রান্সক্রিপ্টেও আমাকে অত্যন্ত 'মৃদুভাষী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। মানুষের সাথে সহজ হতে আমার প্রচুর সময় লাগত। একান্তই যদি-না কেউ আমার পূর্ব পরিচিত হতো, বা আমি বাধ্য হচ্ছি কথা বলতে—এমন পরিস্থিতি ছাড়া আমি কথা বলতাম-না বললেই চলে। আমি যে ক্লাসের জন্য নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত

Scanned with CamScanner

করেছিলাম, তার বিষয় ছিল 'প্রশাসন এবং নগর পরিকল্পনা' এবং সাথে শিশুদের জন্য প্রোগ্রামিং। একমাত্র শিশুদের সাথেই আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম।

যাইহোক, এখন আমার কাহিনিতে ফিরে আসি। স্কুলে যাওয়ার পর কম্পিউটার প্রিন্ট আউটে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এক বিরল বিস্ময়। আমাকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে একটি থিয়েটার ক্লাসের জন্য, যেখানে আমাকে বাস্তবে, সরাসরি মানুষের সামনে অভিনয় করতে হবে। আমি খুব অবাক হলাম। যেখানে আমি ক্লাসে সামান্য একটা প্রশ্ন করতে পারি না, সেখানে আমি কীভাবে মানুষের সামনে মঞ্চে উপস্থিত হব? আমার স্বামী স্বভাবগতভাবেই খুব শান্ত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে আমাকে বলল, আমি যেন শিক্ষকদের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলি। আমার সমস্যাটা তাদেরকে বুঝিয়ে বলি এবং অনুরোধ করি যে, অভিনয়ের বদলে আমাকে যেন আমার আঁকা ছবি বা নিজ হাতে করা সূচীকর্ম, এমন কিছু দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

আমি তার কথামতো আমার ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের বোঝালাম। শিক্ষকরা আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। তাই আমি পরবর্তী মঙ্গলবার থেকে ক্লাসে যাওয়া শুরু করলাম। যখন আমি ক্লাসে ঢুকলাম তখন আমি দ্বিতীয়বারের মতো প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। ক্লাসটা ছিল 'আরব' আর 'উট সওয়ারীদের' দিয়ে পূর্ণ। যদিও আমি এর আগে তাদের কখনো দেখিনি, কিন্তু তাদের কথা শুনেছি অনেক।

আমার পক্ষে এটা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না যে, আমি কিছু নোংরা ধর্মহীনদের সাথে একই রুমে বসে একসাথে ক্লাশ করব! কারণ, কে জানে, তুমি হয়তো তাদের দ্বারা কোনো ভয়ংকর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যাবে! সবাই জানত যে, তারা ছিল অস্পৃশ্য। তাদেরকে বিশ্বাসও করা যেত না। আমি ক্লাসের দরজাটা ঠাস করে বন্ধ করে দিয়ে বাসায় চলে গেলাম। (এই সময়ে একটা ছোট্ট জিনিস বলে রাখা দরকার যে, তখন আমার পরনে ছিল এক জোড়া চামড়ার প্যান্ট আর গলাবন্ধ জামা, হাতে ছিল মদের গ্লাস! অথচ আমার চোখে তখন তারাই ছিল খারাপ লোক।)

আমি যখন আমার স্বামীকে ক্লাসের আরবদের কথা বললাম এবং তাকে জানালাম যে, কোনোভাবেই আমি আর ওই ক্লাসে ফেরত যাচ্ছি না। তখন আমার স্বামী তার স্বভাবসুলভ শান্ত ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। সে আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, আমিই সবসময় বলি—ঈশ্বর যাই ঘটান না কেন, তার পেছনে কোনো –না-কোনো কার্যকারণ থাকে। তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার

Scanned with CamScanner

কিছুক্ষণ চিন্তা করা উচিত। সে আমাকে আরও মনে করিয়ে দিল যে, আমি একটি স্কলারশিপ পাচ্ছি—যা আমার টিউশন ফি কভার করছে। আমি যদি সেটা ধরে রাখতে চাই, তাহলে আমাকে ভালো জিপিএ বজায় রাখতে হবে। তিন ক্রেডিট ঘন্টার কোর্সে 'এফ' গ্রেড আমার সম্ভাবনাকে ধূলিস্ম্যাত করে দিতে পারে।

পরবর্তী দুই দিন আমি প্রার্থনা করলাম দিক নির্দেশনার জন্য। বৃহস্পতিবার আমি এই মর্মে স্থির বিশ্বাসী হয়ে ক্লাসে ফিরে গেলাম যে, ঈশ্বর ওইসব অজ্ঞ, অসহায় ধর্মহীন লোকগুলোকে নরকের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্যই আমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাদেরকে বোঝাতে উদ্যোগী হলাম যে, তারা যদি যীশু খ্রিস্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে মেনে না নেয়, তবে তাদের অনন্তকালের জন্য নরকের আগুনে পুড়তে হবে। তারা খুব বিনয়ী ছিল। তারা শুনল, কিন্তু ধর্মান্তরিত হলো না। তখন আমি তাদের ব্যাখ্যা করলাম—যীশু তাদের কতটা ভালোবাসেন এবং কীভাবে তাদের পাপ মোচন করতে গিয়ে নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তাদেরকে শুধু যা করতে হবে—তা হলো—হৃদয়ের গভীর থেকে যীশুকে গ্রহণ করতে হবে। এবারও তারা খুব ভদ্রভাবে শুনল, কিন্তু তবুও ধর্মান্তরিত হলো না। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম—তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ব, যাতে আমি তাদের দেখাতে পারি যে, ইসলাম একটি অসত্য ধর্ম এবং মুহাম্মাদ একজন মিথ্যা উপাস্য।

ছাত্রদের মাঝে একজন আমাকে কুরআনের একটা কপি দিল, সাথে আরেকটি বই, ইসলামের উপর। আমি আমার গবেষণা করতে উদ্যত হলাম। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার যে প্রমাণ দরকার তা আমি খুব দ্রুতই পেয়ে যাব। যাইহোক, আমি কুরআন এবং অপর বইটা পড়লাম। তারপর আমি পড়লাম আরও পনেরোটার মতো বই, সহিহ মুসলিম এবং তারপর আবার কুরআনে ফিরে আসলাম। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, আমি তাদের ধর্মান্তরিত করেই ছাড়ব। আমার পড়াশোনা চলতে লাগল পরবর্তী দেড় বছর ধরে।

সেই সময়ে আমার স্বামীর সাথে আমার মৃদু সমস্যা হওয়া শুরু হলো। আমার মাঝে পরিবর্তন আসছিল, খুবই সামান্য মাত্রায়, কিন্তু তা আমার স্বামীকে বিরক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। যেমন : এমনিতে আমরা প্রতি শুক্র এবং শনিবার কোনো-না-কোনো বার (মদ্যপানের আসর) বা পার্টিতে যেতাম। কিন্তু তখন আমি সেসব জায়গায় আর যেতে চাইতাম না। আমি আরও বেশি নীরব আর দূরের হয়ে যাচ্ছিলাম। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, নিশ্চয়ই আমি কোনো অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত, তাই সে আমাকে বাসা

Scanned with CamScanner

থেকে বের করে দিল। আমি আমার সন্তানদের নিয়ে একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠলাম এবং মুসলিমদের খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করার দৃঢ় সংকল্পিত চেষ্টা বজায় রাখলাম।

তারপর একদিন রাতের বেলা আমার দরজায় কেউ একজন নক করল। আমি দরজা খুলতেই একজন লোককে দেখতে পেলাম—যার পরনে ছিল একটা লম্বা, সাদা গাউন (রাতের পোশাক) আর মাথায় লাল সাদা ছক কাটা টেবিল ক্লথের মতো কাপড় পেঁচানো। উনার সাথে ছিল আরও তিনজন, যাদের পরনে ছিল পাজামা। সেটাই ছিল প্রথমবার, যেবার আমি তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পোশাক দেখেছিলাম। রাতের পোশাকে এভাবে আমার দরজায় উপস্থিত হওয়াতে আমি ভিতরে ভিতরে মৃদু ক্ষুব্ধ হলাম। তারা আমাকে কী ধরনের নারী ভেবেছে? তাদের কি কোনো আত্মাভিমান বা আত্মমর্যাদা নেই? আমি আরও বিস্ময়াহত হলাম যখন টেবিল ক্লথ পরিহিতজন আমাকে বললেন যে, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আমি মুসলিম হতে চাই! আমি তাকে দ্রুত জানালাম, আমি মোটেও মুসলিম হতে ইচ্ছুক নই। আমি একজন খ্রিস্টান। তবে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। যদি তার হাতে কিছু সময় থাকে!

তার নাম ছিল আব্দুল আজিজ আশ শাইখ এবং তিনি আমাকে সময় দিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং আমার সাথে আমার প্রতিটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলেন। আমাকে একবারও এমনটা মনে হতে দিলেন না যে, আমি মূর্খ বা নির্বোধের মতো প্রশ্ন করছি। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কি এটা বিশ্বাস করি কি না যে, আল্লাহ মাত্র একজনই? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি বিশ্বাস করি, রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রেরিত একজন রাসুল? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ইতিমধ্যেই আমি নাকি একজন মুসলিম!

আমি বিরোধিতা করে বললাম—আমি একজন খ্রিস্টান। আমি শুধু ইসলামকে বুঝতে চাইছি মাত্র। ভিতরে ভিতরে আমি ভাবছিলাম, আমি কিছুতেই মুসলিম হতে পারি না! আমি একজন আমেরিকান এবং শ্বেতাঙ্গা! আমার স্বামীই বা কী বলবেন! আমি যদি মুসলিম হই, তবে আমার তাকে ডিভোর্স দিতে হবে, আমার পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।

আমাদের কথোপকথন চলতে থাকল। পরে তিনি আমাকে বোঝালেন যে, জ্ঞান অর্জন এবং আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি একটা সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো। তুমি যদি কোনো সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কয়েকটা ধাপ বাদ দিয়ে যাও, তবে তোমার পড়ে

Scanned with CamScanner

যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। শাহাদাহ[১] হলো সিঁড়ির একদম প্রথম ধাপ। তবুও আমাদের আরও কিছু কথা বলার ছিল।

তারপর সেই মুহূর্তটা এলো। ২১শে মে, ১৯৭৭। আসরের সময় আমি শাহাদাহ গ্রহণ করলাম। যদিও তখনও এমন কিছু বিষয় ছিল—যা আমি মন থেকে গ্রহণ করতে পারিনি। নিরঙ্কুশ সত্যবাদিতা আমার স্বভাবের অংশ হওয়াতে আমি একটা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ধারা যোগ করে রাখলাম। আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই, এবং রাসুল সাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসুল, কিন্তু আমি কখনও আমার মাথা আবৃত করব না এবং আমার স্বামী যদি কখনো অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে, আমি তাকে জননশক্তিহীণ করে দেবো।

আমি রুমে অবস্থানকারী অন্য লোকগুলোর বিস্ময়াহত ধ্বনি শুনতে পেলাম; কিন্তু আব্দুল আজিজ তাদের চুপ করিয়ে দিলেন। পরে শুনেছিলাম, তিনি তাদের বলেছিলেন, আমার সাথে ওই দুটি বিষয় নিয়ে যেন কখনও আলোচনা না করা হয়। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, একদিন না একদিন আমি সঠিক উপলব্ধিতে পৌঁছব।

শাহাদাহ উচ্চারণ আসলেই স্রষ্টার নৈকট্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু এটা ছিল এক মন্থর যাত্রা। আব্দুল আজিজ আমার সাথে সাক্ষাৎ এবং আমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া অব্যাহত রাখলেন। আল্লাহ তাঁর সহিষ্ণুতা এবং ধৈর্যের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করুন। তিনি কখনও আমাকে তিরস্কার করেননি, বা এমন ভাব করেননি যে, আমার কোনো প্রশ্ন অর্থহীন বা নির্বোধের মতো হয়েছে। তিনি প্রতিটি প্রশ্নকে সম্মানের সাথে বিবেচনা করতেন এবং বলতেন—স্থূল প্রশ্ন শুধু সেটাই যা অব্যক্ত রয়ে যায়। হুম...আমার দাদীমাও একথা বলতেন।

তিনি আমাকে বোঝালেন যে, আল্লাহ আমাদের জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছেন, আর প্রশ্ন করা হচ্ছে সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। তিনি যখন কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতেন, তখন মনে হতো, আমি যেন একটা গোলাপকে প্রস্ফুটিত হতে দেখছি। পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি, যতক্ষণ না তা পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। আমি যখনই

১ আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, এই সাক্ষ্য দেওয়া।

Scanned with CamScanner

তাকে বলতাম—আমি কোনোকিছুর সাথে একমত নই এবং কারণটা কী তাকে ব্যাখ্যা করতাম, তিনি সবসময়ই আমাকে বলতেন যে, একটা পর্যায় পর্যন্ত আমার উপলব্ধি সঠিক। তারপর তিনি আমাকে দেখাতেন কীভাবে আরও গভীরভাবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করা যায়। আলহামদুলিল্লাহ।

সময়ের পরিক্রমায় আমি অনেক শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসেছি। প্রত্যেকে ছিলেন স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই বিশেষ। যে জ্ঞান আমি তাদের কাছ থেকে পেয়েছি সেজন্য তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। তারা প্রত্যেকে আমাকে আরও পরিণত হতে, ইসলামকে আরও ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। আমার জ্ঞান যত বাড়তে থাকল, আমার মাঝে পরিবর্তনগুলোও ততই দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকল। প্রথম বছরের মাঝেই আমি হিজাব পরা শুরু করলাম। আমার মনেও নেই—ঠিক কখন আমি তা শুরু করেছি। ক্রমবর্ধিত জ্ঞান এবং উপলব্ধির সাথে সাথে সেটা এসেছিল স্বাভাবিকভাবেই। এমনকি ক্রমান্বয়ে আমি হয়ে উঠলাম বহুবিবাহের একজন প্রবক্তা। আমি তখন উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ যখন এটার অনুমতি দিয়েছেন, তবে নিশ্চয়ই এর মাঝে ভালো কিছু আছে।

আমি যখন প্রথম ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম, তখন আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজন বা আমি খুব চাচ্ছি এমন কিছু খুঁজে পাব, এমনটিই আশা করিনি। সেখানে ইসলাম আমার জীবনটাই বদলে দেবে—এ ছিল আমার ধারণারও অতীত। কারও পক্ষেই আমাকে কখনোও বিশ্বাস করানো সম্ভব ছিল না যে, অবশেষে ইসলামের জন্যই আমি একদিন শান্তি, অফুরন্ত ভালোবাসা ও আনন্দের সন্ধান পাব।

এই গ্রন্থ—কুরআন—কথা বলে এক আল্লাহ, এই বিশ্বজগতের স্রষ্টার ব্যাপারে। এটা বর্ণনা করে সেই চমৎকার পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তিনি এই পৃথিবীকে বিন্যস্ত করেছেন। এই বিস্ময়কর কুরআনে আছে সব কিছুর সদুত্তর। আল্লাহ করুণাময়! আল্লাহ সকল শান্তির উৎস! আল্লাহ রক্ষাকারী! আল্লাহ ক্ষমাকারী! আল্লাহই সরবরাহকারী! আল্লাহ ব্যবস্থাপক! আল্লাহ সাড়াদানকারী! আল্লাহ রক্ষাকারী বন্ধু! আল্লাহ প্রশস্তকারী!

কুরআন অস্তিত্বের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং সাফল্যে অর্জনের জন্য স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দান করে। এটা যেন জীবনে চলার জন্য একটা মানচিত্রের

Scanned with CamScanner

মতো, মালিকের দেওয়া ম্যানুয়াল!

ইসলাম কীভাবে আমার জীবনকে বদলে দিল :

আমরা আলোকে কি প্রচণ্ড ভালোই না বাসব, শুধু যদি একবার অন্ধকারে বাস করি, তাই না!

সত্যি বলতে কি, আমি যখন প্রথম ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমি কখনোও ভাবিনি, ইসলাম আমার জীবনটাকে এতটা প্রভাবিত করবে। ইসলাম আমার জীবনকে প্রভাবিতই করেনি শুধু, এটা আমার জীবনকে বদলেই দিয়েছে।

পারিবারিক জীবন :

আমি ও আমার স্বামী দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম। পরস্পরের প্রতি সেই ভালোবাসা আজও বিদ্যমান। তারপরও যখন আমি ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করি, আমাদের মাঝে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। তিনি আমার মাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং বুঝতে পারেন না যে, কী ঘটছে। আমারও একই অবস্থা হয়। কিন্তু আমি তখন টেরই পাইনি যে—আমি বদলে যাচ্ছি। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—একমাত্র যা আমাকে বদলে দিতে পারে, তা বেশি আমার জীবনে পরপুরুষের আগমন। কিন্তু আসলে কি আমাকে বদলে দিচ্ছে তা তাকে বোঝানোর কোনো উপায় ছিল না। কারণ, আমি নিজেই যে তা জানতাম না!

আমি যখন উপলব্ধি করলাম যে—আমি মুসলিম, তখন তা অবস্থার উত্তরণে কোনো সাহায্য করল না। কারণ, আমার স্বামীর ধারণা ছিল—একমাত্র যে কারণে একজন নারী ধর্মের মতো মৌলিক কোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারে, তা বেশি, আরেকজন পুরুষ! সে এই আরেকজন পুরুষের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ সে পেল না, কিন্তু তবু তার অস্তিত্বের ব্যাপারে সে নিশ্চিত থাকল! ফলে আমাদের সম্পর্কের ইতি ঘটল খুব কুৎসিত এক ডিভোর্সের মাধ্যমে। আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত বেশি যে—আমার এই অগতানুগতিক ধর্ম আমার সন্তানদের যথাযথ বিকাশের জন্য ক্ষতিকর। তাই তাদের অভিভাকত্বের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা বেশি ভালো।

আমাদের মাঝে বিচ্ছেদের প্রাক্কালে আমার জীবনে একটা মূহূর্ত এসেছিল, যখন আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমাকে এই ধর্ম বা আমার সন্তান—এদের মাঝে যে

Scanned with CamScanner

কোনো একটাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। ইসলাম পরিত্যাগ করে আমি আমার সন্তানদের সাথে থাকতে পারি অথবা সন্তানদেরকে ত্যাগ করে ইসলাম বেছে নিতে পারি। এটা ছিল আমার জন্য এক নির্মম আঘাত, আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত। কারণ, দুটোর মাঝে যে কোনো একটাকে বেছে নেওয়া আমার পক্ষে ছিল—এককথায় অসম্ভব। আমি যদি ইসলাম ত্যাগ করি....তবে আমি আমার সন্তানদের শেখাব কীভাবে প্রতারণা করতে হয়। কারণ, আমার হৃদয়ে যা ছিল, অর্থাৎ, আল্লাহকে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই ছিল না। শুধু তখন না—বরং সব সময়ই। সেইদিন, সেই মুহূর্তে আমি এমনভাবে প্রার্থনা করেছিলাম—যেভাবে আগে কখনও করিনি—যখন ওই ত্রিশটি মিনিট শেষ হয়ে গেল, আমি তখন জেনে গেছি যে, আমার সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয়ের চেয়ে নিরাপদতর আর কোনো জায়গা নেই। তাই আজ যদি আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি, তবে ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যের মাঝে থাকার অসাধারণত্ব বাচ্চাদের বোঝানোর কোনো উপায় থাকবে না। আদালতকে বলা বেশি যে আমি আমার সন্তানদের আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সমর্পণ করব। আর তার অর্থ এই নয় যে, আমি আমার সন্তানদের প্রত্যাখ্যান করছি!

আমি আদালতপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করেছিলাম এটা জেনে যে, বাচ্চাদের ছাড়া আমার জীবনটা ভয়ংকর রকমের কঠিন হবে। আমার হৃদয়ে ভয়াবহ রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, যদিও ভিতর থেকে আমি জানতাম যে, আমি সঠিক কাজটাই করেছি। আমি আয়াতুল কুরসির মাঝে সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সকল গুণাবলি আমার সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠল এবং আমি প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের অসাধারণ সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করতে শুরু করলাম।

ইসলাম গ্রহণের কারণে আমি হারালাম সন্তানদের অভিভাকত্বের অধিকার, সমাপ্তি ঘটল দাম্পত্য জীবনের। কিন্তু এগুলোই একমাত্র সমস্যা ছিল না, যার মুখোমুখি আমাকে হতে হয়েছিল। আমার পরিবারের বাকি সদস্যরাও আমার এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি। তাদের অধিকাংশই আমার সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। আমার মায়ের এই বিশ্বাস ছিল যে—আমার এইসব আচরণ সাময়িক এবং আমি শীঘ্রই এখান থেকে বের হয়ে আসব। আমার বোন, যে কিনা একজন 'মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ', নিশ্চিত ছিল যে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং আমাকে হাসপাতালে নেওয়া দরকার। আর আমার বাবা মনে করতেন যে, নরকের গভীরতম স্থানে জায়গা হবার আগেই আমাকে হত্যা করা উচিত। আকস্মিকভাবে আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম স্বামী ও পরিবার বিহীন অবস্থায়। কী হবে এরপর?

Scanned with CamScanner

বন্ধুরাগণ :

আমার অধিকাংশ বন্ধুরা আমার প্রথম বছরে আমাকে ফেলে গিয়েছিল। আমার সঙ্গ তাদের কাছে আর আনন্দদায়ক কিছু ছিল না। আমি বার বা পার্টিতে যেতে চাইতাম না, ছেলে বন্ধু খোঁজার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম না। এক আমি যা করতাম তা বেশি শুধু ওই নির্বোধ বইটা (কুরআন) পড়া আর ইসলাম নিয়ে কথা বলা। কী বিরক্তিকর! কিন্তু তখনও আমার এতটা জ্ঞান ছিল না যে—তাদের বুঝতে সাহায্য করব—কেন ইসলাম এত সুন্দর।

চাকরি :

এরপর যা হারানোর কথা ছিল, তা বেশি আমার চাকরি। যেখানে আমি আমার বিভাগের প্রতিটা পুরস্কার জিতেছিলাম, ছিলাম গুরুত্বপূর্ণ সব ধারার প্রবর্তক আর টাকার মেশিন, সেই আমি আমার চাকরি হারালাম যেদিন আমি হিজাব শুরু করলাম, ঠিক সেইদিন। এবার আমি হলাম বন্ধু ও পরিবারবিহীন এবং চাকরিহারা।

এসব কিছুর মাঝে একমাত্র সঙ্গী ছিল আমার দাদী। তিনি আমার পছন্দকে সমর্থন করেছিলেন এবং আমার সাথে যোগদান করেছিলেন। কী আশ্চর্য! আমি সবসময়ই জানতাম যে, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাসম্পন্না নারী, কিন্তু তাই বলে এত! এর কিছুদিন পরই তিনি মারা যান। যখন আমি এই বিষয়টা নিয়ে ভাবি, একটু ঈর্ষান্বিত হয়ে যাই। যেদিন তিনি শাহাদাহ উচ্চারণ করেছেন, ঠিক সেইদিনই তাঁর সমস্ত পাপকাজগুলো ধুয়ে মুছে গেছে, কিন্তু ভালো কাজগুলো সংরক্ষিতই আছে! তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর এত কম সময়ের মাঝে মারা গেছেন যে, আমি জানি, তাঁর আমলনামাতে ভালো কাজের পাল্লাই বেশি ভারী। এটা আমার মনটাকে আনন্দে ভরে দেয়।

আমার জ্ঞান যত বাড়তে থাকল এবং প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি আরও ভালোভাবে দিতে পারতে লাগলাম, অনেক কিছুই বদলে গেল। কিন্তু ব্যক্তি আমার ভেতর এগুলো যে পরিবর্তনের সূচনা ঘটিয়েছিল, সেটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রভাবক। কয়েক বছর পর আমি যখন ইসলাম নিয়ে জনসম্মুখে গেলাম, তখন আমার মা আমাকে ডেকে বললেন যে—তিনি জানেন না এই 'ইসলাম' বস্তুটা আসলে কী, তবে তিনি আশা করেন, যেন আমি এটার সাথেই অবস্থান করি। এটা আমার মাঝে যা পরিবর্তন এনেছে, তা তার ভালো লাগছে। তার বছর দুয়েক পর তিনি আমাকে আবার ডাকলেন এবং জানতে চাইলেন যে, মুসলিম হতে হলে একজনকে কী

করতে হয়। আমি তাকে বললাম—সর্বসাকুল্যে যা করতে হবে, তা বেশির থেকে বেশি—একজনকে জানতে হবে যে, ইবাদাতের যোগ্য উপাস্য একজনই, আল্লাহ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসুল। তার প্রতিক্রিয়া ছিল এমন,—'যে কোনো বোকাই সেটাই জানে। কিন্তু তোমাকে করতে হবেটা কী?''আমি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তিনি তখন বললেন "ওহ, আচ্ছা! কিন্তু এখুনি তোমার বাবাকে কিছু বলার দরকার নেই।"

তার জানা ছিল না যে, এর কয়েক সপ্তাহ আগে তিনিও আমার সাথে এই অনুরূপ কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গেছেন! আমার নিজের বাবা (যিনি মনে করেছিলেন আমাকে হত্যা করা দরকার) একই কথা আমাকে বলেছেন দু মাস আগে। তারপর, আমার বোন, সেই মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ, আমাকে বলল যে, আমি তার দেখা সবচেয়ে 'স্বাধীন' মানুষ। আর এটা ছিল সবচেয়ে বড় প্রশংসাসূচক বাক্য, যা আমি তার কাছ থেকে পেতে পারতাম।

এভাবে এক এক করে প্রতিটা মানুষের ইসলাম গ্রহণের কাহিনি না বলে সহজ কথায় বলি—প্রতি বছরই অধিক সংখ্যায় আমার পরিবারের সদস্যরা ইসলামকে আবিস্কার করতে লাগল। আমি বিশেষ করে আনন্দিত হয়েছিলাম, যখন আমার এক প্রিয় সুহৃদ, ভাই ইমাম কায়সার আমাকে জানিয়েছিল যে, আমার সাবেক স্বামী শাহাদাহ গ্রহণ করেছে। যখন ভাই কায়সার তার কাছে কারণ জানতে চেয়েছিল, আমার স্বামী বলেছিল যে, সে আমাকে গত ১৬ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং সে চায় তার মেয়ের কাছেও তাই থাকুক যা আমার কাছে আছে। সে আমার কাছে এসেছিল এবং তার সকল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো তার বহু আগেই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম!

এখন, যখন আমি এই বইটি লিখছি, আমার সবার বড় ছেলে, হুইটনি, ফোন করেছে, এবং জানিয়েছে যে সেও ইসলাম গ্রহণ করতে চায়। সে কয়েক সপ্তাহর মাঝে অনুষ্ঠিতব্য ISNA সম্মেলনে শাহাদাহ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। ততদিন পর্যন্ত, সে যথাসম্ভব, জ্ঞান অর্জন করছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অসীম দয়ালু।

সময়ের পরিক্রমায় আমি ইসলামের উপর আমার বক্তৃতার জন্য পরিচিত হয়েছি এবং আমার কথা শুনে বহু শ্রোতা মুসলিম হওয়াকে বেছে নিয়েছে। আমার জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞার উপর আমার আস্থা যত বেড়েছে আমার মানসিক প্রশান্তিও

Scanned with CamScanner

ক্রমান্বয়ে ততটাই বেড়েছে। আমি জানি, আল্লাহ শুধু আমার স্রষ্টাই নন, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুও। আমি জানি, আল্লাহ সবসময়ই আমার সাথে থাকবেন, কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমি যদি আল্লাহ্‌র দিকে এক পা আগাই, তিনি আমার দিকে দশ পা আগাবেন। কী দারুণ ব্যাপার!

এটা সত্যি যে, আল্লাহ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু আমাকে পুরস্কৃতও করেছেন অভাবনীয়ভাবে। আমি কোনোদিনও যতটা আশা করতে পারতাম না, তার চেয়ে অনেক বেশি গুণে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। কয়েক বছর আগে ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন যে, আমার ক্যান্সার হয়েছে এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে। তারা আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, এর কোনো চিকিৎসা নেই। কারণ, তা অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে। রোগটির পরবর্তী পর্যায়গুলো কেমন হবে, তা বর্ণনা করে তারা আমাকে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে উদ্যোগী হলেন। আমি চিন্তিত ছিলাম আমার সন্তানদের নিয়ে, বিশেষ করে সবচেয়ে ছোটটার জন্য। কে ওর দেখভাল করবে? তারপরও আমি হতাশ হইনি। আমাদের সবাইকেই তো মরতে হবে। আমি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলাম যে, যে কষ্টকর অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে আমি যাচ্ছি তার মাঝেও কল্যাণ আছে।

আমার মনে পড়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা, কারিম আল মিসওয়ি, যে ক্যান্সারে মারা গিয়েছিল যখন ওর বয়স ছিল বিশের কোঠায়। মারা যাওয়ার মাত্র কিছুদিন আগে সে আমাকে বলেছিল যে, আল্লাহ আসলেই দয়াময়। এই মানুষটি অভাবনীয় যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে যাচ্ছিল, অথচ আল্লাহ্‌র ভালোবাসার দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। সে বলেছিল, "আল্লাহ চান, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করি একটি পরিচ্ছন্ন আমলনামা নিয়ে।" তার মৃত্যুঅভিজ্ঞতা আমাকে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। সে আমাকে শিখিয়েছিল, আল্লাহর দয়া ও ভালোবাসা। আল্লাহর ভালোবাসা এমন একটা বিষয়—যা কিনা কেউ কখনোও সত্যিকার অর্থে আলোচনা করেনি!

আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপারটি উপলব্ধি করা শুরু করতে আমার খুব বেশি সময় লাগেনি। পুরস্কার হিসেবে আমি পেলাম হজ করার সৌভাগ্য। তার চেয়েও বড় কথা, আমি শিখেছিলাম সবার মাঝে—হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম—ইসলামের বাণীটা ছড়িয়ে দেওয়া আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তারা আমার সাথে একমত বেশি কি বেশি না বা আমাকে পছন্দ করল কি করল না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার একমাত্র অনুমোদন দরকার ছিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। একমাত্র

Scanned with CamScanner

ভালোবাসার প্রয়োজন ছিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। তারপরও আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে, দিনে দিনে অধিক সংখ্যক মানুষ, বাহ্যত, কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে ভালোবাসে। আমি তাতে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কারণ, মনে পড়ে যে, আমি পড়েছিলাম—যদি আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি অন্যদের মাঝেও তোমার জন্য ভালোবাসা জাগ্রত করে দেন। আমি এত অগাধ ভালোবাসার যোগ্য নই। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরেকটি পুরস্কার। আল্লাহ সুমহান।

আমার জীবন কীভাবে বদলে গেল—তা পূর্ণমাত্রায় ব্যাখ্যা করার কোনো উপায় নেই। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! আমি খুবই আনন্দিত যে, আমি একজন মুসলিম। ইসলাম আমার হৃদয়ের স্পন্দন। ইসলাম সেই রক্ত যা আমার শিরা উপশিরা দিয়ে প্রবাহিত হয়। ইসলাম আমার শক্তি। ইসলাম আমার জীবন—যা কিনা চমৎকার রকমের সুন্দর। ইসলাম ছাড়া আমি কিছুই না। কোনোদিনও যদি আল্লাহ তাঁর সুদৃষ্টি আমার থেকে ফিরিয়ে নেন, আমি বাঁচতে পারব না।

“

“ও আল্লাহ, আমার হৃদয়কে আলোকিত করুন এবং আমার দৃষ্টিতে নুর দিন, আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে নুর দিন। জ্যোতি থাকুক আমার ডানে, আমার বামে, আমার উপরে এবং আমার নিচে। আমার সামনে নুর দিন, নুর দিন আমার পেছনেও এবং আমাকে আলোকিত করুন।[১]”

“

“ও আমার রব, আমার পাপসমূহ মার্জনা করুন, আমার সকল কাজ এবং যা আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন, সেগুলোতে আমার অজ্ঞতা এবং সীমালঙ্ঘনসমূহ ক্ষমা করুন। ও আল্লাহ, আমার ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত সব ভুলগুলো মাফ করে দিন। আমি স্বীকার করছি যে, আমার এমনসব ভুলগুলোর জন্য আমিই দায়ী। ও আল্লাহ, আমার অতীত এবং ভবিষ্যতের গুনাহগুলো মাফ করে দিন, যা আমি করেছি প্রকাশ্যে বা গোপনে। আপনিই সেই সত্তা, যা কার্য সম্পাদনকারী, এবং আপনিই সে, যিনি বিলম্বিত করেন এবং আপনিই সর্বশক্তিমান।[২]”

---

১ *সহিহ আল বুখারি*

২ *সহিহ আল বুখারি*

ফেরার কথাই ছিলো

ওলোগুন্ডে সা, ভারতীয়, যিনি একসময় নাস্তিক ছিলেন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

মিথ্যার মাধ্যমে সত্য যেভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর কিছুর দ্বারাই মনে হয় সেভাবে হয়ে ওঠে না! আমি ইসলাম গ্রহণ করি আমেরিকা যাওয়ার ছয় মাস পর। আর এজন্য আমি কৃতজ্ঞ খ্রিস্টধর্মের সাথে আমার পরিচয়ের কাছে।

আমার জন্ম ভারতে। আমি বেড়ে উঠেছি হিন্দুদের মাঝে, যারা অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা করে। ভারতের প্রতিটি রাস্তা এবং কোণায় কোণায় তুমি মন্দির খুঁজে পাবে—যেগুলো সব মূর্তি দিয়ে ভর্তি। কাঠ, পাথর, শ্বেত পাথর এমনকি সোনা-রুপার তৈরি মূর্তি!

তবে আমি কোনো হিন্দু পরিবার থেকে আসিনি। আমার মা বাবা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তারা ছিলেন নাস্তিক। তারা আমাকে শিখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই। শৈশবে মা-বাবা আমাকে যা বলতেন, আমি তাই অন্ধভাবে বিশ্বাস করতাম। আমি তাদের কর্তৃত্ব নিঃশর্তভাবে মেনে নিতাম এবং ভাবতাম, তারা বুঝি সব জানেন। তাদেরকে মনে করতাম নির্ভুল। কিন্তু আমি যত বড় হতে থাকলাম, তত বুঝতে থাকলাম যে, তারা আসলে সবকিছু জানেন না এবং নিঃসন্দেহে তারা নির্ভুল ছিলেন না, তাদেরও ভুল-ত্রুটি হতো।

জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে জীবন সম্পর্কে আমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। আমি নিশ্চিত যে—এই প্রশ্নগুলো অধিকাংশ মানুষের মনেই কোনো-না-কোনো

Scanned with CamScanner

সময় আবির্ভূত হয়। প্রশ্নগুলো ছিল এমন—জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্য কী? কেন মানুষকে ভালো এবং মন্দের মাঝে বাছাই করার মতো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়? কেন মানুষ মারা যায়? মৃত্যুর পর কী ঘটে?

আমার মা বাবার কাছে এগুলোর কোনো উত্তর ছিল না। ফলে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শুরু করলাম। গভীর চিন্তাভাবনা ও প্রতিফলনের পর আমি এই উপসংহারে পৌঁছালাম যে—ঈশ্বর আছেন! বরং ঈশ্বরের অস্তিত্বই হচ্ছে একমাত্র বাস্তবতা।

প্রকৃতির মাঝে এই যে অসাধারণ শৃংখলা এবং পূর্ণতা বিদ্যমান, তা দৈবক্রমে ঘটতে পারে না। ডিজাইনার ছাড়া কোনো ডিজাইন থাকতে পারে না এবং কোনো সৃষ্টি থাকতে পারে না স্রষ্টা ব্যতীত। আমরা মানুষেরা সৃষ্টির ফসল, দৈবক্রম, দুর্ঘটনা বা বিবর্তনের নই। এটা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে স্রষ্টা মাত্র একজনই। একের বেশি হওয়া সম্ভব নয়; কারণ, তা ক্ষমতার মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে জন্ম নেবে চরম বিশৃংখলা ও ভারসাম্যহীনতা। ওই যে কথায় আছে না, "অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট"? অতএব, আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা শুরু করলাম। আমি আমার কৃতকাজসমূহের জবাবদিহিতাতেও বিশ্বাস করতাম। আমাদের কৃতকাজগুলোই হচ্ছে একমাত্র বস্তু, যার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ আছে। আর কোনো কিছু আমাদের সাধ্যের মাঝে নয়।

যেহেতু আল্লাহ আমাদের ভালো এবং মন্দের মাঝে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেহেতু এটা আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে—আমি কী করার সিদ্ধান্ত নিই এবং কীভাবে নিই সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হৃদয়ের গভীর থেকে আমি জানতাম যে—একদিন আমাকে আমার সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তাঁর ক্ষমতা রয়েছে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার। তাই আমি আল্লাহকে ভীষণভাবে ভয় করতাম।

আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করতাম, কিন্তু আমার কোনো ধর্ম ছিল না। আমি ভাবতাম যে, একজন মানুষ কোন ধর্মের এটা কোনো বিষয় না যতক্ষণ সে ভালো কাজ করছে। পরে বুঝেছি, যে এই ধরনের চিন্তা কতটা ত্রুটিপূর্ণ! যাইহোক, কিন্তু আমার তখন এইরকম কোনো বুঝ ছিল না। আমার চিন্তা ছিল একটাই—স্বামী হিসেবে আমি এমন কাউকে পেতে চাই, যে আল্লাহকে ভয় করে। একেশ্বরবাদী হিসেবে আমি একজন খ্রিস্টান, মুসলিম বা বাহাইকে বিয়ে করতে চাইতাম।

Scanned with CamScanner

আমার স্বামীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় অত্যন্ত অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে। সে ছিল একজন খ্রিস্টান এবং আমেরিকান। আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম মাত্র তিন দিন। কিন্তু সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, সে খুব সৎ এবং তার হৃদয় আল্লাহর প্রতি ভয় দ্বারা পূর্ণ। তাই আমরা বিয়ে করি। কিন্তু বিয়ের দুই সপ্তাহ পরই তাকে আমেরিকা ফেরৎ যেতে হয়। সে তখন আমাকে সাথে নিতে পারেনি। প্রায় দেড় বছর পর আমি আমেরিকা যাওয়ার ভিসা পাই।

আমেরিকা ভারত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমেরিকান জীবনযাত্রার সাথে অভ্যস্ত হতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। আমার স্বামী ছিলেন একজন খুব নিবেদিত খ্রিস্টান। সে 'ঈশ্বরের আন্তর্জাতিক চার্চ'এর একজন সদস্য ছিল এবং প্রায় পাগলের মতো নিয়মিত এবং খুব ঘন ঘন বাইবেল পড়ত। সে সাব্বাত এবং সেভেন্থ ডে অ্যাডভেনিস্ট চার্চ উদযাপন করত। আমি কয়েকবার তার সাথে চার্চে গেছি। আমি বাইবেলও পড়েছি এবং সেখানে অনেক কিছু পেয়েছি যা ঈশ্বরের ব্যাপারে আমি যা বিশ্বাস করি তাকে সমর্থন করে। আমি এই প্রবাদবাক্যটা খুব পছন্দ করেছিলাম—"ঈশ্বর ভীতি প্রজ্ঞার সূচনা করে"।

চার্চে বেশকিছু দারুণ মানুষের সাথে আমার পরিচয় হয়। এমনকি আমার কিছু ভালো বন্ধুও তৈরি হয়ে যায়। আমি বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ ছিলাম একটি প্রবীণ দম্পতির সাথে। যেভাবে সবকিছু চলছিল তাতে আমি বেশ খুশি ছিলাম—যতদিন না আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাই আমার শ্বশুড়বাড়ির লোকজনদের সাথে দেখা করতে—ততদিন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের পথে আমি যখন মেট্রো ট্রেনে, তখন কিছু লোক ট্রেনে উঠে এবং যাত্রীদের হাতে একটা কাগজের টুকরা তুলে দেয়। আমি কাগজটা হাতে নিয়ে তার দিকে তাকাই এবং তা পড়তে থাকি চরম অবিশ্বাস নিয়ে। আমি কাগজটা খুব যত্নের সাথে সংরক্ষণ করি। ওটাতে লেখা ছিল :

মুক্তি পাবার জন্য কী আমার অবশ্য করণীয়?

এই প্রশ্নের উত্তর হলো : কিছুই না। একমাত্র আবশ্যকতা বেশি ঈশ্বর তাঁর ভাষায় যা বলেছেন, তাতে বিশ্বাস আনা। তিনি বলেন, "বিশ্বাস আনো প্রভু যীশুর উপর এবং তাহলেই তুমি মুক্তি পাবে।"

শুধু বিশ্বাস? হ্যাঁ, ব্যস এতটুকুই। বিশ্বাস মানে বেশি পরিত্রাণ পাবার উপায় সম্পর্কে ঈশ্বর যা বলেছেন তার উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা জ্ঞাপন করা।

Scanned with CamScanner

আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে? তা বেশি যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাকে সমাহিত করা হয়েছিল, তারপর তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হন।

যীশুখ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেন আমাদের অনন্ত জীবন দান করার জন্য। যদি তোমার অনন্ত জীবন পাবার ইচ্ছা থাকে তবে নিচের প্রার্থনাটা করো :

স্বর্গীয় পিতঃ আমি জানি যে আমি একজন পাপী এবং আমার ক্ষমার ভীষণ দরকার। এখন আমি যীশু খ্রিস্টকে গ্রহণ করছি আমার প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে। ধন্যবাদ আমার সব পাপ ক্ষমা করে দেয়ার জন্য। যীশুর নামে, আমেন।

কিন্তু যত লোক তাকে গ্রহণ করল, তাদের সবাইকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন (জন ১ : ১২)

এই ছোট্ট কাগজের টুকরাটা আমার সারাটা জীবন বদলে দিয়েছিল। আমার হৃদয়ের মাঝে হাহাকার সৃষ্টি হচ্ছিল যে, এটা সত্যি হতে পারে না! এটা এত সুস্পষ্ট মিথ্যা যে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম এটা ভেবে যে—সত্যি সত্যি কেউ এতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে! এটা ছিল আধুনিক যুগের খ্রিস্টধর্মের সাথে আমার প্রথম সত্যিকারের পরিচয়ের সূচনা।

আমি আধুনিক খ্রিস্টধর্মের আরও কিছু অদ্ভুত বিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পেরে পুরোপুরি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। নিচে হচ্ছে সেগুলোর একটা তালিকা, যা আমার কাছে একটুও অর্থবহ লাগেনি :

১. যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বর।

২. যীশু আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা—যিনি মানুষরূপে এই পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে।

৩. ঈশ্বর তিনের মাঝে এক...একটা ধারণা, যাকে বলে ত্রিত্ববাদ।

উপরের একটা বিশ্বাসও বাইবেল দ্বারা সমর্থিত নয়! যীশু কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। তিনি কখনো বলেননি যে, তিনি এসেছেন আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে। তুমি চাইলে বাইবেলের এপিঠ থেকে ওপিঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে পারো। কিন্তু ত্রিত্ববাদ শব্দটি এর মাঝে কোথাও খুঁজে পাবে না!

উল্লিখিত বিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জাগে।

Scanned with CamScanner

» কেন ঈশ্বরের স্বয়ং পৃথিবীতে নেমে আসার প্রয়োজন পড়ল যদি তিনি সর্বশক্তিমান হন?

» তিনি যদি কোনোকিছু করতে চান, তবে তিনি শুধু বলবেন 'হও' আর সেটা হয়ে যাবে, তাই না?

» যীশু তো একজন মানুষ ছিলেন। যদি তিনি ঈশ্বর হন, তবে তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করলেন? ঈশ্বর কি কখনোও মৃত্যুবরণ করতে পারেন?

» তাছাড়া, যীশু যদি আসলেই মানবরূপে বিধাতা হয়ে থাকেন, তবে তিনি কার কাছে প্রার্থনা করতেন? তিনি কি নিজের কাছেই প্রার্থনা করতেন?!

» যদি যীশু নিজেই ঈশ্বর হন, আমরা কীভাবে এমনটা চিন্তাতেও আনতে পারি যে, তিনি নিজেকে শয়তানের প্ররোচনার শিকার হতে দিয়েছিলেন?

» কীভাবে শয়তান যীশুকে পৃথিবীর রাজ্যসমূহের প্রস্তাব দিলেন—যদি স্বর্গ এবং মর্ত্যের সমস্ত কিছুর মালিকানা ঈশ্বরেরই হয়? তাছাড়া ঈশ্বরই কি শয়তানকে সৃষ্টি করেননি?!

» যদি ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভই হবে, তবে যীশু কেন ত্রিত্ববাদ প্রচার করেননি?

এটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না যে সৃষ্টিকর্তা কখনোও তাঁর সৃষ্টি বা সৃষ্টির অংশ হতে পারেন না। যদিও বা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি হতেও পারেন, কেন তিনি তা হতে চাইবেন?! আর যদি এটাই সত্যি হয় যে ঈশ্বর যীশু হয়েছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন (যেটা আমার কাছে ভয়াবহ এক পদক্ষেপ মনে হয়), তাহলে আজকে আমরা যে পৃথিবী দেখি তা তো পাপমুক্ত হবার কথা। যদি তা পাপমুক্ত না হয় তবে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করার কী অর্থ? এর মাধ্যমে কী বেশি অর্জিত হয়?!

আমি যেন তাকিয়ে ছিলাম এক নির্জলা মিথ্যার দিকে। আমি জানতাম যে এটা একেবারে গোঁড়া থেকে ভুল।

তুমি বিধাতার সৃষ্টি নৈপুণ্যে কোনো ত্রুটি খুঁজে পাবে না। এটা নিখুঁত। বিধাতাই আমাদেরকে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ও সাধারণ জ্ঞান দিয়েছেন। তাহলে তিনি কি আমাদের এমন কিছুতে বিশ্বাস করতে বলবেন, যা কোনো অর্থ বহন করে না? সত্য অবশ্যই অর্থবহ হবে। যখন কোনো অনুসন্ধানকারী সত্য বের করতে চায়, তখন সে সূত্র খোঁজে, প্রমাণসমূহ পরীক্ষা করে এবং তার বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। মানুষ সব ক্ষেত্রে

Scanned with CamScanner

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে, ধর্মের বিষয়াদি ছাড়া! একমাত্র এখানেই সে যুক্তি-বুদ্ধিকে বিসর্জন দেয় এবং তাদেরকে যা শেখানো হয় তাতে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে!

আমি অবাক হই এটা ভেবে যে, কীভাবে মানুষ সত্যি সত্যি এটা বিশ্বাস করতে পারে যে যীশু তাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন! আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরো, তুমি যদি কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হও, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে পরীক্ষায় পাস করার জন্য তোমাকে কিচ্ছু করা লাগবে না?!

তোমাকে কেউ এসে বলল যে, তোমাকে স্রেফ একটা কাজ করতে হবে—আর তা এই বিশ্বাস আনা যে, তোমার শিক্ষক নিজেই পরীক্ষার জন্য পড়বেন এবং তোমার হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে দিবেন। যে এমন কথা বলবে তুমি কি তাকে বিশ্বাস করবে!??

অবশ্য তুমি চাইলে বিশ্বাস করতে পার, বিশ্বাস করতে পার যা তোমার মন চায়, কিন্তু যখন তোমার পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাবে, তুমি আবিষ্কার করবে যে, তুমি পরীক্ষায় শূন্য পেয়েছ! শুধু তাই না, যখন তোমার শিক্ষক জানতে পারবে যে, তিনি তোমার হয়ে সব পড়া পড়ে দেবে, এই হাস্যকর চিন্তাকে তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছিলে, তিনি সম্ভবত তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দিয়ে কোনো পাগলাগারদে পাঠাবেন তোমার মাথা ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে!

ভারতে এতগুলা মন্দিরের মাঝে আমি জানতাম যে, মানুষ মিথ্যার উপাসনা করছে। হিন্দুবাদ, এর বহু ঈশ্বরবাদিতা কখনোও আমার কাছে অর্থবহ লাগেনি। আমি সবসময় ভেবে অবাক হতাম যে, হিন্দুরা কীভাবে জানে—তাদের দেব-দেবীরা দেখতে কেমন! আমি আবিষ্কার করলাম, আমেরিকাতেও অবস্থা কম-বেশি একই রকম। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে প্রতিটা রাস্তার কোণায় কোণায় তুমি মন্দির পাবে না, পাবে চার্চ! খ্রিস্টধর্ম যেভাবে আমেরিকাতে চর্চা হয়, সেটাও আমার কাছে অর্থবহ লাগেনি। মানুষ এমনভাবে যীশুর ছবি আঁকত, যেন তারা জানত যে, তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। আমি নিশ্চিত যে—সত্যিকারের যীশু কখনোই দেখতে তেমনটি ছিলেন না, যেভাবে তারা ফুটিয়ে তুলত!

আমি খ্রিস্টধর্ম নিয়ে আমার প্রশ্নগুলো নিয়ে আমার স্বামীর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তার কাছে কোনো সদুত্তর ছিল না। আমি আমার খ্রিস্টান বন্ধুদেরও জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা আমাকে কিছু উত্তর দিয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের উত্তরগুলো এত অসংলগ্ন ছিল যে, আমি তাদের প্রশ্ন করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। জানতে চাও, তারা আমাকে কী

Scanned with CamScanner

বলেছিল? সত্যি বলতে কি, আমি তোমাদেরকে সেগুলো বলার জন্য উৎসুক হয়ে আছি!

তাদের বক্তব্য ছিল : "কোনো পাপ বা ভুল একজন ত্রুটিমুক্ত বিধাতার সামনে দাঁড়াতে পারে না। যা আমাদের চোখে খুব ছোট্ট কোনো ভুল, তাঁর পরিপূর্ণতার কাছে তাও সহ্যের বাইরে। একটা পাপ কাজই যথেষ্ট। আদম এবং হাওয়ার কথাই ধরো। তারা শুধু একটা কাজ করেছিলেন, ছোট্ট একটা কাজ, কিন্তু তাদের সেই কাজই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তারা জানতেন, তাদের এই একটি কাজের পরিণাম মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, একটা উপায় আছে যার মাধ্যমে তাদের কাজের পরিণতি থেকে পরিত্রাণ মেলা সম্ভব। আর সেই প্রতিশ্রুতিই ব্যাপারেই নবিগন লিখে গেছেন। এই প্রতিশ্রুতি এবং তার পূর্ণতা—এটাই সেই অন্তর্নিহিত বাণী, যা বাইবেলের বাকিটা জুড়ে রয়েছে। আর তা হলো—শুধু ইহুদি নেতারাই পাপী নয় যারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, এর মাঝে রয়েছে ডেভিড, লুত এবং অন্যরাও। তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত আছ তুমি এবং আমিও। খুব ক্ষুদ্র কোনো পাপও মৃত্যুকে আমাদের প্রাপ্য করে তোলে। কিন্তু আদম এবং হাওয়ার জন্য যেমন তারা যা করেছিল তা থেকে ফিরে আসার কোনো পথ ছিল না, আমাদেরও এমন কোনো করণীয় নেই যার মাধ্যমে আমরা যেসব পাপ করেছি তা থেকে ফিরে আসতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর আদম এবং হাওয়াকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাদেরও সেই অনুরূপ প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন। তিনি চান, আমরা যেন শুধু সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি।"

কীভাবে মানুষ এমন একটা তত্ত্বে বিশ্বাস করতে পারে? কিন্তু মোটামুটি এই ছিল যা আমার ঘনিষ্ঠ খ্রিস্টান "বন্ধুরা" বিশ্বাস করত। তাদের মতে সকল পাপ, সকল মন্দ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একই। তাহলে একজন লোক, যে একটা রুটি চুরি করেছে তার শাস্তি কি তার সমান যে দশজন মানুষকে খুন করেছে! এটা কী ধরনের ন্যায়বিচার?! আমি কৃতজ্ঞ যে, আমেরিকার আইন-শৃংখলা পদ্ধতি সমস্ত অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয় না। আর পৃথিবীর ন্যায়বিচার কি আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের চেয়ে ভালো?

আর এমন চিন্তাও তো উদ্ভট যে, আমাদের সকল ছোট ছোট পাপের জন্য মৃত্যু আমাদের প্রাপ্য এবং আমরা বাঁচতে পারি শুধুমাত্র এটা বিশ্বাস করে যে—ঈশ্বর আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন!

Scanned with CamScanner

আমরা বিশ্বাস করি আর নাই করি, এটা তবুও তো এটা আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারছে না, তাই না?!

আমরা যদি কোনো পাপ করি তাহলে সেটা আদম এবং হাওয়ার জন্য তো নয়! আমরা পাপ করি—কারণ, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আমরা ভুল বা পাপ করাকে বেছে নিই। ন্যায়বিচারের দাবি বেশি আমাদের কাজের জন্য একমাত্র আমরাই দায়ী। আমি যে ভুল করি, তার জন্য অন্য কেউ দায়ী হতে পারে না! তাই কেউ যদি আমার কাছে এসে বলে যে, সে আমার পাপের বোঝা নিতে আগ্রহী, আমি তাতে রাজি হব না! যেহেতু আমি অপরাধ করেছি, অবশ্যই আমিই শুধু তার পরিণতি ভোগ করব! এটা কোনোভাবেই কোনো অর্থ বহন করে না যে আমরা সচেতনভাবে ভুল করব, সব ধরনের পাপ ও অপরাধে লিপ্ত হব আর সব বোঝা চাপিয়ে দেব এমন কারও উপর যে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ। এই পৃথিবীতে এমন কোনো আইন শৃংখলা পদ্ধতি নেই যেখানে টম একটা হত্যা করে আর টমের বদলে ডিককে ফাঁসি দেওয়া হয়!! যদি এমন কিছু করা হতো, তাহলে পুরো পৃথিবীর ব্যবস্থাটাই এলোমেলো হয়ে যেত!

আমি লাইব্রেরিতে গেলাম এবং প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করলাম। আমি ইসলাম, অন্যান্য একত্ববাদী ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলাম। আমি কুরআন পড়লাম। আমার আর কিছু খোঁজার দরকার বেশি না। আমি আমার সকল প্রশ্নের উত্তর সেখানেই পেয়ে গেলাম!

কুরআনের বাণী খুব সুস্পষ্ট :

১. আল্লাহ এক।

২. তিনি চিরন্তন এবং তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।

৩. তিনি কারও জন্মদাতা নন, কেউ তাঁর জনক নয়।

৪. তাঁর সদৃশ কেউ নেই।

৫. বিচার দিবসের দিন প্রতিটা আত্মাকে তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৬. কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।

৭. যীশু আল্লাহ্‌র একজন রাসুল ছিলেন।

৮. যারা সত্যকে বিশ্বাস করবে এবং ভালো কাজ করবে, তাদের পুরস্কারস্বরূপ

Scanned with CamScanner

জান্নাত দেওয়া হবে।

৯. যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১০. আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি এই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা। তিনি সব কিছু জানেন এবং শোনেন।

খ্রিস্টধর্মের ব্যাপারে আমার যা কিছু প্রশ্ন ছিল সেগুলোর উত্তরও পাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি কুরআন থেকে নিচের বিষয়গুলো শিখলাম :

১. যীশু ঈশ্বর ছিলেন না, না তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।

২. তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি।

৩. তিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেননি।

৪. ত্রিত্ববাদ বলে কোনো তত্ত্বের অস্তিত্ব নেই।

৫. উপরের সমস্ত কিছু আল্লাহর ব্যাপারে খুব নিন্দিত এবং ক্ষমার অযোগ্য কথাবার্তা।

কুরআনে এমন একটা বাক্য নেই যা অর্থবহ নয়; বরং আমি আমি জীবন ও মৃত্যুসংক্রান্ত অপরাপর সকল প্রশ্নেরও উত্তর পেয়েছি সেখানে। কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী-এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি কুরআনের উৎস অনুসন্ধান করেছি। নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এর জীবনীও পড়েছি। তার কাহিনি পড়ে আমি চোখের জল আটকাতে পারিনি।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। আল্লাহ তাঁর দেওয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানকে ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সত্য উদ্ঘাটনের আহবান জানিয়েছেন। আমি সত্যকে খুঁজে পেয়েছি। ইসলাম গ্রহণ করতে হলে আমাকে শুধু যা করতে হবে তা বেশি-আল্লাহ ব্যতীত ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল-এই ঘোষণা দিতে হবে।

আমি অন্য আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। আমি আমার স্বামীর সাথে ইসলাম নিয়ে কথা বললাম। আমরা প্রায় প্রতিদিন ধর্ম নিয়ে তর্ক করতে থাকলাম। আমার স্বামী আরও ঘনিষ্ঠভাবে বাইবেলের সাথে যুক্ত বেশি। আমাকে জানিয়ে দিল যে সে যীশুখ্রিস্টকে অস্বীকার করতে পারবেনা। সে আমাকে একেবারেই গুরুত্বের সাথে নিচ্ছিল না। সে আমাকে বলল যে আমার যা খুশি আমি তাই বিশ্বাস করতে পারি।

Scanned with CamScanner

তার কোনো সমস্যা নেই যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি।

কিন্তু এখানে একটা সমস্যা ছিল। আমি জানলাম যে, যদি আমি শাহাদাহ উচ্চারণ করে মুসলিম হই, তাহলে স্বামীর সাথে আমার বিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভেঙে যাবে। একজন মুসলিম নারীর অমুসলিম বা অবিশ্বাসী কাউকে বিয়ে করার অনুমতি নেই। ইসলামে একজন নারী অবশ্যই তার স্বামীকে মেনে চলবে। স্বামী ঘরের কর্তা এবং নেতা। তাই স্বামী যদি খ্রিস্টান হয়, তবে সে কীভাবে তাকে মেনে চলবে?! ইসলাম ঘরে কখনো গৌণ ভূমিকা পালন করতে পারে না। সত্য সবসময় উঁচু স্থানে থাকবে, মিথ্যা নয়!

আমাকে একটা বাছাই করতে হতো। হয় আমি ইসলাম (সত্য) গ্রহণ করব, অথবা আমার স্বামীর সাথে একজন খ্রিস্টানের মতো করে বসবাস করা চালিয়ে যাবো। আমি আমার স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম। আমি আমার দেশ ছেড়ে এসেছি শুধু তার সাথে থাকবো বলে। সে আমার কাছে পুরা পৃথিবীর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমার পক্ষে মিথ্যার সাথে বসবাস করা অসম্ভব ছিল। আমি জানতাম যে, এহেন পরিস্থিতিতে আমার জন্য ইসলাম চর্চা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাবে। তাই আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করলাম।

তাকে ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটাই আমার হৃদয় ভেঙে দিচ্ছিল। আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাঁদতে থাকলাম। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। আমার কোনো ধারণাই ছিল না তাকে ছেড়ে যাওয়ার পর কী হবে। আমি পুরোটাই আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি আমার স্বামীকে জানালাম যে, আমি কি করতে যাচ্ছি। একমাত্র তখনই সে আমাকে গুরুত্বের সাথে নিতে লাগল। সে ইসলামের ব্যাপারে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিল। সে আমাকে বলল, আমি যেন এই নতুন ধর্মের ব্যাপারে জানার জন্য তাকে কিছু সময় দিই।

তখন আমার স্বামীর মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা ছিল, সে আমাকে হারাতে চায় না। সে মনে হয় ভেবেছিল, আমি তখন বেকুব হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগল। সারাজীবন ধরে সে একজন খ্রিস্টান। তাই ইসলামের শিক্ষাগুলো তার কাছে একদমই নতুন এবং অদ্ভুত ছিল।

২০০০ সালের ৬ই অক্টোবর আমি এবং আমার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করি। কিন্তু আমার স্বামী তখনও অনেক কিছুই বুঝেনি। সে জানত না যে তার জীবনে কী ঘটতে

Scanned with CamScanner

চলেছে। সম্ভবত সে ভেবেছিল যে, তার পুরো জীবনটাই ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কারণ, সে আমাকে হারাতে চাইছিল না। সে মাঝে মাঝে কুরআন পড়েছিল কিন্তু বাইবেল পড়ছিল তার চেয়ে বেশিবার। সে কী করছে, এটা আমার কাছে কোনো ইস্যু ছিল না । আমি এতেই খুশি ছিলাম যে, আমাকে আমার স্বামীকে ছাড়তে হয়নি। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তাকে পথ দেখাবেন।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! আমার স্বামী নৌবাহিনীতে ছিল এবং তাকে একবার সমুদ্রে যেতে হয়েছিল প্রায় ছয় মাসের জন্য। সেই সময়ে সে প্রথমবারের মতো কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পায়। সে আমাকে একদিন ই-মেইল করল যে, সে কুরআন পড়া ছাড়া আর কিছুই করছে না। সে কোনোভাবেই এটা নামিয়ে রাখতে পারছে না! শেষ পর্যন্ত একদিন ও আমাকে বলল যে, এখন সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পেরেছে ও যে, এটি আল্লাহ্‌র বাণী। এখন তার বিশ্বাসের ঘোষণা দেওয়ার জন্য একটা তীব্র তাড়না বোধ করছে। যখন তার জাহাজ অস্ট্রেলিয়া পৌঁছল, সাথে সাথেই নিকটস্থ মসজিদে গেল এবং সেখানকার ভাইদের বলল যে, সে শাহাদাহ উচ্চারণ করতে চায়। তখন ভাইরা তাকে জানাল যে যেহেতু সে ইতিমধ্যে একবার আমার সাথে শাহাদাহ উচ্চারণ করেছে, তাই তা পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। তখন আমার স্বামী তাদের বোঝালেন যে সেই সময়ে তার কোনো বুঝ ছিল না। তিনি এটা করেছিলেন স্রেফ আমার জন্য। এখন উনি এটা নিজের জন্য করতে চান। খুশিতে আমার দু-চোখ ভিজে গিয়েছিল যখন সে আমাকে জানিয়েছিল যে, সে অস্ট্রেলিয়ার ওই মসজিদে শাহাদাহ পড়েছে।

এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মাঝে আমরা বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ এজন্য যে তিনি আমাদের বেছে নিয়েছেন সত্যের পথ দেখানোর জন্য। এটাই সবচেয়ে বড় সম্মান যা একজন মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন!!

Scanned with CamScanner

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে,
আল্লাহকে ভয়করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে
সাবধান থাকে তারাই সফলকাম।

[সূরা নূর, আয়াত : ৫২]

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner

মোহ আর মিথ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে একটা সময় আত্মাগুলো নিমজ্জিত হয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। সেই ভয়ার্ত অন্ধকার কূপ থেকে কেউ আলোর দেখা পায়, কেউ পায় না। কেউ নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার সুযোগ লুফে নেয়, কেউ নিজেকে হারিয়ে ফেলে অতল থেকে অতলে। যারা ফিরে আসে, কেমন হয় তাদের গল্পগুলো? সে রকম একঝাঁক পরিশুদ্ধ আত্মার গল্প নিয়েই *প্রত্যাবর্তন*।

ISBN
9 789843 439574

সমকালীন প্রকাশন

Scanned with CamScanner